মিশরের ইসলাম প্রেমিক লোকদের ওপর এ যুগের ফেরাউন জামাল আব্দুন নাসেরের নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী, ইখওয়ানী মুজাহিদদের ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, সৎসাহস, ইসতিকামত ও ঈমানী দৃঢ়তার ঈমানদীপ্ত দাস্তান -যে কাহিনী হযরত সাহাবাদের (রাযিঃ) জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে ঘটনা চেঙ্গিস, হালাকু খান ও মার্কিনীদের গোয়ান্তানামোবে ও ইরাকের আবু গারিব জেলখানার নির্যাতনকেও হার মানায়।

নব্য ফেরাউনের কারাগার

আহমাদ রায়েফ - মিশর

নব্য ফেরাউনের কারাগার

মূল ঃ আহমাদ রায়েফ - মিশর
ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

আল-খালেদ প্রকাশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

মিশরের নাম শুনতেই আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ) এবং 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা' বলে খোদায়ী দাবীদার ফেরাউনের কথা মনে পড়ে। আবহমান কাল থেকেই এ দেশটিতে সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিলের তুমুল সংঘাত চলে আসছে। এখানকার আবহাওয়া জালেমদের অট্টা হাসি এবং মজলুমদের বুকফাটা চিৎকারে ভারাক্রান্ত থাকে। আল্লাহর যমীনে ইসলামী খেলাফত তথা আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার জন্য মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনটির পত্তন ঘটে। সত্যের পতাকাবাহী এ দলটি কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত যা এ দলটির প্রবর্তক হযরত হাসানুল বান্না শহীদ (রঃ)-এর বাণীসম্বলিত কিতাব মুজাহিদের আযান পড়লে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা যে একটা নির্ভেজাল দল তা একথা থেকেও বুঝা যায়। শহীদ হাসানুল বান্না বলেছেন, "আমরা এ আকীদাও পোষণ করি যে, ইসলামের বুনিয়াদ ও দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং নবী করীম (সাঃ)এর সুন্নত। যদি মুসলিম উম্মাহ এ দু'টোকে শক্তভাবে ধারণ করে তা হলে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারে না। ... ইসলাম আমাদেরকে ঐরূপভাবে বুঝা উচিত যেরূপভাবে আমাদের সালফে সালেহীন বুঝেছেন ... এর ওপর যুগের এমন রং চড়ানো উচিত নয় যা তার ভাবধারার সাথে খাপ খায় না। ... ।" (মাজমুয়াতু রাছাইলিল ইমাম আশ্‌শহীদ ঃ ৪১০)

ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক, মহান মুবাল্লিগ, চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) বলেছেন, "আমার মিশরের গ্রামেগঞ্জে যাওয়ার অনেকবার সুযোগ হয়েছে। সবস্থানে ইখওয়ানী ভাইদের দ্বীনী প্রেরণা, ঈমানী জযবা, আতিথেয়তা, ইসলাম-প্রীতি, ইখলাস, মহব্বত ও উদারতা দেখে আভিভুত না হয়ে পারি না। তাদের কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। সুব্‌হানাল্লাহ, তিনি কত পবিত্র আত্মা ছিলেন যিনি এ পবিত্র জামাতের তরবিয়ত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ঈমানী স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত করেছেন।"

যাহোক, তুরস্কের উসমানী খেলাফতের পতনের পর দিশেহারা মুসলিম জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য এবং ইসলামী খেলাফতের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে এ মহান কাফেলা অগ্রসর হতে থাকে। আরব বিশ্বের তৌহিদী জনতা, বিশেষ করে মিশরের জনগণ ইখ্ওয়ানের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ইখ্ওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে সাম্রাজ্যবাদী কুফরী শক্তিবর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম শক্তির প্রতীক 'উসমানী খেলাফত'কে বিদায় দেয়া হয়েছে, এখন ইখওয়ানের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ পুনরায় খেলাফতী আইন চালু করে কিনা! ১৯৪৮ সনের কথা। তখন রাজা ফারূক মিশরের ক্ষমতায় সমাসীন। তিনি ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। তাদের ইশারা-ইংগিত ছাড়া চুলচেরা করার শক্তি নেই তার। ঠিক কিছু দিনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা করল। ইমাম হাসানুল বান্না (রহঃ) ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে ফিলিস্তীনকে রক্ষা করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। মুজাহিদরা শাহাদাতের নেশায় এক মহান সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়লেন। মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণে ইহুদী সৈন্যরা চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। হয়ত চিরদিনের জন্য ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটি ধূলিস্মাৎ হয়ে যেত। ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজা ফারূক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের আস্কারায় ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে ইসলাম ও দেশপ্রেমিক মুজাহিদদেরকে ডেকে এনে সোজা জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলোতে বন্দী করে তাদের ওপর এমন নির্মম নির্যাতন চালালেন যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। সেই নির্যাতনের প্রাক্কালে ইখওয়ানদের ঈমানী দৃঢ়তা দেখতে চাইলে 'মু'তাকালু হাকতাসিব' বইখানা পড়তে পারেন। বইটি লিখেছেন তখনকার অন্যতম বন্দী মুজাহিদ মিশরের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, আশ্‌শূরা ম্যাগাজিনের সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী আযযাহের। তিনি নিজ চোখে যে সব নির্যাতন হতে দেখেছেন, সে বইটিতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ নির্যাতন চলতে থাকে ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই পর্যন্ত। কিছু দিনের মধ্যেই মিশরের সামরিক বাহিনী জেনারেল নজিবের নেতৃত্বে রাজা ফারূকের গদি উল্টিয়ে দেন। বাদশাহ ফারূককে গদিচ্যুত করার পিছনে ইখওয়ানের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকর। মিশরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা পুরোপুরি সহযোগিতাই করেননি বরং বিপ্লবের নীল

নকশা থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জামাল আব্দুন নাসেরের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী কামালুদ্দীন হুসাইন তিনি স্বলিখিত বই 'আছছামিতুন ইয়াতাকাল্লামুন'-এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "রাজা ফারূককে উৎখাত করার মুহূর্তে আমিও জামাল আব্দুন নাসের ইখওয়ানের সশস্ত্র শাখার প্রধান আব্দুর রহমান আছ ছানাদীর কাছে গমন করি। আমরা তার গৃহে বসে কুরআন ও পিস্তলের ওপর হাত রেখে শপথ করলাম, রাজা ফারূকের রাজতন্ত্র বিলুপ্ত ঘটিয়ে আমরা মিশরে ইসলামী বিধান জারি করব।"

কিন্তু বিপ্লব সফল হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যান, বরং রাজা ফারূকের চেয়েও বর্বররূপ ধারণ করেন। তিনি ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে লেগে যান। ১৯৫৪ সন থেকে আবার ইখওয়ানীদের ওপর বর্বরতা শুরু হয়ে যায়। তবে তিনি ফেরাউনী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যখন তিনি ১৯৬৫ সনে মস্কো সফর করেন। তখন তিনি ওয়াশিংটনের পরিবর্তে মস্কোকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নাস্তিক প্রভূদের পরামর্শে এ গোপন তথ্যটি প্রকাশ করেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীন তাঁকে হত্যা ও গদিচ্যুত করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তথ্যটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও বানানো। বাস্তবে এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্র হয়নি।

এ ঘোষণার সাথে সাথে তিনি ইখওয়ানের নেতা, কর্মীসহ যত ইসলাম-প্রেমিক লোক রয়েছে তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদেরকে কারাগারের অন্ধকার জিন্দানখানায় নিক্ষেপ করে এমন বর্বর নির্যাতন চালান যার সামনে চেঙ্গিস ও হালাকু খানের বর্বরতরাও ম্লান হয়ে যাবে। আমার মনে হয় মার্কিন বাহিনী ইরাকের আবু গারিব জেলে এবং কিউবার গোয়ান্তানামো বে-তে নিরীহ মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে, মিশরের নব্য ফেরাউন বেদ্বীন,মুরতাদ জামাল আব্দুন নাসেরের নির্যাতনের সামনে ক্রুসেডারদের নির্যাতন তুচ্ছ মনে হবে।

এ বইটির লেখক আহমাদ রায়েফকে নাসেরী বাহিনী ১৯৬৫ সনে গ্রেপ্তার করে। তিনি ইখওয়ানের একজন প্রথম সারির লোক। তার বিরুদ্ধেও বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। তার ওপর চালানো হয় সব ধরনের হিংস্রতা। তিনি মৃত্যুকে সব সময় অতি নিকটে দেখেছেন। তিনি তার ওপর যে বর্বরতা

চালানো হয়েছে এবং নিজ চোখে ইখওয়ান সহ অন্যান্য মুসলমানদের ওপর বর্বর আচরণ হতে দেখেছেন, এসব কিছু তিনি বক্ষমান বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বইটি কারাগারে বসে লিখেছেন। আরবী বইটির নাম হচ্ছে 'আল বাওয়াবাতুছ ছাওদা।'

বইটি বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'নব্য ফেরাউনের কারাগার।' কারণ, বাস্তবিকই জামাল আব্দুন নাসের ফেরাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ বইটির অনুবাদকে পাঠক ভাইদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য আমি মাওলানা রাশেদ সাহেবের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশের জন্য মাওলানা রফিক সাহেব সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি। এ বইখানা অনুবাদ করার মেইন কারণ হচ্ছে, একটি প্রেরণা যে, সত্যের খাতিরে আমাদেরকে যে কোন কোরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘাবড়ালে চলবে না, ঈমানে ইসতিকামাত থাকতে হবে। যেমন– হযরত সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে শুরু করে যুগে যুগে ইসলাম-প্রেমিক লোকগণ তার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন।

কারণ, আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন ঃ "আ হাছিবান্না-ছু আঁই ইউতরাকূ আঁই ইয়াকূলূ আ-মান্না–ওয়াহুম লা–ইউফতানুন; ওয়ালাক্বাদ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন ক্বাব্‌লিহিম ফালাইয়া'লামান্নাল্লা–হুল্লাযীনা ছদাকূ ওয়ালা ইয়া'লামান্নাল কাযিবীন। অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। পরিশেষে পাঠকগণ যদি বইটি পড়ে সামান্যতম প্রেরণাও পান মনে করব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

নিবেদক

শেখ নাঈম রেজওয়ান
কড়াইল টিএণ্ডটি কলোনী, বনানী
গুলশান, ঢাকা
তাং ০১/০৭/০৪ ঈ.

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

মাত্র পাঁচ মিনিট

"আপনি আমার সাথে আসুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

মেজর মুহাম্মাদ আব্দুল গাফ্ফার তুর্ক আমাকে আমার ঘর থেকে গ্রেপ্তার করার পর এ কথাগুলো বললেন। ২৫ আগস্ট, ১৯৬৫ সনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি অসংকোচে এ কথা বলতে পারি, মেজর আমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি, তার আচরণে ভদ্রতার ছাপ ছিল।

ঘটনার রাতে আমি মার্কিন লেখক জন চাটনিক-এর "মানুষ ও ইঁদুর" নাটকটি পড়ছিলাম। পড়া মাত্র শেষ হয়েছে। রাত ১টার ঘন্টা বেজে ওঠল। এমনি মুহূর্তে কলিংবেলও ক্রিং ক্রিং করে ডেকে ওঠল। রাতের এমন ভয়ানক নীরবতার মধ্যে আগন্তুকের কথা ভেবে কিছুটা চমকিত হলাম। দরজা খুললাম। দেখি ভাই সুমায়ের আল-হুদায়বী দাঁড়ানো। মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। বিষন্নতার ছাপ পুরো চেহারাটা ঢেকে ফেলেছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি আমাকে সালাম করলেন। আমি সালামের উত্তর দিয়ে তাকে ভিতরে ডাকলাম। দুজনে মুখোমুখী হয়ে বসলাম। তিনি একটা নতুন সংবাদ শুনালেন ঃ

"আমাদের বন্ধু ইয়াহইয়া হুসাইন, আরব এয়ার কোম্পানীর একজন পাইলট, খার্তূমের পথ দিয়ে আদ্দিস আবাবা যাচ্ছিলেন। তিনি তার বিমান খার্তুমের এয়ারপোর্টে টেক অফ্ করিয়েছেন, তারপর থেকে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছেন।"

এ খবর শুনে আমার পুরো শরীর শিউরে ওঠল। আমার মনে পড়ল

আমাদের এই বন্ধু ইয়াহইয়া কৃষি কলেজে পড়াশুনা করেছেন। এরপর বিমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে তুখোর পাইলট হলেন। তিনি অনেক অর্থ ইনকাম করতে লাগলেন। কলেজেরই এক সহপাঠি মেয়েকে বিয়ে করলেন। তার ফুলের মত দুটো মেয়েও হল। আমার স্মৃতি-শক্তি অনুযায়ী এক মেয়ের নাম সুমাইয়া। আরেকটির নাম আমার মনে নেই। ইয়াহইয়া হুসাইন খুবই শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন। তার আনন্দমুখর জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার মত কিছু ছিল না। আমার জানা মতে তার কোন ধরনেরই সমস্যা ছিল না ...।

আমি সুমায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"আপনি এ খবর কিভাবে পেলেন?

"আমি আমার দুলাভাই মুহাম্মাদ আল-গান্নাম ও জিয়া তোপচীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা বলেছেন।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"ইয়াহইয়া হুসাইন কি ধরনের বিপদে পরতে পারেন?"

সুমায়ের অনেকটা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন ঃ

"আহমাদ! আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে নানা মুখে নানা কথা শুনা যাচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর অনুমান হল, তাকে মার্কিন গোয়েন্দা সি আই এ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু, কেন অপহরণ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। কিছু লোক বলছে, তিনি খার্তুম এয়ারপোর্টের ক্যাফেটেরিয়াতে চা খেতে গেছেন। চা খাওয়ার পর হঠাৎ তিনি বেঁহুশ হয়ে যান কিংবা তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।"

আলোচনার বিষয়বস্তু অন্য দিকে মোড় নিল।

সুমায়ের বললেন ঃ

"একটা পাকাপোক্ত খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে যে, সরকার ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীন-এর লোকদের ধরপাকড় করছে। আমি ভাবছি, ইয়াহইয়া হুসাইনের হারিয়ে যাওয়ার পিছনে ধরপাকড়ের খবরের সাথে কোন যোগসূত্র আছে কিনা!"

মোটকথা, আমি আর সুমায়ের এ ব্যাপারটা নিয়ে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করলাম। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলাম না। এভাবে রাত ৩টা বাজার ঘন্টা বেজে ওঠল। বন্ধু সুমায়ের চলে যাওয়ার জন্য আমার কাছে

অনুমতি চাইলেন। তিনি আমাকে একটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সটান শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে ওয়েটিংরুমে খটখট শব্দে আমার চোখ দুটো খুলে গেল। দেখি ওয়েটিংরুমে বাতি জ্বলছে। খালাতো ভাই রমজী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি যে বাসায় সেটা এই রমজীদের। আমি তার সঙ্গেই থাকি।

ঘরের কপাটে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হচ্ছে। রমজী আমার কানে কানে বলল ঃ

"মনে হয় বাইরে গোয়েন্দা পুলিশের লোক এসেছে, এখন কি করা যায়?"

আমি বললাম ঃ

"দরজা খোলা ছাড়া কোন উপায় নেই।"

আমার ঘুম যে কখন উড়ে গেছে!

পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে পড়ল। তার সঙ্গে সিপাহী ও গোয়েন্দা কর্মীরাও ঢুকল। সবাই রিভলবার তাক করে রেখেছে। আমি অনেকটা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম, এখানে কেন এই গোপন পুলিশ? এরা কি চায়? ইয়াহইয়া হুসাইনের ঘটনার সঙ্গে তাদের এখানে আসার কোন যোগসূত্র আছে কি? আমার এখন মনে হল, আমি যেন কোন ভয়ানক স্বপ্ন দেখছি। তাদের পিছনে পিছনে আমাদের বাসার চৌকিদার চাচা হাশেমও এসেছেন। আমাদের মত তিনিও কিছুই বুঝে ওঠতে পারছেন না, এসব কেন হচ্ছে।

রমজী পুলিশ অফিসারকে বলল ঃ

"আপনি কে?"

"আমি মেজর মুহাম্মাদ আব্দুল গাফ্‌ফার তুর্ক।

রমজী ঃ আমি কি আপনার পরিচয়পত্র দেখতে পারি?"

এ প্রশ্নে সিপাহী আর গোয়েন্দারা রক্তখেকো দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো। মেজর কার্ড বের করলেন এবং সেটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমরা কিছুই পড়তে পারলাম না। কারণ আমাদের হিতাহিত জ্ঞান এক রকম উড়ে গিয়েছিল। আমাদের চোখ বিস্ফারিত। I D কার্ডটি কালো না সাদা কোন কিছুই ধরতে পারলাম না। পুলিশ অফিসার চাচা হাশেমকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যিনি পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরেকজন সিপাহীকে হুকুম করলেন ঘরের দরজা বন্ধ করার জন্য। আমাদের হতভম্ব দৃষ্টি যদিও নির্বাক, কিন্তু তবুও কখনো কখনো সে চুপে চুপে

পরিস্থিতি দেখে যাচ্ছে।

শ্বাস-নিঃশ্বাস এলোমেলোভাবে চলছিল, যার শব্দও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল।

পুলিশ কর্মকর্তার কণ্ঠ হৃদয়হীন নীরবতাকে খান খান করে দিল। তিনি নাম ধরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আপনাদের ভিতর আহমাদ রায়েফ কে?"

"আমি।"

"তোমার রুম কোন্‌টি?"

আমি কোন কথা না বলে রুমের দিকে ইংগিত করলাম। কামরার দিকে মুখ করে তিনি বললেন ঃ

"আমরা কি এর তল্লাশী নিতে পারি?"

রমজী বাধা দিতে চাইলো এবং তল্লাশী নেয়ার সরকারী নির্দেশনামা দেখতে চাইলো।

পুলিশ অফিসার একটা তিক্ত ও বিদ্রূপাত্মক মুচ্‌কি হাসি ছাড়া আর কিছুই উত্তর দিলেন না।

আমি রমজীকে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কোন কাজে বাধা না দিতে বললাম। কারণ তাতে কোন ফায়দা নেই।

তল্লাশীর জন্য সবাই কামরার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ল।

আমি পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"জনাব! আমি কি জানতে পারি, আপনাদের এসব তৎপরতার কারণ কি? এটা তো আমাদের নলেজে আসা উচিত যে, আপনারা কি খুঁজছেন?"

আমার মনে বাজে ধারণাটা হল, হয়ত এরা ইয়াহইয়া হুসাইনকে তালাশ করছে। কিন্তু তাকে কেন খুঁজছে? গোপন পুলিশের সাথে তার কি সম্পর্ক? এ সব তৎপরতা ইখ্‌ওয়ানদেরকে ধরার জন্য নয় তো?

পুলিশ অফিসারের জবাবে আমি চমকে ওঠলাম। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললেন ঃ

"আমরা তোমার কিতাব, বইপত্রের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে চাই।"

আমার ভিতরে আগুন ধরে গেল। বইপত্রই তো হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে পবিত্র সম্বল। আমি এগুলোকে অনেক যত্নের সঙ্গে হেফাজত করে আসছি। এগুলোর প্রতি অন্যায় হাত বাড়াতে কাউকে অনুমতি দিতে পারি

না। আমার প্রচণ্ড রাগ এল। তবে আমি তা হজম করে নিলাম। এ মুহূর্তে এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্যরা এক ঘন্টারও বেশীক্ষণ ধরে আমার বইপত্র ও কাগজপত্রগুলো ওলোট-পালোট করে ঘাটাঘাটি করলো। তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা অনেক দামীদামী বই এক জায়গায় জমা করলো এবং বাড়ীর সামনে দাঁড়ানো গাড়ীতে নিয়ে তুলল। পরে আমি জানতে পেলাম, এ সব লোক যখন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আমার ছোট ভাইকে গ্রেপ্তারের জন্য গিয়েছিল, সেখানেও তারা আট সিন্দুক ভরে আমার কিতাবগুলো নিয়ে এসেছে। এগুলো আমি ওখানে যত্ন করে রেখেছিলাম।

অবশেষে তাদের তল্লাশি শেষ হল। আমি ভাবছি, এরপর কি হবে! ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসার বলে ওঠলেন ঃ

"আপনি কাপড় পরতে পারবেন?"

"কেন পারবো না; কিন্তু কি জন্য?"

মেজর বন্ধুর মত আন্তরিক ভঙ্গিমায় বললেন ঃ

"ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়। গোয়েন্দা অফিসে মামুলি ধরনের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন।"

আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিন

আমি কিছুটা ভেবে বললাম ঃ

"এ শেষ রাতে?"

মেজর এবার কিছুটা কড়া ভাবে বললেন ঃ

"জি, এ শেষ রাতেই।"

আমি বুঝে ফেললাম, তর্ক করা একেবারেই নিরর্থক। খুবই নিশ্চিন্ত মনে আমি কাপড় পরে নিলাম এবং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে আমি তার সাথে সাথে চললাম। যদিও আবহাওয়া অনেক গরম ছিল; কিন্তু জানি না, কেন জানি মোটা কাপড় পরলাম।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমাদের গাড়ী ঘুমে বিভোর কায়রোর মহাসড়ক দ্রুত অতিক্রম করছে। মেজর ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে আছেন। আমি পিছনের আসনে গোয়েন্দা পুলিশদের সঙ্গে বসে নিজের ভাগ্যের পরিণতি সম্পর্কে ভাবছি। আমার বাহু দুজন সিপাহী শক্ত করে

ধরে রেখেছে। মনে হচ্ছে তাদের একজন হচ্ছে পর্যবেক্ষণকারী ফেরেশতা আর অন্যজন চালক।

আমার মাথায় নানা রকম প্রশ্ন উঁকি মারছে। এসব প্রশ্নের উত্তর পেতেও দেরী লাগল না। দিন হওয়ার আগেই তা পেয়ে গেলাম। এমন একটা দিন আমার সামনে হাজির হল, যা আমার জীবনে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও মারাত্মকও বটে।

গোয়েন্দা পুলিশ অফিসে যখন আমরা ঢুকলাম, তখন ভোরের আলো দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পুরো অফিসটির কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভীষণ ভীতিজনক পরিস্থিতি। মনে হচ্ছে কোন কবরস্থান। প্রথম দৃষ্টিতে পরিবেশটা এমনই মনে হয়।

গোয়েন্দাদের বেষ্টনীর মধ্যে আমি গাড়ী থেকে নামলাম। মেজরের পিছনে পিছনে চললাম। তিনি কায়রোর অন্যান্য লোকদের মতই পাঞ্জাবী ও পাতলুন পরে আছেন। মনে হয় সড়ক দিয়ে চলার মুহূর্তে অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে আসা-যাওয়ার সময় আমি কখনো তার মুখোমুখীও হয়েছি। কিন্তু সেদিন কি আমি এ ব্যাপারটা কল্পনাও করেছি, বাহ্যত সরল এ লোকটার হাতে মানুষের তকদীর নির্ধারিত হয়! হ্যাঁ, সহজ সাদাসিধে দেখা গেলে কি হবে! এরাই মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। যখন যাকে চায়, তার ঘর থেকে গ্রেপ্তার করে নিতে পারে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারে। তাদের পক্ষে ছোট্ট একটি I D কার্ড দেখানোই যথেষ্ট। সেই কার্ডটিও এমন যা কেউ পড়তে পারে না। মনে হয় হযরত সুলায়মানের আংটি, যার প্রভাবে সমস্ত বদ্ধ তালা এমনি এমনি খুলে যায়। কিংবা সেটা আলাদীনের চেরাগ। আর এটাও বাস্তব কথা যে, তারা কার্ড দেখান ছাড়াও যা ইচ্ছা করতে পারে। তাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই। এর চেয়ে তিক্ত সত্য হল এই দিনগুলোতে মিসরের অবস্থা এমন যে, যে কোন সরকারী অফিসার যা মনে চায় তাই করতে পারে। তাদের হিসাব নেয়ার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই; বরং কেউ কোন প্রশ্ন করবে এ ধরনের দুঃসাহসও কেউ করবে না।

এটা সে সময়ের কথা যখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যদি কোন পুলিশ অফিসারের সাথে কোন লোকের ঝগড়া হতো, তাহলে সেই পুলিশ কর্মকর্তা খুব সহজে সিপাহীদের একটি দল নিয়ে সেই নিরীহ লোকটার ঘরে গিয়ে হানা দিত এবং তাকে গ্রেপ্তার করে এমন জায়গায় পৌঁছে দিত যেখানকার কথা ফেরেশতারা পর্যন্ত জানতো না। ধরে আনার কয়েক মাস পর তার গ্রেপ্তারীর

বিষয়টি রেকর্ডে আনা হত। মনে চাইলে সেই নিরীহ লোকটার জবানবন্দী নেয়া হত, না হলে নেই। বছরের পর বছর ধরে সে জেলখানায় পঁচত।

ঐ ভয়ানক দিনগুলোতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও অযৌক্তিক ব্যাপার ছিল এটা যে, যখন কোন নিরীহ বন্দীকে ইনকোয়ারী অফিসারের সামনে হাজির করা হত, তখন সেই বন্দীর কাছেই জিজ্ঞেস করা হত, তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে? অথচ সেই লোকটি কিছুই জানে না তাকে কোন্ অপরাধে ধরা হয়েছে। তবুও তাকে গ্রেপ্তারীর একটা যুক্তিসংগত কারণ ইনকোয়ারী অফিসারের সামনে বলতে হবে যে, আমি অমুক অপরাধ করেছি। সে জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ লোকটা মোটেও অপরাধ করেনি।

এ ধরনের কথা যারা না বলবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করতো মর্মান্তিক শাস্তি। জি, এমনি মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই মিসরের জনগণ তখন নিজেদের জীবন কাটাচ্ছিল!

পরবর্তী সময়ে আমার উপর দিয়ে যে তুফান বয়ে যায়, সে সময়ের কথা। আমি সামরিক কারাগারে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর মেহমান ছিলাম। একদিন দফতরের বাইরে আমার নিজের তদন্তের অপেক্ষায় আমি বসে আছি। একজন বন্দীকে তলব করা হল। মিলিটারী ইনকোয়ারী অফিসার তার কাছ থেকে তার গ্রেপ্তারীর কারণ দর্শাতে বলল। বন্দী উত্তর দিল ঃ

"আমি জানি না।"

বেচারা আসলেই জানতো না যে, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইনকোয়ারী অফিসার সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিল, 'এই কীটকে কিছু মজা খাওয়াও!'

মানবরূপী নরপশুরা পুরো আট ঘন্টা তাকে কখনো মোটা শক্ত লাঠি দিয়ে আচ্ছামত পিটায়। কখনো লোহার শিক গরম করে সেই লাল টাটকা অঙ্গার দিয়ে তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় দাগ দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সে বেচারা অবস্থা বুঝার চেষ্টা করতে লাগল। সে বুঝে কুলিয়ে ওঠতে পারছে না, কেন তারা তাকে নির্মম শাস্তি দিচ্ছে। সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করল, "হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটা কারণ শিখিয়ে দাও যা বলে এই শাস্তি থেকে উদ্ধার পেতে পারি।" ইতিমধ্যে আমাকে অন্য একজন ইনকোয়ারী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর আমি আর জানতে পারিনি, সে হতভাগার ভাগ্যে কি ঘটেছে।

একজন হতভাগার কাহিনী

আরেকজন হতভাগার ঘটনা শুনুন। এ লোকটা জনৈক মিলিটারী অফিসারের সাথে একই বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি ফ্লাটে থাকতো। একদিন তার স্ত্রী ও সেই সেনা অফিসারের স্ত্রীর মধ্যে কি ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। সেনা অফিসারের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠল। সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সনে যখন মিসরে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়, তখন সেই লোকটাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সেনা অফিসারের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ এসে গেল। একদিন হঠাৎ সেনা অফিসারটি সামরিক জেলখানার বারান্দায় তার প্রতিবেশীকে দেখতে পেল। সে তার বিশেষ ফাইলে প্রতিবেশীর নামটা লিখে নিল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে ঐ লোকটাকে অন্যান্য অগনিত কয়েদীদের সাথে আর্মি ট্রাকে করে সামরিক আদালতে (যাকে পিপলর্স কোর্ট বা গণ আদালত বলা হত) পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় তার ভাগ্যে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে যখন সামরিক আদালতের পক্ষ থেকে কোন আদালতি কার্যক্রম ছাড়াই কয়েদীদের জন্য শাস্তি শুনিয়ে দেয়া হয়। সমস্ত হাজতীকে ভয় ও আতংকের পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুটি সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। একজন সৈনিক এসে প্রতিটি সারির লোকদের একটা তালিকা তৈরী করল। কিছুক্ষণ পর একজন হাবিলদার আসল এবং কর্কষ সুরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল ঃ

"যারা ডান সারিতে দাঁড়ানো রয়েছে, আদালত তাদেরকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে, আর যারা বা দিকের সারিতে রয়েছে, তাদেরকে আরো পাঁচ বছর বেশী সাজা ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ পনের বছর।"

সে দিন বা পরের দিন ফৌজী অফিসারের সেই বদ-নসীব প্রতিবেশীকে 'লীমান তুর্‌রা' কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে তাকে বছর বছর ধরে 'জাবালে মুকাত্তাম' পাহাড়ের নিচে সূর্যের প্রখর রোদ্রের মধ্যে পাথর ভাঙ্গার মত শক্ত কাজ করতে হয়েছে।

অজানা পরিণতির দিকে

যাহোক ... আমি ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৫ সনের সকাল বেলার কথা বলছি। আমরা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর অফিসে পৌছলাম। মেজর ও তার

সমস্ত সিপাহী তড়িতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমার পা ভারি হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাবনা ও উৎকণ্ঠা আমাকে ঘিরে ধরেছে।

আমি বুঝতে পারছি, আমি এমন একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এই বিশাল বিস্তৃত ইমারতের ভিতর একটি জনপ্রাণীও দেখা যাচ্ছে না।

এটা কি সেই ইন্টেলিজেন্স অফিস, যার নাম শুনামাত্রই বড় বড় বীরপুরুষদের পিত্তও আতঙ্কে পানি হয়ে যায়। আমি মেজরকে চীৎকার করে বললাম ঃ

"তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো কেন নিয়ে যাচ্ছো?"

মেজর আমার চীৎকারে কর্ণপাত করল না। সে এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আমার সঙ্গে বড় নরম সুরে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলেছে। কিন্তু তার সব কিছু পাল্টে গেছে। সে আমাকে দুজন সান্ত্রীর হাতে সোপর্দ করে নিজে এক কামরায় চলে গেল। আমি দীর্ঘক্ষণ খামোশ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এক মহা আতংক আমার মধ্যে কাজ করছে। আমার ধারণা ছিল, এত বড় বিশাল বিল্ডিং নিশ্চয় পাষাণ হৃদয় পাহারাদার আর লাইটের আলোয় ঝলমল করবে। কিন্তু এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় আমাকে বলে দিচ্ছিল, এই নীরবতার পেছনে কোন ভয়ানক ঝড় লুকানো আছে, যার ভয়াবহতা আমি আঁচ করতে পারছি না। সে সময় আমার কি অবস্থা হবে, যখন চারদিক থেকে আমার উপর মুসিবত নেমে আসবে।

আমি একজন গার্ডকে দেখলাম, সে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখছে। আমি অন্যমনস্কভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"ওখানে কি শাস্তি দেয়া হয়?"

"কোথায়?"

"যেখানে তোমরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছো।"

গার্ড আমাকে অবসন্ন দৃষ্টিতে দেখে বলল ঃ

"তুমি কি এ প্রথমবার গ্রেপ্তার হয়েছো?"

এখন আমার বোধোদয় হল, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। কিন্তু গ্রেপ্তারীর কারণ কি? তার আমি কিছুই জানি না। 'গ্রেপ্তারী' আমার কানের জন্য একটা

অপরিচিত শব্দ। এখন আমি বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে লাগলাম। মেজর আমাকে বলেছিল, আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর ফিরে আসতে পারবো। আসলে সেটা আদৌ সত্যি নয়।

গার্ডের আওয়াজ শুনে আবার আমি চমকে ওঠলাম। সে বলল ঃ

"যা হোক, তুমি ঘাবড়াবে না।"

"কেন ঘাবড়াবো না?"

"সামান্য পিটাই করা হবে। তেমন কিছু নয়!"

হে আল্লাহ! কি কাণ্ড শুরু হল, এ ফাঁদ থেকে কিভাবে বের হব? সামান্য আর অসামান্য পেটানোর মধ্যে পার্থক্য কি? তখন পর্যন্ত আমি পার্থক্যটা বুঝিনি। পরে আমার বুঝে এসেছে, সামান্য ও অসামান্য মারের মধ্যে তফাত কি। আসলে কি, আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পরে আমি এ পার্থক্যটা বলব।

মেজর যে রুমে ঢুকেছিল, আমাকেও সে রুমে ঢুকানো হল। আমাকে বসতে বলা হল। খানিক পর আমি ফজর নামায আদায় করার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দেয়া হল। আমি মেজরের কাছে কিবলা কোন্ দিকে জিজ্ঞেস করলাম।

বললেন, তিনি সেটা জানেন না।

পরক্ষণেই আমার মনে পড়ল, এ সমস্ত মুহূর্তে তাহার্‌রী করে (ভেবে-চিন্তে) যে দিকে মন সায় দেয় সে দিকে ফিরে নামায পড়া যায় তাতে নামায হয়ে যাবে। আমি সে মোতাবেক নামায পড়লাম।

মেজর আমার বইপত্র এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আমি যে সব প্রতিবেদন লিখেছি, যেগুলো আমার বাসা থেকে পুলিশ এবং গোয়েন্দারা জোরপূর্বক জব্দ করে নিয়ে এসেছে, সেগুলোর একটা তালিকা তৈরী করলেন। তারপর আমার হাতে কলম দিয়ে বললেন ঃ

"এ তালিকার উপর সই করো!"

আমি তালিকার উপর একবার নজর বুলালাম। দেখলাম, আমার বাসা থেকে যে সমস্ত বইপত্র জব্দ করেছিল এ তালিকার মধ্যে তার অধিকাংশই লেখা হয়নি। আমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করলাম না। পূর্ণ স্থির চিত্তে সই করলাম। কয়েক মিনিট পর আবার আমরা গাড়ীতে চড়লাম এবং কায়রোর বিভিন্ন রোডে ঘুরলাম। মেজর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, আমাদেরকে উপরে নিয়ে যেতে। এ শব্দটিই তিনি বললেন।

কেল্লার বুরুজ দেখা গেল। আমরা আস্তে আস্তে কাছে গেলাম। এক সময় একেবারে কাছে চলে এলাম। আমার মনে হল যেন তার দেয়ালগুলো আকাশ ছুঁবে। কেন জানি ঐ সময় আমি অনুভব করলাম, সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিঃ)এর আত্মা আমার সামনে হাজির হয়েছে। সেই মহান মানবের আত্মা, যিনি মিসরকে প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের ওসিলায়ই আজ আমি মুসলমান। আজ আমার অনুধাবন হল, ইসলামের আত্মা মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও কায়রোর প্রতিটি অনু-পরমাণুতে বিরাজিত থাকবে। গাড়ী আশ্চর্য ধরনের আঁকাবাঁকা একটি সুরঙ্গ পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমি এমন একটি জায়গায় পৌছে গেলাম, যেখানে এখন কোন সাধারণ মানুষকে এদিক-ওদিক চলতে দেখা যাচ্ছে না। সুরঙ্গ পথটি সৈনিক দিয়ে ভরা। তাদের কাঁধে ঝুলছে রাইফেল–যার মাথায় সঙ্গীনগুলো চকচক করছে। তাদের মাথায় লোহার হেলমেট, যেন তারা কোথাও যুদ্ধে যাচ্ছে। একটা দরজার কাছে পৌছে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। আমি শংকিত হয়ে পড়লাম এ ভেবে যে, আমার সঙ্গীদের ব্যবহার আমার সাথে এখন একটা মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে।

আমরা এমন একটা জায়গায় ঢুকলাম, মনে হল কোন প্রাচীন মহলের কোন পুরানো কবরস্থানে ঢুকছি। আমরা আসলে কেল্লার জেলখানার গেটের মুখে এসে হাজির হয়েছি। এ জেলখানা এমন লোমহর্ষক রক্তাক্ত নাটক দেখেছে যা অতীতের জালেম শাসক মুহাম্মাদ আলী পাশার বর্বরতাকেও হার মানায়। আমার মনে আছে এই জেলের মধ্যেই আমি পরের দিন একজন মানুষের লাশ নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে ছিলাম, যিনি এমনি এক রক্তাক্ত নাটকের বলির শিকার হয়েছেন। সে বিবরণ সামনে আসছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যখন বিপদ ঘিরে ধরল

মেজর আব্দুল গাফ্ফার তুর্ক আঙ্গিনার দরজায় কড়াঘাত করলেন। সিভিল পোশাক পরা এক লোক দরজা খুলল। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বর্ষন হচ্ছে। মূর্খতা আর বর্বরতার চিহ্ন তার চেহারায় স্পষ্ট। সে মেজরকে সামরিক কায়দায় সালাম করে আমাদের ভিতরে আসতে বলল। এ স্থানটি জেলের সেলের মত একটা সংকীর্ণ কামরা। যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকলাম তার সোজাসুজি আরেকটি দরজা আছে যা একেবারেই ছোট। সেখানে তালা ঝুলছে। ওটা দেখে আমার জ্ঞানীদের সেই বাণীটি মনে পড়ল, "তোমরা অপ্রশস্ত দরজা দিয়ে কখনো ঢুকবে না।" কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি, সেখানে দার্শনিকদের বাণী শোনার সুয়োগ কোথায়! কামরার ভিতর ছোট্ট একটা টেবিল। গাঢ় গোলাপী রঙের পালিশ। কাঠের মধ্যে অনেকগুলো নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে। নামগুলো আমি পড়তে পারলাম না। টেবিলের উপর দু-তিনটা রেজিষ্টার খাতা পড়ে আছে। এ ধরনের রেজিষ্টার বুক সাধারণত থানায় থাকে। টেবিলের এক কোণে সবুজ রঙের লোহার একটি বড় সিন্ধুক রয়েছে, যার দস্তাগুলো উজ্জল তামা দিয়ে বানানো। আমার সন্দেহ হল, হয়ত তারা আমাকে এ সিন্ধুকের ভিতর কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে রাখবে। হায় যদি এমনটা করত। টেবিলের পিছনে একটি চৌকি পাতা রয়েছে, তার উপর একজন বিশাল দেহী লোক জোরে জোরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। সে এত লম্বা যে, তার হাটু দুটো চৌকির নীচে ঝুলছে। আমরা ভিতরে ঢুকা সত্ত্বেও সে ঘুম থেকে ওঠলো না। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে,

যেন কোন শীতল বড় পাথরের টুকরা রেখে দেয়া হয়েছে। টেবিলের সাথে আরেকজন সামরিক অফিসার বসা। তার কোটটি কাছেরই একটি চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কোটের কাঁধে থ্রিস্টার-এর চিহ্নটি বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে একজন ক্যাপ্টেন। সে মেজর তুর্ককে অভ্যর্থনা জানালো এবং তারা এমনভাবে কথাবার্তায় মত্ত হয়ে গেল, মনে হচ্ছে, আমি এখানে নেই।

মেজর তুর্ক ও তার সঙ্গী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। আমি এখন নতুন ফৌজী অফিসারের নিয়ন্ত্রণে এবং তার একেবারে মুখোমুখী বসে আছি। সে কোন রকম দেরী না করেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল এবং সেটা খুব ঝটপট ও একের পর এক। দম ছাড়ার কোন সময় নেই।

"তোমার নাম কি?"

তোমার বয়স কত?

তুমি কি কর?

তোমার কাছে কি এমন কিছু আছে, যা তুমি আমানত হিসাবে আমাদের কাছে রেখে যেতে চাও?

কোট খুলে ফেল। চশমাও নামিয়ে ফেল।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমার তো চশমা একান্তই জরুরী।

সে সময় আমি এটাই অনুভব করলাম, চশমা আমার একান্ত জরুরী। যে বিশাল দেহী লোকটা চৌকিতে শোয়ে আছে সে কিছুক্ষণ আগেই জেগে গিয়েছিল। সে গর্জন করে ওঠল ঃ

"চশমা চোখ থেকে নামিয়ে ফেলো, এতেই তোমার মঙ্গল বুঝলে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"আপনার কথার মতলব কি?"

সে বলল ঃ

"এ দরজার ভিতর যে জিনিস তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তুমি তা জানো না।"

এ কথা শুনে ভয়ে আতংকে আমার কলিজা দপ দপ করে ওঠল।

আমি কম্পিত হাত দিয়ে চশমা খুলে তার কাছে দিলাম।

কী আমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং কেন?

মুহাম্মাদ আলী পাশা এবং মামলুকদের সময়কার কথা মনে পড়ল।

এ কেল্লাটাতেই মুহাম্মাদ আলী পাশার আদালত বসত। এখানে বসেই সে

নিরীহ লোকদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তার জল্লাদের নাম ছিল আমীনবেগ শাহীন। সে মুহাম্মাদ আলীর হুকুম শুনামাত্র কয়েদীর হাঁড়গোড় ভেঙ্গে নাস্তানাবুদ করে ফেলত।

ক্যাপ্টেন আর তার বিশালদেহী সহযোগী আমার সর্বস্ব নিয়ে নিল। আমি সম্পূর্ণ খালি হাত। আমাকে তারা জোরে ধাক্কা মেরে সেই দরজার দিকে ঠেলে দিল। ভিতরে পা রাখামাত্র যে দৃশ্য দেখলাম, তা কখনো ভুলবার নয় এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মরণ পর্যন্ত আমার স্মৃতি থেকে তা মুছবে না।

যে দৃশ্য দেখে রক্ত হিম হয়ে যায়

দরজার ভিতর যখন পা রাখলাম, তখন সেটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হল। ভিতরে ভূতুড়ে আঁধার ছেয়ে আছে। আমার পা দুটো অনুভব করল, যেন সামনে দুই পাথরের সিঁড়ি। আমি খুব সাবধানে নীচে নামতে লাগলাম, যেন হোচট খেয়ে দাঁত-নাক ভেঙ্গে না যায়। সমতল জায়গায় চলে এলাম। সামনে বেড়ে একটি খোলা জায়গা দেখলাম। রোদ ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করছে। দুদিকে ছোট ছোট কুঠুরী, যেগুলোর দরজা খোলা রয়েছে। প্রতিটি কুঠুরীর মাথায় নম্বর দেয়া আছে। আদম সন্তানের একটা আজব দল দেখতে পেলাম। তারা সারি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল, এরা হচ্ছে সেই অসহায় নিরপরাধ বন্দী, যাদের উপর পুরো রাতভর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি, নির্যাতন ও টর্চারিং করা হয়েছে। এখন তারা পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে।

এরা ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক হবে। এদের প্রত্যেকেই ব্যথায় কোকাচ্ছে। তাদের উপর এমন বর্বর নির্যাতন চালানো হয়েছে, যার কারণে তাদের চেহারা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে। দেখলাম, দুজন লোক তৃতীয় আরেকজনকে হাতে উঠিয়ে রেখেছে, যার পা দুটো লাঠির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও ফুলে টই টই করছে। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফাঁটা চামড়া থেকে পুঁজ টপ টপ করে পড়ছে। মুখখানাও মারাত্মকভাবে ফুলা। জায়গায় জায়গায় গোশ্‌ত নেই, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যার ফলে লাল-নীল দাগ পড়ে গেছে। এজন্যই লোকটির অবয়ব বুঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন মানুষটা এমন কুশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরেছে, যাতে তা দিয়ে অন্যকে ভয় দেখানো যায়।

আরেকজন লোক দেখলাম, যার মাথাটা ফেটে হা করে রয়েছে। লাল

টাটকা খুন তার কালো চুলের মধ্য দিয়ে ঝড়ছে। মনে হচ্ছে, খঞ্জর দিয়ে তার মাথা ফালা ফালা করা হয়েছে।

আরেকজন লোক দেখলাম, সে পেটের সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। কারণ, তার পা দুটো এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে এত মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে যে, তার ফলে তার এখন চলা কোনভাবেই সম্ভব না। তাকে উঠিয়ে ধরার মতও কেউ নেই। সব লোক তাদেরকেই উঠাচ্ছে, যাদের পেটের সাহায্যে এবং হামাগুড়ি দিয়ে চলারও ক্ষমতা নেই। এরই নাম "মামুলি বা সামান্য শাস্তি।"

এ ব্যাপারে গার্ড আমাকে আগে সতর্ক করে দিয়েছিল। এই "সামান্য পিটাই" খাওয়ার জন্যই এ নতুন জগতের অজানা সফর অধীর আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে এসব ভয়ানক দৃশ্য দেখছিলাম। দৃশ্য এতই ভয়াবহ যে, আমার জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমার ভিতর কোন ধরনের ভয় ও আতংক নেই। আমার ভাল মত এখনও মনে আছে, এ সব অবস্থা দেখামাত্র আমার ভেতর থেকে সব ধরনের ভয় কেটে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত আমি এ কথার ব্যাখ্যা করতে পারছি না, কেন ভয়ের বদলে নির্ভয় হঠাৎ করে আমার মনকে ঘিরে নিল!

হঠাৎ আমার সামনে একজন যুবক এগিয়ে এলো। গৌরবর্ণ। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। তার পাতলা পাতলা মোঁচগুলো ওপর দিকে তা দেয়া, যেন নতুন সুদানী ডাণ্ডা, যাকে এখনো ব্যবহার করা হয়নি। যুবকটি কোন্ দিক দিয়ে এলো আমি জানতে পারলাম না। আমি তো আধমরা লোকদের সারিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম, যারা বাথরুমে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। এ লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এসে এবং একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। গভীরভাবে আমাকে দেখতে লাগল, যেন সে পর্যবেক্ষণ করছে, আমার বাইরের অবস্থার পশ্চাতে আমার ভিতরটা কেমন! আমিও তাকে গভীরভাবে দেখলাম। এক সময় সে জিজ্ঞেসই করে ফেলল ঃ

"তুমিই কি আহমাদ রায়েফ?"

"জি, আমিই আহমাদ রায়েফ।"

ভয়ানক সকালের সূচনা

উত্তরটা শুনামাত্রই সে বিদ্যুতের মত আচম্বিতে আমার মুখের উপর একটা কঠিন চড় বসিয়ে দিল। আমার চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বের হল। তারপর সে বৃষ্টি-ধারার মত অবিশ্রান্ত ও লাগাতার গালি দিতে লাগল। এমন অশ্লীল গালি যা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি অজান্তে তার কলারটা শক্ত করে ধরে ফেললাম এবং নিজের স্নায়ুর অবস্থা অগ্রাহ্য করে তাকে জোরে দেয়ালের উপর ছুড়ে মারলাম। তাকে সতর্ক করে দিলাম ঃ

"তুমি কেন আমাকে এভাবে মারলে? তুমি নিশ্চয় পাগল। এদেশে আইন, কানুন, পার্লামেন্ট আছে। যদি তুমি এ সব ভুলে যাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই তোমার কাজের সাজা ভোগ করতে হবে।।"

সে সব দিনে ঘূর্ণাক্ষরেও আমার ধারণা হয়নি যে, আমার দেশের মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করা হতে পারে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমার সঙ্গে সেই যুবকটির এমন ঘটনা ঘটে গেল অথচ দাঁড়িয়ে থাকা কয়েদীদের মধ্যে কেউই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। কারণ, তাদের সকলেরই হায় নফসী! হায় নফসী অবস্থা। আমার দিকে মন দেবার মানসিক শক্তি কোথায়?

কয়েকজন সেপাই আমার দিকে তেড়ে এলো। তখনি আমার বোধোদয় হল। এ তিক্ত ও বাস্তব সত্যটি পরিষ্কার হয়ে গেল, আমি এমন এক স্থানে এসেছি, যেখানে আমি কিছুই করতে পারবো না এবং নিজের জন্য কোন ভাল-মন্দের মালিক আমি নই। আল্লাহর মর্জির সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনিই সেই রব্বুল আলামীন যিনি যা চান তা করেন।

তেড়ে আসা সেপাইরা পিটিয়ে আমার হাঁড়-মাংস খঁসিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু সে যুবকটি তাদেরকে বারণ করল। পরে আমি জানতে পেলাম যে, তার নাম আহমাদ রাছেখ।

যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হল, তখন সেই যুবকটি আমার হাত ধরে আগে বাড়তে লাগল। আমরা রাস্তা ও গলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। দুই পাশে অন্ধকার ও সংকীর্ণ সেল বানানো রয়েছে। মনে হচ্ছে, মৃত্যুর ছায়া আমাদের সঙ্গে বিচরণ করছে। এটা হচ্ছে সেই ভয়াবহ সকালের সূচনা।

গলির শেষ মাথায় কাঠের একটি সিঁড়ি রয়েছে দোতলায় যাওয়ার জন্য। ঐ যুবক ফৌজী অফিসারের পিছনে পিছনে আমিও সিঁড়ি বেয়ে ওঠলাম। এ সময় যে সব ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মুখে তালা লেগে গেছে, চেতনা লোপ পেয়েছে, স্নায়ু ও অনুভূতির রগ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে!

সিঁড়ি শেষ হলে একটা ছোট্ট কামরা সামনে এলো। রুমটি দুটি বড় ব্যারাকের মধ্যখানে। এর মধ্যে একটা ব্যারাক অনুমান ২৫ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার চওড়া। আমি বাঁ দিকে ঘুরে দেখলাম, ব্যারাকে কোন ফার্নিচার নেই। শুধু কাঠের একটা চৌকি, দু-তিনটি চেয়ার এবং ছোট্ট একটা টেবিল–সাধারণত স্কুলে দেখা যায়। সেখানে কোন জন মানব নেই। তবে দেয়ালের এখানে-সেখানে মানুষের রক্তের অস্পষ্ট ছিটা-ছাটা দেখা যাচ্ছে। আমি এখানে মৃত্যুর গন্ধ টের পাচ্ছি। আমি ডানদিকে তাকালাম। আহমাদ রাছেখও নীরবে আমাকে পরখ করছিল। তার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক স্মিত হাসি। সে যখন আমাকে ডান দিকের ব্যারাকে তাকাতে দেখল, তখন হাত দিয়ে ব্যারাকের ভিতরকার বন্দীদের দিকে ইশারা করল। হঠাৎ করে আমি মারাত্মক হৈচৈ, ব্যথা ও যন্ত্রণা-ভরা গোঙ্গানী ও মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। হতভাগা কয়েদীরা চিৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছে যাদেরকে হিংস্র, পাষাণ জল্লাদরা মোটা শক্ত লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাঁড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে।

তারা কিছুটা নিস্তারের জন্যই দৌড়ানোর চেষ্টা করছে; কিন্তু কতক্ষণ? সেপাইরা বিরামহীনভাবে পিটিয়ে তাদেরকে ধরাশায়ী করছে। এখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। এ সব কি হচ্ছে?

আরেকটি দৃশ্য! মানুষ ব্যারাকের লম্বা আঙ্গিনায় ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তাদের শরীরে কোনই কাপড় নেই; সদ্যোজাত শিশুর মত উলঙ্গ। তাদের হাত শিকল দিয়ে বাঁধা। ব্যারাকের প্রতিটি কোণে তিনজন করে সেপাই দাঁড়ানো। প্রতিটি সেপাইয়ের হাতে শক্ত লম্বা লাঠি। এ সব সেপাই সে সব হতভাগা বন্দীদের উপর বৃষ্টির মত লাঠি বর্ষন করে যাচ্ছে। বন্দীদের শরীর ও মাথা কেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে; তবুও জালেমদের হিংস্রতা কমছে না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতাশ হয়ে আহমাদ রাছেখের দিকে তাকালাম। একটা বিষাক্ত হাসি দিয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

"এদের মধ্যে কাউকে তুমি চেনো?"

"মোটেই না।"

"ভালমত দেখ।"

আমি আবার ভালমত নজর বুলালাম। আমার হার্টফেল হওয়ার কায়দা। সত্যিই এ সব হতভাগা, বদনসীব লোকদের ভিতর আমার তিন জন বন্ধু আছে। প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারিনি, যেহেতু তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আহমাদ রাছেখ গর্জন করে ওঠল ঃ

"তুমি দেখলে তো দেশের আইন, কানুন আর পার্লামেন্ট। এ সব হচ্ছে অর্থহীন জিনিস।"

আমি ঢোক গিললাম। আমার মুখ থেকে কোন উত্তর বেরুল না। বিষয়টি যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে। সে আবার নিজের কথাটি রিপিট করল। তার আওয়াজ গুম গুম করে ওঠল, চতুর্দিক প্রতিধ্বনি হচ্ছে। সে বলল ঃ

"এসো, আমরা চাই, তুমি কিছু বল!"

আমি নিঃসংকোচে বললাম ঃ

"কি বলব?"

"বুঝা যাচ্ছে, তুমি কিছুটা অবসন্ন।"

"অবশ্যই না, আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি উত্তর দিই। আমি আপনার কাছে কোন কথা লুকাবো না।"

"আরে বেকুব! এখনই আমরা তোমার খবর নিচ্ছি।"

এ সময় পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝিনি, ঘটনা কি? কী এরা আমার কাছে জানতে চায়? তবে অনুমান করতে পারলাম, যদি আমি ওদের কাছে কিছু না বলি তাহলে এরা আমাকে মেরে পিটিয়ে তিলে তিলে মেরে ফেলবে। আমি জীবনে আজ পর্যন্ত কোন ধরনের পিটুনি খাইনি। একমাত্র সেই চড় যেটা আহমাদ রাছেখ বসিয়েছে। এটাই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম আঘাত।

যখনকার কথা বলছি সে সময় মজলুম মানবতার উপর যে তুফান বয়ে যাচ্ছিল তার তুলনায় এই চড় কিছুই না।

আহমাদ রাছেখ আমাকে বাঁ দিকের ব্যারাকে নিয়ে গেল এবং কাঠের বেঞ্চে বসে আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"বল, কি বলতে চাচ্ছ?"

আমার জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। উদভ্রান্ত। রাছেখের চেহারার উপর আমার দৃষ্টি থেমে আছে।

একটা শব্দও আমার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারলাম না, কী নিয়ে কথা বলব। আমি নড়বড়ে ভাঙ্গাভাঙ্গা শব্দে আহমাদ রাছেখকে বললাম ঃ

"আচ্ছা, এটা কি সম্ভব, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আর আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিই?" সে একটি ভয়ানক ও বিশ্রী অট্টহাসি দিয়ে গলা ফাটিয়ে জল্লাদকে আওয়াজ দিল। এক পলকের মধ্যে চারজন জল্লাদ তেড়ে এলো। তাদের চোখ দিয়ে হিংস্র আগুনের ফুলকি ঝরছে। তাদের হাতে রয়েছে সে শক্ত লম্বা লাঠি, যার কথা একটু আগে বলেছি। তাদের চেহারা দেখে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, যে কাজ তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে, সে ব্যাপারে তারা খুবই পারদর্শী।

আধা মিনিটের মধ্যে আমার কাপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলা হল। আযাবের চুল্লিতে আমাকে ঠেলে দেয়া হল। সবদিক থেকে আমার উপর লাঠি বর্ষন হচ্ছে। মনে হচ্ছে কামরার ছাদ থেকে আগুনের লাঠির বৃষ্টি হচ্ছে। আঘাতগুলো এতই যন্ত্রণার যা বর্ণনার বাইরে। আমার অনুভব হচ্ছিল যেন, আমার শরীর আর আমার প্রাণ টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং সেই মর্মান্তিক শাস্তির ধূয়ার অংশে পরিণত হচ্ছে যা দিয়ে পুরো ব্যারাকটি ছেয়ে আছে। পুরো একটা ঘন্টা আমাকে এমনভাবে পেটানো হয়। এ একটা ঘন্টা আমার কাছে শত বছরের চেয়েও দীর্ঘ মনে হল। মার খাওয়ার এক পর্যায়ে প্রাণহীন লাশের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। তার পরও সেই বর্বর সেপাইরা আমাকে ছাড়ল না। লাঠি আর ডাণ্ডা নিয়ে আমার লাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ঠোশ-ঠাশ করে পুরো শক্তি ব্যয় করে পিটাতে থাকল, সম্পূর্ণ তেমনিভাবে যেমন করে কসাইরা জবাই করা দুম্বা ঝুলিয়ে তার ভিতর বাতাস ভরে লাঠি দিয়ে পিটতে থাকে, যেন সহজে তার চামড়াটা ছিলে ফেলা যায়।

কয়েদীদের চামড়া ছিলার এ প্রক্রিয়াকে গোয়েন্দাওয়ালাদের পরিভাষায় নাম দেয়া হয়েছে 'তদন্ত ও সত্য উদঘাটন।'

কিছুক্ষণ পরই আহমাদ রাছেখ কোত্থেকে উদয় হল।

তার প্রশস্ত পা দুটোর সামনে শাস্তিদানের বিভিন্ন উপকরণ দেখা যাচ্ছে। এগুলো সে টেনে আনছিল। এ সব অস্ত্রের শব্দের ঝনঝনানী এমনভাবে ওঠছিল যে, তাতে অতি বড় বীরের শরীরেও কাঁপন না ধরিয়ে পারে না। সে

খুবই কঠিনভাবে আমাকে বলল ঃ

"এসো, আমরা চাই কিছু বল!"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আরো বলল ঃ

"কিন্তু মার্শাল আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন, যদি আমরা প্রতিদিন তোমাদের মধ্যে পঁঞ্চাশজন কুকুরকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলতে চাই, তাহলে তা করতে পারি।"

আমি অজ্ঞান হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তখন মনের মধ্যে আজব ধরনের এক রকম তৃপ্তি অনুভব করলাম। ভাবলাম, এখন মুক্তি সন্নিকটে। ক্ষণিকের ব্যাপার। মানুষের নামের কলংক এ হিংস্র প্রাণীগুলো আমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, আর আমি তাদেরকে পায়ে দলে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পৌঁছে যাব। ভাবনার কয়েকটা বিস্ময়কর মুহূর্ত আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আমি যখন মারা যাব, আমার কি শাহাদাতের মর্যাদা নসীব হবে?

আমি এধরনের পবিত্র ভাবনায় ডুবে ছিলাম। আমার উপর আবার আযাব শুরু হয়ে গেল। এটা নির্যাতনের অন্য পর্ব। এখন বর্বরতা ও হিংস্রতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। ভয়াবহ মারের ভিতর দিয়েই আমি রাছেখকে বললাম ঃ

"আমাকে দয়া করে বলো, তোমরা কি চাও, কী নিয়ে আমি কথা বলব?"

সে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, যা দ্বারা বিষয়টা কিছুটা স্পষ্ট হল। কিন্তু সেটা তরবারীর চেয়েও বেশী ধারালো ছিল। শব্দটি হল "ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন।"

আমি বিস্মিতভাবে বললাম ঃ

"ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর কোন্ বিষয় সম্পর্কে বলব?"

"তাদের গুপ্ত সংগঠন, ষড়যন্ত্র, অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রশিক্ষণদাতা এবং গ্রহণকারী। মোটকথা, সব ব্যাপারেই বল।"

সে মুখে বলল এসব, কিন্তু আমার উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল।

এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটল জানি না। আমি তখন অজ্ঞান। যখন জ্ঞান ফিরল, মনে হল যেন আমি স্বপ্নের জগতে রয়েছি। আধা দিন পার হয়ে গেছে। আহমাদ রাছেখ ব্যারাকে ফিরে গেছে। কিছু নতুন সেনা অফিসার এসে গেছে। সেপাই এক ধরনের ডেস্ক নিয়ে এলো, যা স্কুলের ক্লাসে থাকে। সেনা অফিসাররা ব্যারাকের এক কোণে বসে পড়ল। আমার মত অন্যান্য

হাজতীদেরকে এক একজন অফিসারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। আমাকে কিছু সময়ের জন্য তারা অবকাশ দিল। কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

এ নাজুক ও ভয়াবহ দিনটা পার হওয়ার আগেই তদন্তের মুহূর্তে আসল ঘটনাটা বুঝে ফেললাম। সেনা কর্মকর্তারা বন্দীদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলছিল যে, ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন অবশ্যই কোন ষড়যন্ত্র করেছে। এদিকে অভিযুক্তরা ছিলেন একেবারে হতভম্ব। তারা যদিও ইখওয়ানের কর্মী ছিলেন। কিন্তু সেনা অফিসাররা জোড়ালো কণ্ঠে বলছে যে, ইখ্ওয়ানীরা জামাল আব্দুন নাসের সরকারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, যেটা মার্শাল আব্দুল হাকীম আমেরের সেক্রেটারী শামছ বাদরান-এর নেতৃত্বে গঠিত মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগ সময় মত ধরে ফেলেছে। তবে তাদের শত যুক্তি সত্ত্বেও তারা কিছুই জানে না যে, ইখ্ওয়ান কোন্ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। খোদ বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাও এ ব্যাপারে কিছু জানে না। এ তদন্ত সামরিক গোয়েন্দাদের নেতৃত্বে সামরিক জেলখানায় হচ্ছে। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চাচ্ছে না, এ ব্যাপারে সিভিল গোয়েন্দা বিভাগ কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করুক। ঐ দিনগুলোতে মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগই মিসরের মূল শাসক ছিল। তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং আইন হিসেবে বিবেচিত হত। মিসরের আদালতের যে কোন রায়কে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারত। তার যে কোন সিদ্ধান্ত তারা রহিত করে দিতে পারত। কিন্তু তাদের ফায়সালা কেউ বাতিল করতে পারত না।

এ বিভাগের প্রধান হচ্ছে সাআদ জগলুল আব্দুল কারীম–যে মার্শাল আব্দুল হাকীমের দফতর-সেক্রেটারী শামস্ বাদরান-এর অধীনে কাজ করছে। যেহেতু আব্দুল হাকীম বিভিন্ন ঝামেলায় জর্জরিত, এ জন্য তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিজের অফিস সেক্রেটারীকে দিয়ে দিয়েছেন; যেন সে দেশের কল্যাণের জন্য যা ভাল মনে করে, পদক্ষেপ নেয়। সে জন্যই শাম্স বাদরান মহা ক্ষমতাধর একনায়ক হয়ে বসে গেছে। আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে যে ধরনের ইচ্ছে, ব্যবহার করছে। আব্দুল হাকীমের কাছে যাওয়া কিংবা তার কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা এ সবের কিছুই সে ধার ধারে না।

ব্যারাকের সেনা অফিসারদের কাছে এক একজন হাজতীকে তদন্তের জন্য ডাকা হচ্ছে। আর তাদের উপর এমন নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যার কারণে তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। হাজতী কিছুই বলতে পারছে না। কারণ সে ঘটনাই জানে না; কি বলবে! ফলে তাকে মেরে মেরে

রক্তাক্ত করে ফেলা হচ্ছে। এক পর্যায়ে সে বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডাকা হচ্ছে। তার সঙ্গেও সেই একই ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। এরপর তৃতীয় জন ...। তারপর চতুর্থ জন ...। জুলুমের ষ্টীমরোলার এভাবে একের পর এক চলছে ...।

সেপাইরা বন্দীদেরকে এমন ভীষণভাবে পিটায় যে, একপর্যায়ে তাদেরকে স্বীকার করে নিতে হয়, তারা সত্যিই অপরাধী। তদন্তকারী অফিসাররা শুধু এটুকু কথায় তুষ্ট থাকে না। বরং যে হাজতী অপরাধ স্বীকার করেছে তাকে প্রমাণ দিতে হয় যে, তার স্বীকারোক্তি মিথ্যা না এবং তার যুক্তির প্রতি অফিসারদের আস্থা সৃষ্টি হতে হবে। কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তি, যে আদৌ অপরাধ করেনি, সে কিভাবে, কোন্ যুক্তি দিয়ে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে! ফলে এ সব হতভাগার উপর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়।

ঐ রক্তাক্ত দিনগুলোতে যে সব কাহিনী আমি নিজে শুনেছি এবং যে সব বর্ণনা আমার সামনে দেয়া হয়েছে, তার একটা হচ্ছে "চালের বস্তার" ঘটনা। এ নামেই কাহিনীটা পরিচিত। ঘটনাটা এই ঃ

মুসলেহ জুরাইক নামে একজন শ্রমিক এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে কাজ করে। এ কোম্পানী দেশের বিভিন্ন অংশে সড়ক পাকা করে। ১৯৬০ সনের কথা। এ কোম্পানী দিময়াত শহরের কাছে কোন একটি সড়ক পাকা করছে। এই পুরো এলাকাটি ভাল জাতের চাল উৎপন্ন করার জন্য বিখ্যাত। মুসলেহ জুরাইক সড়কের কাম-কাজ সেরে কায়রো ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে, এমন সময় সে তার একজন সঙ্গী আহমাদ সাইয়েদ ইসমাইলের সামনে একটা প্রস্তাব রাখল ঃ

"আজ আমরা কাফারুল বিত্তীখ শহরতলী দিয়ে যাই। কাফারুল বিত্তীখ তো তেমন দূরেও নয়। ওখানে চালের একজন বড় ব্যবসায়ী আছেন। তার নাম হচ্ছে আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল। তিনি চালের একজন বড় ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত।"

চাউল কেনার পরিণতি

আব্দুল ফাত্তাহ ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূনের তৃতীয় ধারার একজন নেতা। হতভাগা মুসলেহ জুরাইক এ ব্যাপারটা আদৌ জানত না। মুসলেহ ও তার

সঙ্গী আহমাদ সাইয়েদ কাফারুল রওনা হল। উদ্দেশ্য হল দিময়াতের ভাল মানের এক বস্তা চাল কেনা। যদি এ দুজন হতভাগা ঘূর্ণাক্ষরেও এ ব্যাপারটি জানত যে, তাদের জন্য একটা ভয়ানক আযাব অপেক্ষা করছে, তাহলে তারা শুধু নিজেদের জন্য না, বরং ভবিষ্যত বংশধর সবার জন্য চাউল কেনা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিত।

দুই বন্ধু কাফারুল বিত্তীখ পৌছল। তারা আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে লাগল। তকদীর খারাপ বলতে হবে, ঘটনাক্রমে ঐ পথ দিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের একজন সদস্য ঘুরোঘুরি করছিল। তারা দুজন ঐ গোয়েন্দার কাছে আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলের ঠিকানাটা এখনো পুরোপুরি জিজ্ঞেস করে সারেনি, শুধু নামটি মুখে এসেছে, সেই গোয়েন্দা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল। তাদের কাছ থেকে I D কার্ড নিয়ে তাদের নাম ও ঠিকানা তার ডায়রীতে নোট করে রাখল। এরপর তারা কেন এসেছে, তার কারণ জিজ্ঞেস করে তাদেরকে উপদেশ দিল, এখ্খুনি যেন তারা এখান থেকে চলে যায় এবং ভবিষ্যতে এ এলাকায় আসা তো দূরের কথা মুখেও যেন এর নাম না নেয়।

মুসলেহ ও আহমাদ সাইয়েদ তখনি উল্টো পায়ে চলে গেল। চাল আর কিনল না। তারা এ ঘটনাটাকে সাধারণ একটা ব্যাপার মনে করল।

আস্তে আস্তে ঘটনাটা তারা একেবারে ভুলে গেল। কিন্তু সেই ইন্টেলিজেন্স-এর লোকটি গোয়েন্দা অফিসে সেই রিপোর্টটা জমা দিয়ে দিল।

কয়েক বছর চলে গেল। ১৯৬৫ সনের কথা। আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল গ্রেপ্তার হলেন। তদন্তের জন্য তাকে সামরিক জেলখানায় নিয়ে আসা হয়েছে মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের কাছে। সিভিল গোয়েন্দা বিভাগ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। অবশেষে ব্যাপারটি তাদের কানে এলো। তারাও এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল।

আব্দুল ফাত্তাহর ফাইলে যত রিপোর্ট এসেছে, যত লোকের নাম রেকর্ড করা হয়েছে, সবাইকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দিল গোয়েন্দা বিভাগ। মুসলেহ আর তার বন্ধু আহমাদ সাইয়েদ-এর উপরও মুসিবত আসল, যা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবেনি। এ দুজনকেও গ্রেপ্তার করা হল। সামরিক জেলখানায় তাদের উপর ভয়ানক নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। তদন্তকারী সামরিক অফিসাররা বারবার জিজ্ঞেস করছিল ঃ

"আচ্ছা, মুসলেহ! তুমি বল, কয়েক বছর আগে তুমি ও তোমার সঙ্গী কাফারুল বিত্তীখে গিয়ে আব্দুল ফাত্তাহকে কেন খুঁজছিলে? কি গোপন রহস্য ছিল?"

বেচারা মুসলেহ সোজাসুজি জবাব দিল ঃ

"স্যার, আমরা রোড পাকা করার কাজ সেরে কেবল একবস্তা চাল কেনার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম, যেহেতু দিময়াতী চাল হচ্ছে বাজারের সেরা।"

কিন্তু এ উত্তর তার শাস্তি বাড়ালো বৈ কমালো না। তার সর্বাঙ্গ লাঠির আঘাতে ফেটে ফেটে রক্তাক্ত হচ্ছে। হতভাগা আর্তনাদ করছে। তার মুখ থেকে আবোল-তাবোল বিভিন্ন কথা বেরুচ্ছে। এমন শব্দ বের হচ্ছে যার অর্থ কোন মাখলূক বুঝবে না। সে আসলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

মৃত্যু সব দিক থেকে তার উপর হামলা করছে অথচ সে মরছে না।

যখন জল্লাদ শাস্তি দিতে দিতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে এবং দম নেয়ার জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে তখন মুসলেহ চিৎকার দিয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে বলল ঃ

"মহান আল্লাহপাকের কসম! আমরা একমাত্র চাল কেনার জন্য আব্দুল ফাত্তাহর ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। হুজুর! শুধু একবস্তা চাউল খরিদ করার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম।"

কিন্তু সেনা অফিসার প্রত্যুত্তরে বলল ঃ

"কুত্তার বাচ্চারা! চালের বস্তার জন্য গিয়েছিলে, না কি অস্ত্রের বস্তার জন্য?"

মুসলেহ জুরাইক এ কথা শুনেই যেন মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। পাগলের মত বলল ঃ

"হুজুর! আপনি কি বললেন? অস্ত্রের বস্তা? হ্যাঁ, ... হ্যাঁ...

আমরা যখন কাফারুলে গিয়েছিলাম, তখন আমরা এ জন্যই গিয়েছিলাম। সত্য কোন কোন সময় প্রকাশ পেয়েই যায়। আমরা অস্ত্রের বস্তার জন্যই সেখানে গিয়েছিলাম। এটাই আমাদের প্রয়োজন ছিল সেখানে যাওয়ার।"

মুসলেহ পাগলের মত হাসল। শাস্তির ধারা থেমে গেল। এখন তদন্ত ভিন্নরূপ নিচ্ছে। তার গতি অন্য দিকে।

এক আজব তামাশার অবতারণা হয়েছে। এটা কি নতুন শাস্তির পূর্বলক্ষন, না বিদ্রূপ! বলা মুশকিল।

যাহোক, মুসলেহ জুরাইকের হাতকড়া খুলে দেয়া হল। আযাবও বন্ধ।

কারণ, সে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, সে এক বস্তা অস্ত্র কাফারুল থেকে অন্যত্র নিয়ে গেছে। আহমাদ সাইয়েদও মুসলেহের বিবরণকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সত্য বলে ঘোষণা করল। তারও হাত কড়া খুলে দেয়া হল এবং শাস্তি থেকেও নিস্তার পেল। এখন দুজনের সামনে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তারা এ বানোয়াট ঘটনাকে সত্য বলেই মেনে নেবে, না মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে!

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মধ্যেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সিভিল গোয়েন্দা বিভাগও ময়দানে নেমে গেছে। কেল্লার জেলখানার সিভিল গোয়েন্দা বিভাগের আসল হর্তাকর্তা কর্নেল আহমাদ ছালেহ দাউদ এলেন স্বয়ং তদন্ত পরিদর্শন করার জন্য। মুসলেহের জন্য এখন জরুরী হয়ে গেল, সে তার স্বীকারোক্তিতে যে সব অস্ত্রের কথা সে বলেছে, সেগুলো সে কোথায় রেখেছে তা তাকে বলতে হবে। কাফরুল বিত্তীখ থেকে সে অস্ত্রের বস্তা অন্যত্র পাচার করেছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা স্বীকারোক্তি। তা সত্ত্বেও তাকে সেই জায়গার নাম বলতে হবে। নয় তো তার মৃত্যু অবধারিত। মুসলেহ তখনি তার উত্তর ভেবে-চিন্তে ঠিক করে রেখেছে।

মুসলেহ ভাবল, "বর্তমান যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এর সম্পর্ক হল ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূনের সঙ্গে। তাদের বিরুদ্ধে এ অপারেশন। অতএব, কাল্পনিক অস্ত্রগুলো তাদের ঘাড়েই চাঁপিয়ে দেয়া উচিত। আমি তো আর ইখ্‌ওয়ান-টিক্‌ওয়ান করি না। আমার জান বাঁচলেই হল।"

এ কথা ভেবে তার মনের পর্দায় দুজন ইখ্‌ওয়ান সদস্যের ছবি ভেসে ওঠল। তারা তাদেরই মহল্লায় থাকেন। একজন আহমাদ শা'লান, অন্যজন জাকারিয়া আল-মাশতুলী।

তারা দুজনই কিছুদিন হল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরেছেন। তৃতীয় আরেকজন হচ্ছেন বদর আল-কাসাভী। (আল্লাহ তাআলা এ তিনজনের রূহের উপর ক্ষমা ও দয়ার বারি বর্ষন করুন। আমীন।)

মুসলেহ জবানবন্দীতে বলল ঃ

সে অস্ত্রগুলো এ তিনজন অথবা তাদের কোন একজনকে দিয়েছে। ঠিক মত তার মনে নেই। তার জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ফাইয়ুম জেল থেকে এখানে নিয়ে আসা হল। তাদের উপর এমন নিষ্ঠুরতা চালানো হল, যার ফলে তারা তিনজনই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। তাদের মধ্যে জাকারিয়া মাশতুলীর লাশ খোদ আমি বহন করেছি।

আল্লাহ তাআলা তার রহমতের ফুল তাদের উপর বর্ষন করুন। তাদেরকে মেরে মেরে শহীদ করে দেয়া হয়। অথচ শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্তও তারা জানতে পারেনি, "অস্ত্রের বস্তার" মূল ঘটনাটা কি!

জেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম ছিল, কোন বন্দী যদি কয়েদী অবস্থায় শাস্তির কারণে মারা যায়, তাহলে রেজিষ্ট্রার খাতায় তার নামের পূর্বে 'পলাতক' শব্দটি লিখে দেয়া হয়। জেলের রেকর্ড যখন পুলিশের হাতে পৌছত তখন তারা সেই কথিত 'পলাতক' শহীদদের ঘরে অভিযান চালাত। ঘরে ভাংচুর ও ধ্বংস-তাণ্ডব চালাত এবং যাকে সামনে পেত তার উপর নিপীড়ন চালাত। অনেক সময় সেই বাড়ীর পুরুষ ও নারীদেরকে জেলখানায় পর্যন্ত নিয়ে আসা হত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত যে, তারা 'পলাতকদের' পালাতে সাহায্য করেছে। অথচ 'পলাতকরা' জীবনের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে পৌছে গেছেন। বাকী মুসলেহ জুরাইক ও তার সঙ্গী আহমাদ সাইয়েদকে কেল্লা থেকে সামরিক জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তারা, যারা মূলত মিশরের আসল হর্তাকর্তা ছিল–কয়েকদিন পরই তাদেরকে মুক্তি দেয়।

ঐতিহাসিক মুহূর্ত

আমি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কখনো ভুলব না, যখন আমি কেল্লায় একবার দেখলাম তদন্তকারী অফিসাররা খানা খেতে চলে গেছে। মুসলেহ জুরাইকের কাছে এসে তাকে বললাম ঃ

"যে কথাটা তোমার মুখ থেকে বের হয়েছে (স্বীকারোক্তি) কোন সন্দেহ নেই যে, ওটা ভুল এবং বানোয়াট। কিন্তু এটাও হতে পারে, তোমার এ বিবৃতি তোমাকে লীমান তুররা জেলে পৌছে দিতে পারে।"

মুসলেহ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ঃ

"আপনার মতলব কি?"

আমি বিস্ময়ের সাথে তাকে বললাম ঃ

"তোমার স্বীকারোক্তির অর্থ হচ্ছে পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।"

এখন সে আমাকে কিছুটা গাম্ভীর্য এবং আতংকিত দৃষ্টিতে দেখল, বলল ঃ

"পরিষ্কার করে বলুন, আপনি আমার কাছ থেকে কি চাচ্ছেন?"

"যখন ঘটনাই ঘটেনি (চালের বস্তার বদলে অস্ত্রের বস্তা গ্রহণ) তখন তোমাকে অবশ্যই তোমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।"

তার দৃষ্টিতে যে আতংক ভাব ছিল সেটা কেটে গেল। এবার ঘৃণাভরে উঁচু কণ্ঠে আমাকে বলল ঃ

"মনে হচ্ছে আপনি একজন বেকুব।"

"আমি?"

"জি, খোদার কসম, যদি স্বীকারোক্তির ফলে আড়াইশ বছরও জেল খাটতে হয়, তবুও আমি আমার কথা থেকে একচুল পরিমাণ এদিক-সেদিক হব না।"

এবার তাকে বললাম ঃ

"আচ্ছা, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি সেনা কর্মকর্তাদেরকে আসল ঘটনাটা বুঝিয়ে দেব। অর্থাৎ অস্ত্রের বস্তা পাচারের ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা?"

এ কথা শুনে সে অঝোরে কেঁদে ফেলল। খোদার দোহাই দিয়ে আমাকে বলল, আমি যেন এ ধরনের কোন কথা অফিসারদেরকে না বলি।

আসলে এ সব সেনা অফিসারের সাথে আমার কথা বলারই বা কি প্রয়োজন! আমি তো নিজেই নানান নির্যাতন, বর্বরতা আর মুসিবতে নাজেহাল অবস্থায় আছি।

আমার ও মুসলেহের কথাবার্তা একদম বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, জেল অফিসাররা ফিরে আসছে। এখন তাদের উদর শরাব দিয়ে ভরা। মজলুম অসহায় বন্দীদের শাস্তি দিতে গিয়ে যে এনার্জি শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখন সেটা পূরণ হয়েছে।

ঐ দিনগুলোতে যে সব ঘটনা উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে একটি হল আহমাদ সালেহ দাউদের সেনা কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য কেল্লায় আগমন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তদন্তের গতি ও তার চাকা কোন্ দিকে ঘুরছে জানা। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর তিনি জেল প্রাঙ্গনে একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। আমাকে যেখানে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সেখান থেকে এ জায়গাটা কয়েক মিটার দূরে। আমি আহমাদ সালেহ দাউদকে বলতে শুনলাম ঃ

"বন্ধুরা! এ ব্যাপারটা সামনে রেখে তদন্ত করবে যে, একটা গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্ব আছে, যাতে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন-এর সকল সদস্য শরীক।"

জনৈক সেনা অফিসার তাকে বললেন ঃ

"তদন্ত করে যে ফলাফল বের হয়েছে তাতে বিষয়টা প্রমাণ হয় না।"

আহমাদ সালেহ ক্ষিপ্র ও ক্রুদ্ধভাবে তার কথা কেটে বললেন ঃ

"প্রেসিডেন্ট (জামাল আব্দুন নাসের) বলেছেন, দেশে এমন একটা সংগঠন অবশ্যই আছে। অতএব এমন একটা ঘাতক সংগঠনের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, বুঝলে তোমরা। এ বিষয়টি ভিত্তি করেই তোমাদের তদন্ত জারি রাখতে হবে। তোমাদের সাহস কোথায় গেছে? আমি দেখছি বেশ কিছু কয়েদী এখনো পা দিয়ে চলাফেরা করছে! কেন?"

সময়ের গতি যখন থেমে গেছে

আহমাদ সালেহ দাউদ পরিদর্শন করে চলে যাওয়ার পর বর্বরতার চাকা আবার ঘুরতে লাগল। অফিসারদের বৈঠকের কারণে কিছু সময়ের জন্য সেটা বন্ধ ছিল। এখন হিংস্রতা ও বর্বরতা বহু গুণ বেড়ে গেল, যেন আগামীতে কোন একজন হাজতীও পা দিয়ে ভর করে চলতে না পারে।

এ সব হায়েনা সমস্ত বন্দীকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। মনে হচ্ছে, এ সব নির্যাতনের কালো দিবসের মধ্যে সময়ের গতি একেবারে থেমে গেছে!

গোয়েন্দা ব্যারাকে আমি তিনদিন পড়ে রইলাম। একবার আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আরেকবার আমাকে তারা ভুলে গেছে। তখন আমি ব্যারাকের ফরশে উলঙ্গ বসে থাকতাম। বিশ্বাস করুন সদ্যজাত শিশুর মত সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

আমি দেখলাম, বিশালদেহী, সুশ্রী সুন্দর, সম্মানি ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে কেল্লায় আনা হচ্ছে। কিন্তু, তাদের শারীরিক ওজন, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সামাজিক মর্যাদা কর্তৃপক্ষের কাছে একটা মশার পাখার সমানও মর্যাদা পাবার যেন যোগ্য না।

সেনা অফিসাররা তাদের কাপড় খুলে নগ্ন করে ফেলছে। লাঠি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অত্যন্ত হিংস্রভাবে পিটাচ্ছে। দেখছে না, আঘাতটি শরীরের কোন অংশে লাগছে। এমন বর্বরতার সাথে আঘাত হানছে যে, হতভাগ্য মানুষগুলো মারের চোটে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। সব ধরনের শক্তি তাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের চোখমুখ ফুলে চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়

মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে! তবু জালেম হায়েনারা নির্দেশ দিচ্ছে তাদের সামনে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে একের পর এক বিরামহীন গতিতে। সাথে সাথে চলছে ঘুঁষি, থাপ্পড়, লাথি ও অশ্লীল গালি বৃষ্টিধারার মত। এ সব নিরপরাধরা জানে না, কোন্ অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তদন্তকারীরা তাদের কাছ থেকে এ স্বীকারোক্তি আশা করছে যে, তারা সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার আগেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু একজন লোক, যে আদৌ এ ধরনের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত না কিংবা সে জানে না যে, সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে; সে কিভাবে এ বানোয়াট কথা মেনে নিতে পারে! কিন্তু এ সব হায়েনার কোন পরোয়া নেই। তাদের চাই সেই স্বীকারোক্তি। একদিন আমার কাছেও একজন সেনা অফিসার বলল ঃ "পুরো জাতিটাই অপরাধী ও ষড়যন্ত্রকারী। তবে যারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে তারা ছাড়া।"

শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যদিও কিছু কয়েদী এ ধরনের স্বীকারোক্তি করে ফেলে এবং তাদের নির্যাতন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু খানিক পর যখন অফিসাররা বুঝতে পারে যে, তারা মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছে তখন তাদের উপর আরো দ্বিগুন আযাব শুরু হয়। তাদের উপর চলে আরো নৃশংষতা।

তৃতীয় অধ্যায়

বন্দীশালার প্রথম কয়েকদিন

আগস্ট ১৯৬৫ সনের শেষ দিনগুলোতে কেল্লার ভূতুড়ে জেলে এভাবেই আমার দিনগুলো কাটছিল। অবশেষে আমি বুঝে ফেললাম, আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মিলিটারী গোয়েন্দারা ইয়াহইয়া হুসাইনকে ধরতে চাচ্ছিল। এ বইটার প্রথমদিকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে কিছু ইংগিত দিয়ে এসেছি। তিনি যখন তার গ্রেপ্তারের বিষয়টা টের পেলেন তিনি পালিয়ে গেলেন। এ জন্যই গোয়েন্দাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এখন তাদেরকে ইয়াহ্ইয়া হুসাইনের ছাত্রজীবনের ও চাকুরীর সময়কার বন্ধু ও সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। যে-ই মাত্র তারা তার পালানোর খবর পেল, কয়েক ঘন্টার ভিতর তারা তার সমস্ত বন্ধু ও সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে ফেলল। যারই ইয়াহইয়া হুসাইনের সঙ্গে কোন ধরনের সম্পর্ক আছে, তাদের সবাইকে ধরা হল। কৃষি কলেজে ও বিমান চালনা প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট-এর অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক লোক ধরা পড়ে। মোটকথা, যাদের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রয়েছে সবার উপর আপদ নেমে এল। আমার সঙ্গে ইয়াহইয়ার বন্ধুত্ব ছিল। এ জন্য আমিও গ্রেপ্তার হলাম। ইয়াহ্ইয়াকে কেন্দ্র করে একশরও বেশী লোককে পাকড়াও করা হয়েছে। তাকেই ঘিরে তদন্ত হচ্ছে। তার সাথে কোন্ কোন্ লোকের সাংগঠনিক যোগাযোগ রয়েছে এ ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। মোটকথা, এ সব গ্রেপ্তারী নিয়ে আজব ধরনের তামাশা শুরু হয়েছে। নিচে তার কিছু উদাহরণ দেখুন।

আশ্চর্য ধরনের গ্রেপ্তারী

১. আব্দুর রউফ আব্দুন নাসের হচ্ছে এক অভিজাত পরিবারের আদরের ছেলে। তার বাবা হচ্ছেন সাবেক পার্লামেন্ট মেম্বার। আব্দুর রউফ ১৯৫২ সন থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডে ছিল এবং সেখানে ফার্মেসীর উপর পড়ালেখা করে। কেমিস্ট্রী ও ফার্মেসীতে বি-এ করার পর সে মিশর চলে এল। তারপর সে কি মনে করে বিমান চালনা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হল। সে পাইলট হয়ে গেল। আলকৃছরুল আ'ইনী হাইওয়েতে সে একটা ফার্মেসীর দোকান খুলল। তার সময় দুইভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। দোকানেও বসত আবার পাইলট হিসেবে ফ্লাইট নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেত। তার উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়। মুঠো ভরে ভরে টাকা কামাত। দোকানের ব্যবসার পাশাপাশি দেশের বাইরে ফ্লাইং-এর ওসিলায়ও বেশ কিছু ব্যবসা চলছিল। ধর্মকর্মের সঙ্গে তার দূরতম সম্পর্ক ছিল না। রাজনীতির সাথেও তার কোন পরিচয় ছিল না। পলিটিক্স-এর একটি অক্ষরও সে জানত না। কে ক্ষমতায় আসে, আর কে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়, ক্ষমতায় কাদের আসা উচিত, কাদের নয়–এ সব ব্যাপারে সে মোটেও ভাবত না। পরম আরাম ও বিলাসিতা আর আনন্দমুখর জীবন-যাপন সে করছিল।

তার মধ্যে কোন দোষ ছিল না। তবে একটা দোষ ছিল, সে যখন বিমান চালনা শিখছিল, সেই গ্রুপে ইয়াহইয়া হুসাইনও ছিল। এটাই তার কাল হল। তাকেও তদন্তের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। যখন সে লন্ডন থেকে আসছিল, কায়রো এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এয়ারপোর্টে তাকে বলা হল, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেরী না করে তাকে কেল্লায় নিয়ে আসা হয়। এখানে এনে তাকে এমন নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা হয় যে, মরে যাওয়ার উপক্রম হয়। পরে আব্দুর রউফ নিজেই আমাকে এ হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনায়। তাকে তার পা উপর দিকে বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে পেটানো হয়। তখন সে তার সঙ্গী আরো অনেক পাইলটকে এমনভাবে ঝুঁলতে দেখেছে, যাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন হল মুহাম্মাদ আল-গান্নাম, খালেদ সায়েফ, জিয়া তোপচী। তখন তার ধারণা হল, হয়ত মিশর এয়ার কোম্পানীর মধ্যে কোন দূর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে, এজন্য সরকার কোম্পানীর কর্মীদেরকে শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন এবং এ জন্যই তাদের সবাইকে এখানে আনা হয়েছে। আশ্চর্য

ব্যাপার হল, যখন তার ব্যাগটি তল্লাশি নেয়া হয়, তখন তার মধ্যে অনেক দামী দু-বোতল মদ পাওয়া যায়। এটাই প্রমাণ করে, এ লোক ইসলামের 'অপবাদ' থেকে মুক্ত। কিন্তু এ যুক্তি তার কোন কাজে আসেনি।

২. খালেদ সায়েফ কৃষি কলেজ ও বিমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দুটোতেই ইয়াহইয়া হুসাইনের ক্লাসমেট ছিল। তদন্তের সময় তার উপর এমন অত্যাচার চালান হয় যে, সে তা সহ্য করতে পারল না। সে স্বীকার করে নিল, ইখ্ওয়ানের সে সদস্য। অথচ এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তবে সে ইখ্ওয়ানের ব্যাপারে আবছা আবছা কিছু কথা শুনেছিল। তবু পুলিশী তদন্ত কিন্তু স্বীকারোক্তি আদায় পর্যন্ত সীমিত রইল না। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তার উছরা (সাংগঠনিক গ্রুপ) কোন্‌টি, যেখানে সে অংশগ্রহণ করে থাকে? সে বলল ঃ

"ইখ্ওয়ানের দুই ধরনের উছরা রয়েছে—একটা দেশী আরেকটা বিদেশী। তার সম্পর্ক হচ্ছে বিদেশী উছরার সঙ্গে।" তার এ মনগড়া জবানবন্দীর যুক্তিও ছিল। সে অহরহ বিদেশে যেত।

যখন তাকে আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল অর্থাৎ সে ইখ্ওয়ানকে কত চাঁদা দেয় এবং কোন্ লোক সে চাঁদা গ্রহণ করে? তখন সে মহা ফাঁপড়ে পড়ল। ভাবল, এখনই আসল রহস্য বের হয়ে যাবে এবং তদন্তকারীরা জেনে ফেলবে, সে এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছে সবই মিথ্যা। কিন্তু, তখনি সে একটা সুন্দর উত্তর মনে মনে বানিয়ে ফেলল। বলল ঃ

"একদিন আমি লিবারেশন পার্কের 'মসজিদে ওমর মুকাররম'এর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। এ সময় এক লোক এল। আমি তার নাম জানি না। সে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

"আপনি কি আল-আখ, অর্থাৎ ইখওয়ানের সদস্য?"

"জি, নিশ্চয়ই।"

এরপর লোকটি আমার কাছে ইখ্ওয়ানের জন্য ত্রিশ কুরশ্ চাইল। আমি দিয়ে দিলাম। ঠিক ঐ স্থানে আরেকদিন সে পঞ্চাশ কুরশ্ চাইল, আমি তাও দিয়ে দিলাম।"

গোয়েন্দা অফিসারদের সঙ্গে খালেদ সায়েফের কথাবার্তা কতখানি হাস্যকর এবং জ্বলন্ত মিথ্যা পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবে না।

অনুমান ছয় মাস পর ইয়াহ্ইয়া হুসাইনের বন্ধুদের মধ্যে যারা খোশ-

নসীব, তারা জালেমের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পান। কিছু লোক এক বছর পর, আবার কেউ দু'বছর পর। আবার কিছু এমন হতভাগা রয়েছেন যারা বইয়ের এ অধ্যায়টি লেখা পর্যন্ত জেলের বদ্ধ খাঁচায় রাত-দিন কাটাচ্ছেন। আমিও তাদের মধ্যে একজন। (এ অধ্যায়টি লেখা হয়েছে, ৫ই নভেম্বর ১৯৬৯ সনে লীমান তুররার জেলখানায়, বুধবার সন্ধ্যায়।)

ইয়াহ্ইয়া হুসাইনের কাহিনী

ইয়াহ্ইয়া হুসাইনের কাহিনী শুনুন ঃ

গোয়েন্দা পুলিশ স্টেট সিক্যুরিটি কোর্টে যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১২ নং ধারা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৬৫ অনুযায়ী নিম্ন লিখিত বিবরণী পেশ করে ঃ

১. তদন্তের ফলে সপ্তম আসামী মুহাম্মাদ জিয়া উদ্দিন আব্বাস তোপচী স্বীকার করেছে, পলাতক আসামী ইয়াহ্ইয়া হুসাইন তার মতই ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর গুপ্ত সংগঠনের সদস্য। তার সম্পর্ক সেই উছরার (সাংগঠনিক গ্রুপ) সঙ্গে যারা ইয়াহ্ইয়ার ঘরে ইজতেমাতে শরীক হত। আসামী ইয়াহ্ইয়া হুসাইন নিজের মাসিক আয়ের পাঁচ শতাংশ সংগঠনকে চাঁদা হিসেবে দেয়। তার বাড়ীতে জাপানী কুস্তী ও কুংফু ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র চালানোরও ট্রেনিং দেয়া হয়। সে একটা খঞ্জরও জোগাড় করেছে এবং আলী আসমাভী ও যয়নব আল গাযালী থেকে কয়েকবার সাংগঠনিক ধরনের চিঠিও নিয়েছে; যেন দেশের বাইরে যাওয়ার সময় এগুলো সঙ্গে নিয়ে যায় এবং ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর সংশ্লিষ্ট লোকদের হাতে –যারা জেদ্দা ও খার্তূমে রয়েছে–পৌঁছিয়ে দেয়।

আলী আসমাভী ১৯৬৫ সনে ইয়াহ্ইয়া হুসাইনকে এটাও বলেছিল, যখন সে ফ্লাই করার জন্য দেশের বাইরে যাবে, তখন সে যেন তার জন্য সাইলেন্সার লাগানো একটি রিভলবার কিনে নিয়ে আসে। আসামী ইয়াহ্ইয়া হুসাইন ১৯৬৫ সনের জুন মাসে আলী আসমাভীকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পাওয়ার হাউজ পরিদর্শন করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিভাবে বোমা মেরে এটা উড়িয়ে দেয়া যায়। সে অনেক বাড়ীতে টাইম বোমা লুকিয়ে রেখেছে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য। একবার গুপ্ত সংগঠনের আরেক সদস্য–যে একজন ইঞ্জিনিয়ার, আসামী ইয়াহ্ইয়া

হুসাইনের সঙ্গে এয়ারপোর্ট চেক করার জন্য আসে। তারা ভালভাবে যাচাই করে। পাওয়ার হাউজ মেশিনারী, টেলিফোন কানেকশন, ওয়াচ টাওয়ার এবং বিমান গাইড করার সিস্টেম সবই তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখল। উদ্দেশ্য হল নাশকতামূলক তৎপরতা চালানো।

আরো অভিযোগ আনা হয়, আলী আসমাভী অভিযুক্ত ইয়াহ্ইয়া হুসাইনকে জুলাই ১৯৬৫ সনে দায়িত্ব দেয় যেন সে কায়রো রেলওয়ে স্টেশনে চলে যায় এবং প্রেসিডেন্ট (জামাল আব্দুন নাসের) যখন রেল পথে যাবেন তখন তার উপর নজরদারী করবে এবং তারপর এ ব্যাপারে সে তার কাছে রিপোর্ট করবে।

আলী আসমাভী আগস্ট, ১৯৬৫ সনে আসামী ইয়াহ্ইয়াকে এটাও বলেছিল, যদি সে (আলী আসমাভী) ধরা পড়ে, তাহলে সে তারপর ফারুক মানশাভীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং তার কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিতে থাকবে। তাই, আলী আসমাভী যখন ধরা পড়ে যায় এবং আসামী ইয়াহ্ইয়া ফারূক মানশাভীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না, তখন সে যে কোন ভাবে হোক ফারূককে জানিয়ে দিল যে, সে খার্তূম পালিয়ে যাচ্ছে। এরপর ইয়াহ্ইয়া ও মানশাভীর মধ্যে কোন ধরনের যোগাযোগ আর হয়নি।"

২. ১২ নং আসামী ফারূক আব্বাস সাইয়েদ আহমাদ স্বীকার করেছে, ইয়াহ্ইয়া হুসাইন ১৯৬৫ সনে তাকে বলেছিল, সে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর গুপ্ত সংগঠনের সদস্য এবং এ সংগঠনটি শক্তি প্রয়োগ করে বর্তমান সরকার পরিবর্তন করতে চায়। তারা জাপানী খেলা কুংফু-ক্যারাটে ইত্যাদি শিখছে এবং সংগঠনের অভিযান সফল করার জন্যে তারা শারীরিক এক্সারসাইজ করছে। অভিযুক্ত আসামী ইয়াহ্ইয়া তাকে (ফারূক আব্বাসকে) এটাও পরামর্শ দিয়েছিল যেন সে সেই গুপ্ত সংগঠনে যোগ দেয়। ফারূক আব্বাস এ কথাও স্বীকার করে যে, ইয়াহ্ইয়া ২২ আগস্ট, ১৯৬৫ তাকে বলেছিল, ফারূক মানশাভীকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এ খবরটি দেয়ার জন্য যে, সংগঠনের কিছু সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু ফারূক আব্বাস ফারূক মানশাভীর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পায়নি। (রিপোর্ট শেষ)

ইয়াহ্ইয়া হুসাইনের বিরুদ্ধে স্টেট সিক্যুরিটি কোর্টে তার অনুপস্থিতিতে মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়। সে কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন জামালুদ্দীন

মাহমুদ। মোকাদ্দমা শুনানির সময় জামালুদ্দীন মাহমুদ মারা যান। এরপর মেজর জেনারেল হাসান আত-তামিমীর সামনে দ্বিতীয়বার মোকাদ্দমা পেশ করা হয়।

কোর্টের পক্ষ থেকে ইয়াহ্ইয়া হুসাইনকে তার অনুপস্থিতিতে পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। সে মুহূর্তে ইয়াহ্ইয়া হুসাইন সুদানের পার্কে বসে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করছিল।

আদালতের রায় অনুযায়ী, ইয়াহ্ইয়ার মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে, সে পর্যবেক্ষণ করেছে, যোগাযোগ করেছে, বার্তা পৌঁছিয়েছে, সাক্ষাত করেছে, বলেছে এবং শুনেছে। অতএব যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড তার জন্য প্রযোজ্য।

পুলিশের খাতায় তার নামের পূর্বে 'পলাতক' শব্দটা লেখা রয়েছে। বস্তুত পক্ষে সেই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি, যে আসলেই পলাতক। নয়তো এ ছাড়া যতগুলো লোকের নামের আগে পলাতক শব্দটা লেখা আছে, তারা পলাতক ছিল না। তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কেল্লার জেলখানা

এখন কেল্লার জেলখানার কিছু অবস্থা শুনুন। এটা হচ্ছে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কেল্লার একাংশ। এ কেল্লাতেই মুহাম্মাদ আলী পাশা মামলুকদের শিরচ্ছেদ করত। যে অংশে আমরা রয়েছি সেটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইংরেজরা তা মেরামত করেছে। এখানে তিনশর বেশী বন্দী থাকার সুযোগ নেই। গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত তদন্ত কার্যক্রম এখানেই হচ্ছিল। আমাদের ইনভিস্টিগেশনও এখানেই হচ্ছিল। সংকীর্ণ, অন্ধকার ও দম বন্ধ গুমোট একেকটি সেলে চার চার পাঁচজন করে হাজতীকে রাখা হয়েছে। অথচ এক এক সেলে দুজন লোকের বেশি থাকা কোনভাবেই সম্ভব না। কিন্তু সরকারী হায়েনারা চাল ও গমের বস্তার মত নিরীহ্ বন্দীদেরকে গাদাগাদি করে রেখেছে।

ঐ সময় কেল্লার জেলে চারশ লোক বন্দী ছিল। এটা হচ্ছে ইখ্ওয়ানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতার প্রাথমিক অবস্থা। আরেকটা তদন্ত চলছিল সামরিক জেলখানায়। ফাইয়ূম জেলখানাতেও দু'শ কয়েদী ছিল। তারা হচ্ছে সে সব হতভাগা, যারা ১৯৫৪ সনে পিপল্স্ কোর্টের ঘোষিত দশ বছরের জেল পুরোপুরি খেটেছেন। কিন্তু এখন আবার তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

আমি কেল্লার জেলে অল্প কয়েকদিন কাটিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার ধারণা একেবারেই নেতিবাচক।

মনে হয় সেখানে কোন বন্দীকে আদৌ খানা দেয়া হয় না। আসলে কি, ওখানে আমাদের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার সামনে ক্ষুধার অনুভূতি কিংবা খাওয়ার চাহিদার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনে পড়ছে, যতদিন আমি কেল্লার জেলে ছিলাম খাবার মুখে নেবার সুযোগ হয়নি। হ্যাঁ, এটুকু মনে আছে, এক সন্ধ্যায় আমি নির্মম শাস্তির চুলায় জ্বলছিলাম, তখন একজন সেপাই আমাকে আধা কাপ চা খেতে দেয়। সেই চাটাও ছিল একেবারে বিস্বাদ, খাওয়ার অনুপযুক্ত। আমার এ কথাটিও মনে আছে, হতভাগা যাকারিয়া আল-মাশ্‌তুলীর যখন প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি তার মুখে সামান্য পনির ঢুকানোর চেষ্টা করেছি। আমি জানতাম না পনির কোত্থেকে এসেছে। পরে জানতে পেরেছি, কেল্লার জেলে একজন ঠিকাদার বন্দীদের খানা সাপ্লাই দেয়। সে এর বদলে প্রত্যেক বন্দীর কাছ থেকে কিছু না কিছু পয়সা অবশ্যই আদায় করত। যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা সময় পার করছিলাম, কিছু লোকের জন্য অর্থ উপার্জনের ভাল সুযোগ এসে যায়। ঠিকাদার ভাল করেই জানত, তার দাবীর মুখে কারোর পক্ষে কথা বলার সাহস নেই। কারণ তার হাতেই রয়েছে খানা সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব। তার সামনে সব বন্দী অসহায়।

কারাগারের সেলগুলো একটা লম্বা সুড়ঙ্গের ভিতর, যেটা দুদিক দিয়ে খোলা। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। যখন কোন লোককে তদন্তের জন্য ডাকা হয়, তখন একজন বয়স্ক গার্ড সেলের দরজা খুলে দেয়। যে লোককে ডাকা হয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে, সে যেন দৌড় দিয়ে তদন্ত রুমে ঢুকে। যদি সে নিজের উপর দয়া করতে চায় এবং কিছু না কিছু আযাব থেকে নিস্কৃতি পেতে চায়, তাকে অবশ্যই তদন্তকারী টিমের সামনে নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলতে হবে এবং দৌড় দেয়া অবস্থায়ই তাকে তার শরীর থেকে কাপড় খুলে ছুড়ে ফেলতে হবে। এতে সে প্রাথমিক কিছু শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে।

তদন্তাধীন লোকগুলোকে দুদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় তদন্তরুমে রাখা হত। এরপর যখন তারা সেলে ফিরে আসে তখন তাদেরকে কাপড় খোঁজার কোন সুযোগ দেয়া হয় না। যদি কখনো হঠাৎ কোন কাপড় পাওয়াও যেত, তখন দেখা যেত যে, রক্ত দিয়ে কাপড় ভরে আছে এবং সেগুলো ছেঁড়া-ফাটা। এমনও হত যে, কাপড় আদৌ পাওয়া যেত না; তারা বিবস্ত্র অবস্থায়ই সেলে ঢুকত।

যতগুলো লোক কেল্লার বন্দীশালায় ছিল, সবাই গভীর ও ভয়ঙ্কর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ছিল। সেখানে কোন ডাক্তার নেই। প্রাথমিক চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নেই। তবে মরিস নামে একজন ভারী ও ভুড়িওয়ালা লোক ছিল, তাকে ডাক্তার হিসাবে বলা হত। কিন্তু সে কখনো কোন আহত লোকের ব্যাণ্ডেজ বা পট্টি লাগায়নি; বরং আমরা শুনেছি, অনেক আহত ইখ্ওয়ানকে প্রাণে মেরে ফেলার জঘন্য কাজে সে শরীক থাকত।

কেল্লার দিনগুলোর যে সব কথা আমার মনে আছে, তার মধ্যে একটা হল একজন সুদর্শন ও চতুর যুবকের কথা মনে পড়ে। ব্যারাকে যখন তদন্ত চলত, তখন সে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। খুবই লাজুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাত। আমি তার আসলরূপ বুঝতে পারিনি; বরং প্রথমবার যখন তাকে দেখলাম, ভাবলাম, সেও একজন বন্দী। যাদের তদন্ত চলছিল, সে তাদের প্রতি ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তাকাত। পরে বুঝতে পারলাম, সে একজন জুনিয়র অফিসার। এখন সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

আমি এসব ভাবছিলাম, বেশী সময় যায়নি। আমাকে সেই অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হল যেন সে তদন্ত করার নিয়ম পদ্ধতি প্রাকটিস করার চেষ্টা আমার উপর টর্চারিং করে শুরু করতে পারে।

একটি ছোট টেবিলে আমার সম্পর্কিত কাগজগুলো (যেগুলো আমার ঠিকানা থেকে ওঠিয়ে আনা হয়েছে) পড়ে আছে। এর মধ্যে কিছু আমার ব্যক্তিগত চিঠি আছে, যার বিষয়বস্তু ও প্রেরকের নাম এখন আমার মনে নেই। টেবিলে আরো রয়েছে ইসলামের ইতিহাস এবং খৃস্টবাদের ওপর লেখা আমার কয়েকটা প্রতিবেদন ও নোট্স এবং ১৯৬৫ সনের ছোট্ট একটা ডায়েরী। সেই চালাক ও সুদর্শন যুবকটা এ কাগজগুলো ওলোট-পালোট করছে। এরপর আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ

"তোমার ঘরে কি ফোন আছে?"

"না।"

উত্তর শুনামাত্র সেই যুবক একটা শক্তিশালী ঘুষি আমার মুখের উপর বসিয়ে দিল। ঘুষির প্রচণ্ডতা এত মারাত্মক ছিল, ভাবলাম, হয়ত আমার চোখ গলে বেরিয়ে পড়বে। কারণ, আঘাতটি চোখের কাছেই লেগেছে। সে আমার আরো কাছে এলো। কানফাটা শব্দে গর্জন করে ওঠল ঃ

"ঐ কুত্তার বাচ্চা! তোর মিথ্যা জবানবন্দী দিয়ে কি তদন্ত শুরু হবে?"

আমার আক্কেল তো তাজ্জব। এ ছোকরা বলে কি? আমার ঘরে ফোন কোথায়? আমি হতভাগা ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললাম ঃ

"আমি কসম খেয়ে বলছি আমার ঘরে ফোন নেই।"

এটা বলতে দেরি হয়নি, তার আগেই সেই সুদর্শন যুবকটির থাপ্পড় ও লাথি আমার ওপর বিরামহীনভাবে পরতে লাগল। এ মানুষটিই কিছুক্ষন আগে আমরা অসহায় বদনসীব লোকদের দিকে দয়া ও মেহেরবানী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছে। কিন্তু এখন সে হিংস্র হায়েনার রূপ নিয়েছে।

আমি তাকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করলাম, "আমার ঘরে টেলিফোন নেই। যদি আপনার সন্দেহ হয়, তাহলে জেলখানার ফোন দিয়ে টেলিফোন অফিসে জেনে নিন। যদি আমার ঘরে টেলিফোন থেকে থাকে, তাহলে অস্বীকার করে আমার কি লাভ! আর সরকার তো টেলিফোন ব্যবহার করা এখনো নিষিদ্ধ করেনি।" কিন্তু কাকুতি-মিনতি সব বিফল গেল।

অফিসারটিকে খুব গোঁয়াড় এবং হাবা ধরনের মনে হল। আমার আশংকা হল, হয়ত সে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি যখন বুঝলাম, সত্যকথা বলতে থাকলে লোকটি আমাকে মেরেই ফেলবে, তখন আমি স্বীকার করে নিলাম ঃ

"জি, আমার ঘরে টেলিফোন আছে।"

এ কথার সাথে সাথে সেই সুদর্শন যুবকের চেহারাখানি স্মিত হাসিতে ভরে গেল। সফল তদন্তের হাসি। আমি ভাবলাম, হয়ত এ অচল মুহূর্ত কেটে গেছে। কিন্তু আচমকা সে টেলিফোন নাম্বারটি জিজ্ঞেস করে বসল। আমি হতচকিত হয়ে পড়লাম। আমি আন্দাজ করে একটি নাম্বার বলে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, সে টেবিলে রাখা আমার ছোট ডায়েরীখানা পড়ছে। আমি থেমে গেলাম। আমার মনে পড়ল, নববর্ষের শুরুতে যখন আমিও নতুন ডায়েরী কিনলাম, তখন তার প্রথম পাতাটি লিখে পুরো পৃষ্ঠা ভরে ফেলেছি। নাম–ঠিকানা–টেলিফোন নাম্বার।

আমার এক বন্ধুর টেলিফোন নাম্বার ছিল। সেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, তার নাম্বার ডায়েরীতে টুকে রাখতে। আমি সেই যুবক অফিসারের সামনে সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম্বারটি বলে ফেললাম। কিন্তু, হায় পরিতাপ! সুদর্শন অফিসার ও তার সহযোগী হায়েনাদের নির্যাতন তাতে একটুও কমল না; বরং বৃষ্টিধারার মত চলতে থাকল। মুখ থেকে বিরামহীন অশ্লীল গালি বর্ষণ এবং

হাত ও ফৌজী বুটের লাথি আমাকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষেপ করল।

অফিসারটি চিবিয়ে চিবিয়ে আমাকে বলল ঃ

"কুত্তার বাচ্চা! অস্বীকার করে কি ফায়দা, আমরা তোর একটি একটি করে সব কথা জানি।"

অন্য একজন সেনা অফিসার আব্দুল মুনইম ছায়রাফী আমাকে এ পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার করল। কিন্তু ততক্ষণে ও আমাকে এত মেরেছে যে, মৃত্যু আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তার ধারণা, আমি তাদের একজন যারা ইখ্ওয়ানের গুপ্ত সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ কারণেই সে চাচ্ছিল যেন আমি গুপ্ত শাখার নেতা পর্যায়ের যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বলি।

কিন্তু তার ও অন্যান্যদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, মিথ্যা ও অমুলক ছিল। ইখ্ওয়ানের কোন গুপ্ত শাখা-ই ছিল না। এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত কি বলা যেতে পারে; কিন্তু অস্বীকার করলেও উপায় নেই। মারতে মারতে মেরেই ফেলবে।

বুদ্ধিমান হচ্ছে সে, যে এদের প্রশ্নের সাথে সাথে উত্তর দিতে থাকে। যে কোন উত্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া এবং উত্তর দিতে কোন ধরনের চিন্তা না করে। অনবরত বলতে থাকবে। যে অন্যায় সে করে নাই, তাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে। তাকে হতে হবে উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। নিপুনভাবে ঘটনা সাজাতে তাকে হতে হবে দক্ষ খেলোয়ার। সব ধরনের সংশয়ের জঞ্জাল থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তদন্তকারী অফিসার এ সব মনগড়া কাহিনীতে মিথ্যার গন্ধ পর্যন্ত যেন না পায়। এ সব তাকে করতে হবে। নয় তো তার জন্য আছে মর্মান্তিক শাস্তি।

আব্দুল মুনইম ছায়রাফী আমাকে জেলখানার আঙ্গিনায় নিয়ে এলো। আমরা দুজন এককোণে বসে আছি। সে আমার সাথে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার ভাব দেখাতে লাগল। তাতে আমার মনে কিছুটা প্রশান্তি ফিরে এল। সে খুবই সরলতার ভাব করে আমার থেকে বিশবারের মত জানতে চাইল, ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর গোপন সংগঠন, তার পাঁচ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমাণ্ড, এতে কে কে রয়েছে এবং কোথায় তাদের অবস্থান—এ সব ব্যাপারে বিশদ বিবরণ। এগুলোই তার জিজ্ঞাসা আমার কাছে। আমি অনুমান করে নিলাম, আমাদের কথাবার্তা খুবই আনন্দময় পরিবেশে হচ্ছে। হয়ত আমি যা বলব সে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে। তাই আমিও তাকে খুবই সরলতার সাথে উত্তর

দিলাম ঃ

"পাঁচ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমাণ্ড রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমি মোটেও জানি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ধরনের কোন কমিটি গঠনই করা হয়নি এবং ইখ্ওয়ানের গুপ্ত সংগঠন বলতে কোন জিনিস নেই।"

"তোমার অনুমানের ভিত্তি কি?"

"এটা শুধু আমার অনুমানই নয়, বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইখ্ওয়ানের কোন গুপ্ত শাখা নেই।"

"তার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে, তোমার সাথে ইখ্ওয়ানের গোপন শাখার কোন সম্পর্ক নেই?"

"অবশ্যই নেই।"

আব্দুল মুনইম ছায়রাফী বলল ঃ

"মনে হচ্ছে, তোমার সাথে কোমল ব্যবহার ও ভদ্র আচরণ একেবারে বৃথা।"

এটুকু বলেই যে লোকটা বাহ্যত নরম সুরে কথা বলছে, মুহূর্তে সে হিংস্র দানবে পরিণত হল। সে এমন জোরে একটা গর্জন করে উঠল যে, তা শুনামাত্রই চতুর্দিক থেকে জল্লাদরা ধেয়ে আসল। তারা আমার কাপড় টেনে খুলে ফেলল।

আব্দুল মুনইম আমাকে কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিল। তারা আমাকে কিল, ঘুষি, লাথি, গালি দিতে দিতে নির্যাতন ক্যাম্পে নিয়ে চলল। ও আমার খোদা! এখন তুমি আমার শেষ ভরসা।

নির্যাতন সেলে আমার ওপর বর্বরতার তুফান বয়ে যাচ্ছে। এখানকার ক্যালেণ্ডারে রাত-দিনের কোন তফাৎ নেই। আযাব বিরামহীনভাবে চলছে। সীমাহীন–যার শেষ হওয়ার কোন আশা নেই। আমাদের এ হুশটুকু থাকত না, আমরা কি এবং কোথায় আছি! কখনো আমরা নিজেদেরকে টর্চারিং সেলে পেতাম, আবার কখনো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, কখনো টয়লেটের মধ্যে। অনুভূতিহীন, অজ্ঞান। অবস্থা এমন হয়ে গেছে যেন, জুলুম, নির্যাতন ও হিংস্রতার কালো মেঘ একের পর এক আমাদের শিয়রে উপস্থিত হচ্ছে।

নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় আমরা আধমরা হয়ে যেতাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, অভিজাত লোকদেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে ধরে আনা হচ্ছে। কোন অপরাধ তারা করেনি। পাষাণ হৃদয় অফিসাররা তাদেরকে হিংস্র প্রাণীর মত ছিঁড়ে-ফেঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করছে। তাদেরকে এমন গুপ্ত কথা জিজ্ঞাসাবাদ

করা হচ্ছে যে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। প্রতিটি ব্যক্তি আযাবের চুল্লীতে জ্বলছে।

কেল্লার জেলখানার রক্তাক্ত নাটক একদিন শেষ হল। ষাটেরও বেশি নিরীহ লোককে এ নাটকে প্রাণ দিতে হল। চার শ'র কাছাকাছি লোক মারাত্মক যখমে ক্ষত-বিক্ষত হল। জেলখানার সামনে আমরা জমায়েত হলাম। পুরো আঙ্গিনাটি ভরে গেল। লাঠি, চাবুক এবং নির্যাতনের অন্যান্য উপকরণ সব গায়েব। এমনকি যারা নির্যাতন চালাত সে সব পাষণ্ডের চেহারাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উপস্থিত কেউ-ই এ নতুন তৎপরতার গোপন রহস্য বুঝতে পারছে না।

যে ছোট্ট দরজা দিয়ে আমরা বাইরের জগতকে বিদায় জানিয়ে কেল্লার জেলখানায় ঢুকেছিলাম, সেই দরজা দিয়ে একজন মধ্য বয়সের লোক ভিতরে এল। দুর্বল, হ্যাংলা-পাতলা, চেহারায় মাংস কম এবং হাঁড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখে একটা সিগারেট চেপে রেখেছে। তার সাথে রয়েছে ত্রিশ বছরের একজন যুবক, গৌরবর্ণ নাদুস-নুদুস শরীর।

যুবকটি আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"ইনি হচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। আপনাদের অবস্থা চেক করতে এসেছেন। আপনারা ভয় পাবেন না। নির্যাতনের ধারা শেষ হয়ে গেছে। যাদের মারাত্মক আঘাত আছে তারা হাত তুলুন।"

তার ঘোষণায় অধিকাংশ লোকই হাত তুলল। এরা যে আঘাত পেয়েছে তা মারাত্মকের চেয়েও বেশী।

ডাক্তার লাইনের ভিতর দিয়ে চলছে। আহতদের দেখে তার চেহারায় দুঃখ, বেদনা, বিষন্ন ও সহমর্মিতার ভাব ফুটে ওঠছে। সে যখন কারো গভীর আঘাত দেখছে, তখন সে প্রকাশ্যে জল্লাদদের উপর অভিশাপ বর্ষন করছে এবং তার সহযোগীকে হুকুম দিচ্ছে, যেন আহত ব্যক্তির নাম তালিকায় লেখা হয়। এটা দেখে সমস্ত কয়েদীর সাহস ফিরে আসে। তারা সরকারকে গালি দিতে লাগল এবং জালেম ও জুলুমের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত দিতে লাগল।

ডাক্তারও মাথা দুলিয়ে তাদের আবেগ ও জযবাকে সমর্থন দিচ্ছে ও তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এভাবে সে এক এক করে প্রতিটি আহত লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছে।

এ ডাক্তার হচ্ছে বিগ্রেডিয়ার আহমাদ রুশদী। আসলে সে ডাক্তার নয়। আবু যা'বাল নির্যাতন সেলের কমাণ্ডার। ব্যাপারটা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল। আমরা আবু যা'বাল পৌঁছামাত্র বিগ্রেডিয়ার রুশদী তাদের প্রত্যেককে আচ্ছামত ধোলাই করল যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কেল্লায় যখন বন্দীরা তাকে নিজেদের ক্ষত স্থানগুলো দেখাচ্ছিল, তখনই আমি তার হাবভাব দেখে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম যে, তার ডাক্তারী ছদ্মবেশ হচ্ছে একটা নাটক। এর পেছনে কোন জঘন্য ইবলিসী কারসাজি কাজ করছে। সে কারণেই আমার ক্ষতগুলো মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেখাইনি। যদিও আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি, তবুও তার জুলুম থেকে আমিও রেহাই পাইনি।

আমরা মিলিটারী পুলিশের বদ্ধ গাড়ীতে করে আবু যা'বাল জেলখানার দিকে রওনা দিলাম। এ সব গাড়ীর পেছন দরজায় মিলিটারী পুলিশের সেপাইরা উর্দি পরে বসে আছে। সড়কের ওপর দিয়ে এসব গাড়ী যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষ মনে করবে এগুলো আর্মির জোয়ানদের নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এরা তো হচ্ছে মজলুম বন্দীর কাফেলা–যারা নিরপরাধ। তাদের একটাই অপরাধ, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)কে ভালবাসে এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে তারা সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

বন্দী হওয়ার আগে আমিও অনেক সময় এ ধরনের গাড়ী সড়কে দেখতে পেতাম। আমিও তাই ভাবতাম যা সাধারণ মানুষ ভাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, এসব ফৌজী গাড়ী আমাদের ঐ সব ভাইকে ভরে নিয়ে যায়, যারা সত্য পথের দিশারী এবং দ্বীনে ইসলামের রাহবার। আমাদের গাড়ীতে সওয়ার হয়েছে ত্রিশজন। বদর আল-কুসাইবীও আমাদের সঙ্গে আছেন। তার যখম ছিল খুবই মারাত্মক। এ জন্য তাকে কম্বলে শুইয়ে দিয়ে সেটা আমরা কয়েকজন ধরে রেখেছি। (আবু যা'বাল পৌঁছার আধা ঘন্টা পরেই তিনি মারা যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজি'উন।)

আজব শহর আজব দেশ

সড়ক দিয়ে গাড়ী যখন চলছে, আমি বাইরে উঁকি দিয়ে মিসরের সাধারণ জনতাকে দেখছিলাম। তারা সেভাবেই হাটছে, চলছে, যেভাবে পূর্বে ছিল। জীবনের গতিতে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। সময়ের চাকা নিজ

প্রকৃতিতে ঘুরছে। কোন লোকেরই এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যে, এখানে কি হচ্ছে। মুকাশ্‌শারায় (মামলুকদের আমলে মিসরের নির্যাতন সেলকে মুকাশ্‌শারা বলা হত) কোন্‌ রক্তের হোলী খেলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না। সড়ক দিয়ে সাঁ সাঁ করে মোটর যান চলছে। অগণিত গাড়ী। সড়কের দুপাশ দিয়ে পথচারিদের বিশাল যাত্রা। বাসস্ট্যাণ্ডে যুবক যুবতীরা প্রেমের লুকোচুরি খেলছে, হাসি তামাশা করছে। জীবনের স্পন্দন সব জায়গায় বিরাজিত।

আমার মনে আছে, গাড়ীতে যতগুলো লোক আমাদের সফর সঙ্গী ছিলেন, তাদের চেহারাগুলো উদ্ভাসিত। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি। বুঝা যাচ্ছিল, মর্মান্তিক শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে তাদের মন আনন্দে আত্মহারা। আমাদের সাথে একজন যুবক ছিল যে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। তার মধ্যে সাহস বলতে কিছু ছিল না। তদন্ত অফিসারদের সামনে সে যা কিছু করেছে তা ও স্বীকার করত এবং যা করেনি তাও স্বীকার করত। আমরা তার অধৈর্যের কারণে তাকে অনেক সময় তিরস্কার করতাম এবং তাকে বুঝাতাম, উপদেশ দিতাম, "দেখ মুসিবতের সময় ধৈর্য্যধারণ করা উচিত। মনের মধ্যে সাহস রাখ।" কিন্তু সে কারোর কথা শুনত না। তার ধারণা হচ্ছে, "এখন তদন্তের পর্ব শেষ হয়ে গেছে এবং সবাই তাদের অপরাধের জন্য বিভিন্ন দণ্ড পেয়ে গেছে। শাস্তির আদেশ জারি হয়ে গেছে। আবু যা'বাল জেলে আমাদের স্থানান্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা। যখন আমরা আবু যা'বাল পৌঁছুব তখন সবাই জেনে নেব কার কী শাস্তি হয়েছে।"

একে আমি অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলাম। বললাম ঃ

"শাস্তির রায় দেয়ার জন্য আদালতী কার্যক্রম এবং কতগুলো বিধি-বিধান আছে সেগুলো হওয়া একান্ত জরুরী।"

কিন্তু সে বলল ঃ

"দোস্ত! মিশরে এ সব বিষয়ের প্রতি কেউ কোন তোয়াক্কা করে না।"

তারপর সে অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মকভাবে ঠোঁট নামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল ঃ

"আইন? আদালত? আইন অনুযায়ী কার্যক্রম? এ সব আপনি কি বলছেন? আপনি ভুলে গেছেন যে, আপনি মিশরে থাকেন। এটা সেই মিশর যে হচ্ছে একটা আজব দেশ, আজব শহর।"

কোন সন্দেহ নেই, তার যুক্তি আমার যুক্তির তুলনায় বাস্তবতার বেশী কাছাকাছি। ছেলেটা আবার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ

"লীমান তুররা (আবু যা'বাল জেলখানায়) পৌঁছে আমাদের উচিত হবে, সরকারের সমর্থক বনে যাওয়া। তখনি সরকার আমাদেরকে ছেড়ে দেবে। চাই আমরা তার কাছে যত অপরাধ করি না কেন।

সত্যিই আমাদের ব্যাপারটা কতই না হৃদয়বিদারক ছিল। সব সময় দুঃখ ও ব্যথা আমাদের চারপাশে ঘুরোঘুরি করছে। আমাদের সাথে কেন এ ধরনের অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে? তার ভিত্তি কি? কার খাতিরে এ সব করা হচ্ছে? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার মনে আসছে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন ভাববার অবকাশও নেই। জালেম হায়েনাদের গর্জনে সব চেতনা বিলীন হয়ে যায়। আবার শুরু হয়ে যায় আঘাত ও নির্যাতন। তারা যেন সেই আঘাতে লবন ছিটিয়ে জীবনকে আরো দুর্বিসহ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আবু যা'বাল জেলখানা

দিনটি শনিবার। আসরের সময় আমরা আবু যা'বাল জেলখানায় পৌঁছলাম। নির্যাতনের পর্ব শেষ হওয়াতে আমরা দৃশ্যত খুবই আনন্দ বোধ করছিলাম। সে সময় আমাদের সবার এই ধারণাই ছিল। কেননা, গোয়েন্দাওয়ালারা ভাল করেই অনুমান করে নিয়েছিল, নির্যাতন চালিয়ে কোন কাজ হবে না। এখন আমরা কিছু দিন আবু যা'বালে কাটাব; যে পর্যন্ত আমাদের ঘাগুলো সেরে না ওঠে। এরপর আমরা সবাই নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের দিকে পা বাড়াবো।

এ রকম ধারণা করার কারণে আমাদের মাঝে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। এ জন্যই যখন গাড়ী থেকে নামিয়ে আমাদেরকে আবু যা'বাল জেল-এর কর্মকর্তাদের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছিল, তখন আমরা হাসি-তামাশা করছিলাম।

জেলের একজন কর্মকর্তা যখন বন্দীদের গ্রহণ করছিল, তখন সে এক একজন করে গুনে নিচ্ছিল। তাতে আমাদেরকে যে সব সেপাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তাদের একজন বলল ঃ

"মিস্টার ইসমাইল! ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদেরকে নির্দ্বিধায় নিয়ে যাও। গণনার মধ্যে কোন ঘাটতি থেকে থাকলে তা আমি পূরণ করে দেব।"

এ কথা শুনে মিস্টার ইসমাইল কোন ধরনের গণনা ছাড়াই বন্দীদেরকে গ্রহণ করে নিল। কিন্তু সেই সেপাইটির ছোট্ট কথাটা–সব সময় আমার মাথায়

ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমি ভাবছি, এ লোকটা কিভাবে মানুষের ঘাটতি (যারা নির্যাতন সহ্য না করে মারা গেছে, তাদের ঘাটতি) পূরণ করবে?

বস্তুতপক্ষে কারোরই হুঁশ নেই যে, অপরজনের ওপর কোন্ ধরনের মুসিবত পড়ছে। তাকে কি বৈধভাবে বন্দী করেছে, না অবৈধভাবে! এ জন্য হতে পারে, আমাদের কাফেলার ভিতর এমন লোকও পাওয়া যাবে যাদেরকে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য ধরে আনা হয়েছে।

আমি আগে বলেছিলাম, আমরা কয়েকজন বদর আল-কুসাইবীকে হাতে উঠিয়ে রেখেছিলাম। তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

জেলের দরজার সামনে আমরা মেজর ফাওজীকে দেখলাম। তিনি পরবর্তীকালে কিছু দিনের জন্য জেলকমাণ্ডার হয়েছিলেন। বদর আল-কুসাইবীর অবস্থা দেখে মেজর ফাওজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। বেচারা বদর আল-কুসাইবীকে কেল্লার হিংস্র পাষণ্ডরা মারতে মারতে আটার খামিরের মত করে ফেলেছিল।

মেজর ফাওজী আমাদেরকে বললেন ঃ

"একে কোন একটি সেলে শুইয়ে দাও।"

আমরা কারাগারের একটি সেলে তাকে শুইয়ে দিলাম। এরপর আমরা কখনো বদর আল-কুসাইবীকে দেখিনি। বদর ইতিহাসের পট থেকে সরে গেলেন। তিনি ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র রূহের ওপর অজস্র রহমত বর্ষন করুন।

কেউ জানে না বদরের কবর কোথায়। কোথায় তিনি চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন। এই মহান মর্দে মুজাহিদ, মহান বিপ্লবী, পাহাড়ের মত অবিচল ঈমানদীপ্ত ব্যক্তিত্বের কথা আমার যখন মনে পড়ে, আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, অন্তর ছটফট করে, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। তার কথা মনে হলে এ কবিতাটি সব সময় আওড়াতে থাকি ঃ

"ছা ইয়াযকুরুনী ক্বওমী ইযা জাদ্দাহুম
অফিল্লায়লাতিয যুলামাই ইয়াফতাক্বিদুল বাদ্‌রু।"

'আমার জাতির ওপর যখন বিপদ আসবে, তখন তারা আমায় স্মরণ করবে। আর অন্ধকার রজনীতে পূর্ণিমা হারানোর বেদনা বেড়ে যাবে।"

আবু যা'বাল বন্দীশালা তিন তালা একটি দালান। প্রতি তালায় বারটি রুম। প্রতি রুমকে ব্যারাক নাম দেয়া হয়েছে। দালানের সদর দরজা লোহার শক্ত রড দিয়ে তৈরী। চৌদেয়ালেও লোহার রড লাগানো রয়েছে। তার আঙ্গিনা খুবই মজবুত ও সুদৃঢ় খাঁচার মত। দালানটি আবু যা'বাল এলাকায় পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু পরে এটাকে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ দালানটি পূর্বের ভগ্ন দালানের ওপর দিয়েই বানানো হয়েছে। দুইশ মিটার দূরে রেডিও ষ্টেশন রয়েছে। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে গোলাবর্ষনের ফলে রেডিও ষ্টেশনের সাথে সাথে এ দালানেরও ভীষন ক্ষতি হয়। ইদানিং এটাকে সংস্কার করা হয়েছে। দালানটি কারাগার কর্তৃপক্ষকে ঠিকাদারের আরো কয়েকদিন পর সোপর্দ করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা যেমনটি শুনেছি, গোয়েন্দা বিভাগের চাপ ও দাবীর মুখে তাদেরকে সেই কাজটি তাড়াতাড়ি সারতে হয়েছে। আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এটাতে কমিউনিস্টদের অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ তাদেরকে এখানে বন্দী করা হবে। কিন্তু তকদীরের ফায়সালা ছিল অন্য রকম। আমরা আল্লাহর ভক্তদের নামই লটারীতে ওঠল। আমাদেরকেই সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হল নির্যাতনের জন্য।

জেলখানায় আমরা সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই ঢুকলাম। ভিতরে লেবাররা এখনো তড়িঘড়ি করে কাজ করছে। জেলখানায় ঢুকার সময় আমরা আযাবের ফেরেশতাদের কারোর চেহারা দেখতে পাইনি। যাদেরকে আমরা দেখলাম তাদেরকে প্রশস্ত মন, স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং কোমল হৃদয়ের বলে মনে হল। তারা আমাদের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করল। আমাদের সবাইকে তিনটি করে কম্বল দেয়া হল। একেবারে নতুন কম্বল। এর আগে এগুলো কেউ ব্যবহার করেনি। আরো দেয়া হল একটি করে বড় মগ, একটি চামচ ও একটি ঝকঝকে এলুমিনিয়ামের প্লেট।

পরিবেশ হাসিমুখর ও আনন্দদায়ক। আশা ও প্রাণ সঞ্জীবনীর অনুভূতি বেড়ে চলছে। আমাদের প্রত্যেকেই যার যার মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে, সে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও একেবারে নতুন বিল্ডিং-এ ভদ্রতার সাথে আরামদায়ক জীবন কাটাতে পারবে।

একটি ব্যারাকে সর্বোচ্চ ত্রিশজন লোক থাকতে পারে। এরচেয়ে বেশী থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু পরে তাতে একশ ত্রিশজন লোককে ঠেঁসে ভরা হয়। আমাকে ১নং ব্যারাকে অন্য কিছু লোকদের সাথে রাখা হয়। আমি খুবই

উৎফুল্ল ছিলাম। কারণ আমার সমস্ত বন্ধুদেরকে এই ১নং ব্যারাকেই রাখা হয়েছে। প্রত্যেকে যার যার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিয়েছে।

আমরা খুবই প্রশান্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বেশ খানিক বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হল। এরপর খানা এল। খানা আর কি! লোহার একটি নোংরা প্লেটে ডাল ভর্তি, সালাদ দিয়ে পাক করা হয়েছে। ডালে অসংখ্য পাথর-কণা। ডালও ছিল খুবই নিম্নমানের। ভান্ডও ছিল নেহায়েত নোংরা। স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো খাওয়া তো দূরের কথা কাছে রাখাও সহ্যের বাইরে। কিন্তু আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন সেই নোংরা খানাগুলোই খুবই তৃপ্তির সাথে খেলাম। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যারা কেল্লার জেলখানায় মোটেও কিছু খায়নি।

এরপর আমাদেরকে খুব কমদামী ও নিম্নমানের সাবান দেয়া হল। এ সব সাবান জেলখানার কয়েদীরা বানিয়েছে। ইতোপূর্বে কয়েকদিন তো আমরা সাবানের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। সাবান পেয়েই আমরা কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলি। কাপড়গুলো বিভিন্নভাবে ময়লা হয়ে বিশ্রী হয়ে গেছে। জামা-কাপড়ে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রক্তের লাল ও কালচে দাগ। কেল্লার ক্যাম্পের নিদর্শন। গোসলখানায় প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য দুটি পাদানী আছে। একটি হাউজ আছে, তাতে তিনটি কল লাগানো রয়েছে।

পেশাব-পায়খানার পাদানীর সাথে স্নাভও আছে, আমরা গোসল করতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সবাই ঠাণ্ডা পানি দিয়ে প্রাণ ভরে গোসল করলাম। শরীরে নির্যাতনের যে ছাপ ছিল তা ধুয়ে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করলাম।

তবে কয়েকজন হতভাগ্য এমন ছিল, যারা যখম বেশী মারাত্মক থাকার কারণে কাপড়ও কাঁচতে পারল না এবং গোসল করাও সম্ভব হল না। কিন্তু, তারা তবুও সুখ ও আনন্দ বোধ করছিলেন। কারণ, তারা এখন কেল্লার সেই ভয়ানক জগত থেকে দূরে সরে এসেছেন। ব্যারাকের যে অংশে আমরা ঘুমাতাম তার দরজাটি হচ্ছে রডের। এ রডের মধ্যখান দিয়ে শুধু খানা দেয়া যায়। আমি পুরো ব্যারাকটির ওপর দৃষ্টি বুলালাম। দেখলাম অধিকাংশই বয়োবৃদ্ধ। যুবক মাত্র কয়েকজন যারা ইয়াহইয়া হুসাইনের বন্ধু। যুবকদের মধ্যে আমিও একজন।

আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপারে জানতে পারলাম। সেটা হল, এ ব্যারাকে মিশরের প্রায় সমস্ত ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত লোকেরা বন্দী হয়ে আছে।

যেমন জমিয়াতুছ ছিরাত্বিল মুছতাক্বীম, আঞ্জুমানে খুদ্দামুন্নাছ, জমিয়াতুশ শারইয়্যাহ, তাবলীগি জামাত এবং হিজবুত তাহরীর আল ইসলামী সহ আরো অনেক সংগঠনের বন্দী। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এর সদস্যই বেশী। কারণ এ সংঘটনকে ঘিরে এ সব অভিযান।

এখানে এমনও অনেক বন্দী রয়েছে যারা কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নয়,–ধর্মীয় সংগঠনও না, রাজনৈতিকও সংগঠন না। তবে এদের এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে যারা কোন ধরনের সংগঠনের সাথে জড়িত আছে। এ সব বন্দী ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের বন্ধন তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্দীদের ভিতর এ সব লোককে দেখে প্রথম প্রথম খুব বিস্ময় বোধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের এ বিস্ময় বেশীক্ষণ থাকেনি।

প্রথম রাতটি আমরা পরস্পরে পরিচিতি, মতবিনিময় ও খোশগল্প করে কাটালাম। কেল্লার জেলখানায় নির্যাতনের যে ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে সে বিষয়েও আলোচনা হল। আমার তো ধারণা ছিল, কেল্লার ব্যথাভরা ঘটনার কথার ভিতর আমরা ডুবে থাকব। কারণ, সেই লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা মনে পড়লে আমাদের মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে পড়ে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের শরীর ও ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে জুলুমের নিশানগুলো এখনও লেগে আছে। সেই চুয়ে পরা গভীর ঘা, রক্তের লাল ছিটা, কেটে যাওয়া যখম থেকে লাল রক্তের প্রবাহ! কত তীব্রভাবে কেল্লার সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে। সে সব দৃশ্য প্রতিটি মুহূর্তে চোখে ভাসছে। যদিও কেল্লার নির্যাতন শিবিরে মাত্র কয়েক দিন আমরা ছিলাম। কিন্তু আমাদের আহত হৃদয়ের কাছে মনে হয়েছে যেন সেটা কয়েক শতাব্দী। তবুও এখানে এসে আমরা আনন্দ বোধ করছি, মনে স্বস্তি পাচ্ছি এবং দুঃখ ভরা অতীতকে ভুলে যাওয়ার জন্য খোশগল্পে মত্ত হয়েছি।

যে দালানটিতে আমরা আজ ওঠেছি, সেটা একেবারে নতুন, মনোরম এবং আলোকোজ্জ্বল।

রাত খুব দ্রুত শেষ হল। সুবহে সাদিকের সময় আমরা ফুর্তি মনে ঘুম থেকে ওঠলাম। অযু করে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে গেলাম। তার মহান সত্তার মধ্যে আমরা একাকার হয়ে গেলাম। তার অসীম শক্তির অনুভূতি আমাদেরকে আবিষ্ট করে ফেলল।

নামায শেষ করলাম। আমাদের এ নামায অন্য নামায থেকে ব্যতিক্রম মনে হল যেগুলো আমরা বন্দীশালার চৌদেয়ালের বাইরে আদায় করেছি। আমি এটাও বলা দরকার মনে করি, কেল্লার জেলে আমরা এমন মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলাম যে, সেখানে এক ওয়াক্ত নামাযও আমরা আদায় করতে পারিনি। কারণ আমাদের ওপর বিরামহীন গতিতে চলত বেত্রাঘাত ও বিভিন্ন বর্বর নির্যাতন। হয় নির্যাতন, না হয় অজ্ঞান অবস্থা–এ দুয়ের মাঝামাঝি আমরা সীমাবদ্ধ। উপরন্তু আমরা সবাই ছিলাম সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। একেবারে কেয়ামতের দৃশ্য!

এদিকে চড়ুই পাখিদের কিচির-মিচির শব্দ, অন্যদিকে আমাদের সুমিষ্ট ও সুললিত কণ্ঠে কুরআনের তেলাওয়াত। এ দুয়ের মাঝে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

আবু যা'বাল জেলখানায় এটাই আমাদের প্রথম সকাল। কিন্তু সকালেই আমরা আঁচ করতে পারলাম, আবু যা'বালের আসন্ন দিনগুলো আমাদের কেল্লার দিনগুলোর চেয়েও বেশী ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক হবে। আমরা এটাও জানতে পেলাম, অচিরেই আমরা কেল্লার জেলখানার জন্য আফসুস করে বলতে থাকব, হায়! দ্বিতীয় মুনিবের চেয়ে প্রথম মুনিবই ভাল ছিল।

রোদ ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের জন্য খানা আনা হল। কালো মধু দিয়ে আমরা যার যার ছোট প্লেট ভরে নিলাম। খাওয়ার অযোগ্য এক টুকরো পনির এবং ঠাণ্ডা, শক্ত রুটি। রুটি দেখে মনে হল, তার আটার সাথে অন্য কোন বাজে জিনিস মিলানো হয়েছে। আমি রুটির মধ্যে বেশ কিছু পোকামাকড় আবিষ্কার করলাম।

যাহোক, খানা খেলাম। এরপর গল্পগুজবে মন দিলাম। ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এখন থেকে আমাদের শান্তিই নসীব হবে। আর কষ্ট পোহাতে হবে না। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। হঠাৎ একজন সেনা অফিসার আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আচানক দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

এ অফিসারটি খুবই জ্ঞানী, অমায়িক, মিষ্টভাষী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কারোর প্রতি অবিচার করেন না। তিনি কাউকে শাস্তি দিয়েছেন এ ধরনের রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। এ ধরনের অফিসারদের জন্য আমাদের অন্তরে ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

কেল্লার জেলে তিনিও তদন্তকারীদের অন্যতম ছিলেন। আমারও তিনি তদন্ত করেছেন। কোন ধরনের শাস্তি দেয়া ছাড়াই তিনি তার তদন্ত শেষ করতেন। তার তদন্ত পর্বটি চোখের পলকের মত খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত।

তিনি আমার সাথে বিতর্ক জুড়ে দিতেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। খুব সক্ষ্ম ও কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতেন। সব সময় মগজ খাটিয়ে হাকিকত জানার চেষ্টা করতেন। হাত এবং লাঠি মোটেও ব্যবহার করতেন না। সেই অফিসারটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কিছু এদিক সেদিক বিষয় নিয়ে কথা বললেন। তার কথাবার্তা থেকে আমাদের মধ্যে এ ধারণা হল যে, আমাদের পরীক্ষার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। কেল্লায় যে নির্যাতন সয়েছি ততটুকুই আমাদের সাজা। এখন সামনে আমাদেরকে কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটাতে হবে, যা দীর্ঘ হবে না। ব্যস এইটুকু। কিছু সঙ্গী তো আনন্দে লাফিয়ে ওঠল। আমরা সবাই এ আশায় ছটফট করতে লাগলাম, কখন মুক্তির বার্তা এসে যায়!

ঈমানে উদ্ভাসিত চেহারা

এ সব ব্যারাকে এ ধরনের কিছু বন্দী ছিলেন যারা তাদের মুক্তি কিংবা বন্দীদশা কোনটার ব্যাপারে কিছুই ভাবতেন না। তাদের ঈমানে উদ্ভাসিত চেহারায় আল্লাহর উপর গভীর বিশ্বাসের চিহ্ন পরিস্ফুটিত। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাদেরকে স্থায়ী শান্তি দিয়েছে। আক্ষেপ, অস্থিরতা তাদের ধারে কাছে ভিরতে পারে না। এরা হচ্ছেন সে সব লোকের গ্রুপ, যাদেরকে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন আন্দোলন শহীদ হাসানুল বান্নার যুগে তৈরী করেছে। তাদের তিনজন বন্দীর নাম আমার ভালমত মনে আছে। তারা এখন কোথায় আছেন জানি না। একজন হচ্ছেন শেখ হামেদ তাহ্হান। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন প্রফেসর মাহমুদ আব্দুহু যিনি ১৯৪৮ সনে ফিলিস্তীন জেহাদে ইখ্ওয়ান বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। আর তৃতীয়জনের নাম হচ্ছে আলহাজ আব্দুর রহমান হাছবুল্লাহ, যিনি ঐ ছয়জনের একজন, যারা ১৯২৮ সনে ইসমাঈলিয়া শহরে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর ভিত্তি গড়েন। তাদেরকে এক নজর দেখলেই মানুষের অন্তরে ঈমান, য়াকীন ও বিশ্বাস তাজা হয়ে যায়। শাস্তি, নির্যাতন ও বর্বরতা সহ্য করার সাহস সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে আবু যা'বালের প্রথম দিনেই এমন লোকও দেখতে পেলাম,

যাদের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস ও হিম্মত বলতে কোন কিছু ছিল না। ভয়, আতংক ও অস্থিরতা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আমাদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি খুবই কাপুরুষ, ভীতু এবং কৃপণ ছিলেন। তিনি জেলের দারোগার কাছে ৫০০ পাউণ্ড জমা রেখেছিলেন। তিনি বার বার বলতেন, যদি গোয়েন্দা বিভাগ তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তিনি তাদেরকে ৫০০ পাউণ্ড দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তিনি জানতেন না তিনি যে মুসিবতের সম্মুখীন, ৫০০ পাউণ্ড দিয়ে সেটা মোকাবেলা করা তারপক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের মন ভেঙ্গে পড়ল

আমরা আনন্দচিত্তে বসে সেই পাইলটের দাস্তান শুনছি, যে জীবনে কখনো ভাবেওনি, তাকে এমন নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সে পাইলট আসল বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানত না, যার ফলে সে হাস্যকর আচরণ করত। তার কাহিনী শুনে শুনে আমরা হেসে ফেটে পড়ছিলাম। আমি বলব, আমরা সবাই এ ধ্যানে ডুবে ছিলাম, এ ক্যাম্পে আমরা এমনভাবে থাকব যেন অবকাশকালীন আনন্দময় সময় কাটাচ্ছি। কিন্তু কয়েকটা ঘন্টা যেতে না যেতেই আমাদের মন ভেঙ্গে পড়ল। বিষন্নতা ছেয়ে গেল। আকস্মিকভাবে জেলের ভিতর অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল। সব জায়গায় শোরগোলের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। কারাগারের লোকজন আসছে যাচ্ছে। একজন হাবিলদার আমাদের কাছে এল। সে খুবই রুক্ষ স্বভাব ও পাষাণ স্বভাবের। তাকে 'মাল্উন' বলা হত। সে কয়েদীদের নাম জিজ্ঞেস করতে লাগল এবং তার শ্বেতহাত দিয়ে সেই নামগুলো লিখতে লাগল। সমস্ত ব্যারাকে গেল এবং সবার নাম নোট করল।

জেল কর্মচারীরা কয়েদীদের বিশেষ পোশাক নিয়ে এল। যদিও লেবাসগুলো অব্যবহৃত। কিন্তু সেগুলো ছাড়পোকা দিয়ে ভরা। লেবাস দেখে মনে হচ্ছে, এগুলো কাপড় না, প্লাষ্টিকের চট, খুবই বেমানান ও অনুপযোগী। আমরা যে কাপড় পরেছিলাম, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল সেগুলো খুলে তাদের হাতে তুলে দিতে। আমাদেরকে যে পায়জামা ও কুর্তা দেয়া হল তা শরীরের সাথে খাপ খাচ্ছে না। কাপড় খুব ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত। দেখে মনে হচ্ছে, এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত মলমূত্রের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। টুপিরও কোন শ্রী ছিল না।

এখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। একদিকে যেমন ভীষন গরমে প্রাণ অতীষ্ঠ হয়ে ওঠছে, অন্যদিকে এ সব দূর্গন্ধযুক্ত কাপড় জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে। আমাদের পাইলট সঙ্গী যে আমাদেরকে তার আকর্ষনীয় কাহিনী শুনাত, 'নতুন পোশাক' পরার হুকুম শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠল। জেল কর্মচারীদের কাছে হাত জোড় করে খোদার দোহাই'দিয়ে তার নিজের কাপড়ই পরে থাকার জন্য অনুরোধ করল। সে লণ্ডন থেকে এ পোশাক নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাবিলদার মালউ'ন তাকে বলল ঃ

"খোদার শোকরিয়া আদায় কর যে, তোকে মেরে ফেলা হয়নি, এখনো বেঁচে আছিস।"

রডের দরজার ফাঁকা দিয়ে আমরা উকি মারলাম। দেখলাম, সেপাইরা লাঠি, বেত এবং চামড়ার চাবুক বোঝা ভরে ভরে জেলের ভিতর নিয়ে আসছে। এত বিপুল পরিমাণ হবে যে, পুরো মহাদেশের মানুষের চামড়া খসিয়ে ফেলা যাবে। এ সব আতংক সৃষ্টিকারী লাঠি এনে এনে জেলের ফরশে ঠাস ঠাস করে ফেলা হচ্ছে যার শব্দ শুনলে অতি বড় বীরপুরুষের আত্মা শুকিয়ে যাবে।

এই অবস্থা দেখে আমাদের এক সঙ্গীর মুখ থেকে আপনা আপনি আল্লাহ পাকের কালামের এ আয়াতটি বেরিয়ে পড়ল ঃ

"ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানূ ইযা-লাকীতুম ফিআতান ফাছবুতূ ওয়ায্‌কুরুল্লাহা কাছীরাল্লাআ'ল্লাকুম তুফ্‌লিহূন।"

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা শত্রুদলের মুখোমুখী হবে, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহ পাককে বেশী বেশী স্মরণ করবে। তাহলে তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে।'

এ আয়াত উপস্থিত বন্দীদের উপর যাদুর মত আছর করল। পুরো ব্যারাক আল্লাহর যিকর এবং কুরআনের তেলাওয়াত দিয়ে গমগম করে ওঠল এবং মন প্রশান্তিতে ভরে গেল।

যখন বিকট শব্দ ভেসে এলো

ইতোমধ্যে একটা গুরুগর্জন শুনা গেল। মনে হল সে শব্দে জেলখানার দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়বে। আমি দেখলাম, ব্যারাকের সমস্ত লোক আমার দিকে তাকাচ্ছে। আসলে কি, বাইরে থেকে আমাকেই আওয়াজ দেয়া হচ্ছে।

আকস্মিকভাবে আমার ভিতর আতংক ছড়িয়ে পড়ল। কারণ এ আওয়াজের একটি বিশেষ অর্থ আছে যা সেই বুঝতে পারবে, যে এখানে এসেছে। আমার কাছে মনে হল, এতক্ষণ যতটুকু আমরা আরাম করেছি তা স্বপ্ন ছিল, ধোঁকা ছিল।

"লাক্বাদ জা-আতিছ ছোয়াখ্‌খাহ্‌, ওয়ামা–আদরাকামাছ ছোয়াখ্‌খাহ্‌, (বিকট শব্দ এলো। তুমি কি জানো, এ বিকট শব্দ কি?")

আমরা আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলাম। আল্লাহই জানেন, কখন এ পরীক্ষার মুহূর্ত শেষ হবে। কবে আসবে শান্তি! হে মহাপরাক্রমশালী প্রভু! তুমি আমাদেরকে শান্তি দাও। ব্যারাকের জনৈক বৃদ্ধবন্দী আমার কাছে এলেন এবং আমার কানে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আমি দরজার দিকে অগ্রসর হলাম, যেন দূর থেকে বিকট শব্দ করে যে লোকটা আমাকে তলব করেছে তার চোখে পড়ি। আমাকে দেখে সে তখনি আমার কাছে এল। তার হাতে চাবি। সে ব্যারাকের দরজা খুলল এবং আমাকে ওখান থেকে বাইরে নিয়ে এল। আমার চোখ দু'টো বেঁধে ফেলল। সে আমাকে অন্ধের মত খালি পায়ে নিয়ে চলল। চোখের বাঁধনটি সে খুব কষে বেঁধেছে। এজন্য আমি কোন কিছুই দেখছি না। আমাকে কখনো ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কখনো নীচে নামাচ্ছে। এরপর এমন একটি জায়গায় নিয়ে এল যেখানে শুকনো ঘাস এবং কাঁটায় ভরা। আমার মনে হল, সে আমাকে জেলখানার বাইরে অন্য কোন স্থানে নিয়ে এসেছে। একটা ভীতিকর শব্দে আমি চমকে ওঠলাম। এ আওয়াজ আমি ভাল করে চিনি। এ হচ্ছে মেজর ফ. আ.-এর আওয়াজ। এ লোকটা কেল্লার কারাগারেও তদন্ত করার সময় আমার ওপর ভীষন হিংস্রতা চালিয়েছিল।

মেজর ফ. আ. অত্যন্ত দম্ভ ভরে এবং ভয়ঙ্কর কণ্ঠে আমাকে বলল ঃ

"এসে গেছ?"

আমি উত্তর দিলাম না।

"তোমার ভাগ্য খুবই খারাপ।"

আমি চাপা কণ্ঠে বললাম ঃ "কেন?"

তুমি কি বাস্তবেই জানো না, তোমার কিসমত কেন খারাপ?"

এরপর সে একের পর এক খুবই অশ্লীল ও খারাপ ধরনের গালি দিতে লাগল। আমি কিছু উত্তর দেয়ার আগে আমার ওপর লাথি বর্ষন শুরু করে

দিল। কিছুক্ষণ পর আমাকে কোন একটা জায়গায় ওল্টো করে লটকিয়ে দিল। আমার চারপাশে কেবল অন্ধকার। এটা হয়েছে চোখ বাঁধার কারণে। এখন মোটা শক্ত বেতের লাঠি দিয়ে সেই জালেম আমার সমস্ত শরীরে বেধড়ক পিটাতে লাগল। পায়ের অংশেই বেশী মারা হচ্ছে। আমি এমন তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম যার তুলনায় মরণই বেশী সহজ মনে হল। আমি ভীষনভাবে ঘাবড়ে গেলাম। আমি দানবটার সামনে বার বার কাকুতি মিনতি করলাম, "আমি তো একজন মুসলমান, আপনাদের মতই মিশরের নাগরিক, আমাকে কেন মারছেন?"

কিন্তু সে বার বার বলছিল ঃ

"তুমি কিছু বল!"

কিন্তু মুসিবত হচ্ছে, সেও জানে না, আমিও জানি না, আমাকে কি বলতে হবে এবং কোন্ গোপন রহস্য ফাঁস করতে হবে।

এটা ছিল নির্যাতনের একটা পর্ব। এ ধরনের আরো পর্ব আমার ভাগ্যে অনেকবার জুটেছে। যখন আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আনা হত, তখন আমি অন্তরে অন্তরে শপথ নিতাম, আমি চিৎকার করব না, হায় হুতাশ করব না এবং কোন ধরনের কাকুতি-মিনতি, অনুযোগ অভিযোগ মুখ দিয়ে বের করব না। কিন্তু আমি বার বার এ শপথ রক্ষায় মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছি। হ্যাঁ, প্রতিবারই ব্যর্থ হতাম। এ শাস্তি, যা মিশরের জালেমরা দিচ্ছে, সেটা যে কোন মানুষের সহ্যের বাইরে। অন্ততপক্ষে আমার সহ্যের বাইরে।

মারপিটের প্রথম "গরমগরম খোরাক" নেয়ার পর আমার শরীরের প্রতিটি জোড়া ফুলে গেল। আমি অর্ধ চেতন হয়ে গেলাম। আমার রশি খুলে দেয়া হল এবং আমি টিকটিকির মত নীচে পড়ে গেলাম। এরপর মেজর আমাকে ডাণ্ডা মেরে হুকুম করল আমি যেন পায়ের ওপর ভর করে লাফ দিতে থাকি, যাতে পা ফুলে সেখানে পুঁজ হতে না পারে। তার এ পরামর্শ কোন করুনা ছিল না; বরং পরবর্তী পর্বে যখন আমাকে শাস্তির জন্য তলব করা হবে, তখন যেন আমার মধ্যে সেই নির্যাতন সহ্য করার কিছু হিম্মত থাকে।

আমি দাঁড়াতে পারলাম না। আমার গোড়ালী অবশ হয়ে পড়েছে। পা জমিনের ওপর স্থির থাকছে না। প্রহার আরো ভীষন আকার ধারন করল। লাথি ও ঘুষির বৃষ্টি বর্ষন হতে লাগল-যেন তার নির্দেশ পালন করি এবং নিজের অবস্থা ভাল করার চেষ্টা করি।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর পায়ের ওপর ভর করে কোন মতে দাঁড়ালাম।

মেজর গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল আমাকে দ্রুত চলার জন্য। যখন আমি চলতে শুরু করলাম তখন আমার পা দুটিতে অনুভূতি হল যেন সেগুলোর নীচ দিয়ে এমন কতগুলো তক্তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে অনেকগুলো চোখা প্যারেক লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমি পা দেয়ার সাথে সাথে চোখা প্যারেক আমার পায়ের নিচ দিয়ে ভেদ করে গেথে গেল। আমি ব্যথায় চিৎকার করে ওঠলাম। আমার চোখ দুটো বাঁধা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অবশেষে সহ্য করতে না পেরে আমি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি হুঁশ হারিয়ে ফেললাম। প্রথম দিন আমাকে যে মর্মান্তিক শাস্তি দেয়া হয়, পেরেকের ঘটনা ছিল তার শেষ অধ্যায়।

আবু যা'বাল জেলখানায় নির্যাতন ও তদন্ত, কিংবা দুটোই খুব ব্যাপক আকারে শুরু হয়ে গেল। দুটোই আসলে একই বিষয়ের দুই নাম। তদন্ত মানেই নির্যাতন বা নির্যাতন মানেই তদন্ত। এ নির্যাতন প্রতিদিন সকল ১১টায় শুরু হত এবং মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকত। এরপর অফিসাররা নিজ নিজ ঠিকানায় পা বাড়াত। তারা যাওয়ার মুহূর্তে বন্দীদেরকে এমন কতগুলো লোকের হাতে সোপর্দ করে যেত, যাদের কাজ ছিল বন্দীদেরকে পরবর্তী দিনের তদন্তের জন্য প্রস্তুত করা। পরের দিন সকাল ১০টায় এরা সবাই আবার ডিউটিতে চলে আসত।

এখানে আসার দুদিন পর থেকে এ নিয়মটিই স্থায়ী হল। আমি যখন শাস্তি ভোগ করে ব্যারাকে ফিরলাম, তখন দেখলাম আরো অনেক লোক দিয়ে ব্যারাক ভরা হচ্ছে। অনেক নতুন বন্দী আনা হয়েছে। যে ব্যারাকে ত্রিশজন লোকের বেশি ধরে না, সেখানে কয়েকগুন লোক দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে। আমি নিজের বিছানায় এসে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তদন্তে যাওয়ার পূর্বে যতটুকু জায়গা নিয়ে আমার বিছানা বিছানো ছিল সেখানে এখন অনেক ছোট করে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন শহর থেকে লোকদের ধরে আনা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ওপর পূর্বে যা নির্যাতন হয়েছে এবং এখন হচ্ছে তাতে আমরা সবাই ভীষন আতংকিত, হতবাক ও হতাশাগ্রস্ত ছিলাম।

পরদিন আমাকে ঠিক ঐ ভাবে সেই অপরিচিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। এবার তারা নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী লাথি, ঘুষি এবং বেত্রাঘাত করে

তদন্ত শুরু করল না।

আমার দু' চোখ শক্ত করে বাঁধা। কান দুটো আশ্চর্য ধরনের অনেক শব্দ ও গতিবিধি আবিষ্কার করল। পরিষ্কার বুঝে আসছে, জেলের বাইরে এ জায়গাটিতে কোন অসাধারণ কিছু রয়েছে। ইতোমধ্যে আমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জনৈক পাষণ্ড আমার ঘাড়ে একটি শক্তিশালী ঘুষি বসিয়ে দিল। আমি ভীষন ভয় পেয়ে গেলাম। ঘুষির কারণে নয়। আমি শুনলাম একজন অফিসার লোকটিকে আরো ঘুষি মারতে বারণ করছে। এতে আমি অবাক হলাম। সে সময় আমি আন্দাজ করতে পারিনি, অফিসার কেন সেই ব্যক্তিকে ঘুষি মারতে বারণ করছে। বন্দী জীবনে এ প্রথমবার আমি মারপিট করতে বারণ করতে শুনলাম।

মেরে ফেলার নির্দেশ

মেজর ফ. আ. এলো। আমি তার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারলাম। সে আমাকে বলল ঃ

"মিস্টার রায়েফ! আমি দুঃখিত। আমি চাইনি তোমার ওপর এ বিপদ আসুক। কিন্তু কি করব, সেনাসদর দফতর থেকে এ নির্দেশই এসেছে।"

আমি বললাম ঃ

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

সে ধমকের সুরে বলল ঃ

"আমাদের কাছে একটা তালিকা এসেছে, তাতে কিছু এমন নামও রয়েছে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। এরপর বললাম ঃ

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।"

সে বলল ঃ

"কিছু নাম (তালিকায়) এমন রয়েছে, যাদেরকে মেরে ফেলার হুকুম এসেছে। এ তালিকার ওপর ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমেরের স্বাক্ষর আছে।"

"আপনার মতলব কি?"

"যাদেরকে মেরে ফেলা হবে, তাদের মধ্যে তোমার নাম সবার আগে।"

"মামলা-মোকাদ্দমা ছাড়াই কি এভাবে ...?"

"মোকাদ্দমা বলতে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো? এগুলো হচ্ছে একেবারেই অর্থহীন কাজ।"

আমি আরজ করলাম ঃ

"ফাঁসির কাষ্ঠে কবে ঝুলতে হবে?"

উত্তর পেলাম ঃ

"এখনই ...।"

আমি দূর থেকে দৌড়ে আসার অনেকগুলো পদধ্বনি শুনতে পেলাম। কেউ একজন কাছে এলো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ঃ

"যাদের ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের ফায়সালা হয়েছে, তারা কোথায়?"

মেজর ফ. আ. আমার বাহু জোরে ধরে বলল ঃ

"এ ভদ্রলোক হচ্ছে সেই পঞ্চাশজনের তালিকার সবার আগে, যাদেরকে আজ ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করা হবে।"

মেজর আমাকে সেই অপরিচিত লোকটির কাছে সোপর্দ করল। সে আমাকে কয়েক গজ দূরে নিয়ে এল। আমি নানান ভাবনায় বিভোর।

"আমার জীবন কি আজ শেষ হয়ে যাবে? এভাবে এত সহজে? আমার বিশ্বাস হয় না; কিন্তু মার্শাল আব্দুল হাকীম আমের তো আমাকে চেনে। এ সব লোক আমাকে কেন এত ঘৃণা করে–আমি তাদের কি ক্ষতি করেছি?"

অতীতের স্মৃতির মাঝে আমি ডুবে গেলাম। আমার আশা, আকাংখা, আমার সোনালী স্বপ্ন, সুন্দর ভাবনা, আমার বই পড়ার স্পৃহা এবং সে অফুরন্ত মজা যা কোন নতুন বই এবং কিতাব পড়ে পেতাম–এ সব কিছু ধারাবাহিকভাবে আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। ভাবলাম, তাহলে কি খানিক পর এ সব কিছু সঙ্গে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারব?

কোথায় আইন? কোথায় সভ্য হওয়ার দাবীদাররা? কোথায় গেছে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের শ্লোগান? ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার পাওয়ার শেষ আশাটুকু মগজ থেকে উধাও হয়ে গেছে। এক ধরনের অচেতন ভাব আমাকে জেকে ধরল। ভীষনভাবে বমির ভাব হল। আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলাম। কিন্তু তবুও সেই লোকটির অনুসরণ করলাম, যে আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে সেই লোকটি একদম থেমে গেল। আমার অনুভূতি লোপ পাচ্ছিল। আরো কিছু পদধ্বনি শোনা গেল। মেজর ফ. আ.-এর আওয়াজ এল ঃ

"মরার আগে তোমার মনে কোন বিশেষ ইচ্ছা আছে?"

আমি বললাম ঃ

"দুই রাক্আত নামায পড়তে চাই; আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য। জীবন শেষ হতে চলেছে, আমি সেই মহান সত্তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি ছাড়া যেতে চাই না।"

"নামায? নামায কি?" মেজর বলল।

"আল্লাহ পাকের সত্তার স্মরণে নিজেকে কিছু সময় বিলীন করে দিতে চাই।"

"না, না..., আমরা নামাযের অনুমতি দিতে পারি না। এটা আমাদের ক্ষমতার আওতার বাইরে।"

এরপর ফাঁসি যাকে দেয়া হবে আর যারা দেবে দুজনেই সামনে অগ্রসর হলাম। আরো কিছু হাঁটলে এক লোক হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটিকে আমি চিনি না। দেখতেও পেলাম না। কারণ আমার চোখ দুটো বাঁধা।

সে আমাকে আছাড় দিয়ে ধরাম করে মাটিতে ফেলে দিল। এরপর তড়িৎ আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে লোহার শিকলের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হল। ব্যতিক্রমী ব্যাপার হচ্ছে, এখন আমার মন থেকে ভয়, আতংক এবং দুঃখ ও ব্যথার অনুভূতি একেবারে চলে গেছে। মনে হল, এখন অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে জবাই করা হবে। এখানে বন্দীদেরকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে জবাইও করা হত।

আমার হত্যাকাণ্ডও ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এখনই আমাকে মেরে ফেলা হবে। আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির কোলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। তার দরবারে পৌঁছুনের সময় এসে গেছে। "ইলার রফিকিল আ'লা।" (মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে যাচ্ছি।)

কিন্তু লোকটা আমাকে উঠিয়ে দাঁড় করালো। এরপর এরা আমাকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে কোথাও নিয়ে গেল। চোখের বাঁধনের নীচ দিয়ে আবছা আবছা আলোর ঝলক দেখা যায়। আমি ওর সাহায্যে জায়গাটা বুঝার চেষ্টা করলাম। তারা আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। এটা একটা পাথরের তৈরী গলি—যেটা সিঁড়ি শেষ হওয়ার পর শুরু হয়েছে।

এরপর আমাকে সামনে চলতে বলল। তাদের কৌশল মনের মধ্যে ভয় ও আতংক সৃষ্টি করার মত। সেই গলির ভিতর আমি অনেকক্ষণ চললাম। এরপর আমাকে থামতে বলা হল। বাঁধনের একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে আমার

নজর আমার পায়ের ওপর পড়ল। দেখলাম, একটি গভীর খাদ-এর একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন একটু সামান্য ধাক্কায় আমি অতল গহ্বরে গিয়ে পড়ব।

আমার গলায় ফাঁসির ফাঁদও পরিয়ে দেয়া হল। একজন সেনা অফিসার ইছাম আশশাওকী (তুর্রার জেলে বন্দী থাকার সময় আমাদের কাছে খবর এসেছে, আশশাওকী ১৯৬৮ সনে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন) আমার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন শেষ বারের মত দোয়া, দরূদ, প্রার্থনা করে নিই। কারণ দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্ত এসে গেছে। আমি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম ঃ

"হে আমার মাওলা! আমায় ক্ষমা করে দিন। নিঃসন্দেহে আপনার এ অধম বান্দা এখন আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। আপনি নিজ করুণা দ্বারা আমাকে মাফ করে দিন।"

জীবনে আমি যত গুনাহ করেছি, তার কথা মনে করে চোখের পানি ঝরাচ্ছি। সে সব গুনাহের কথা মনে করে আমি ভীষন চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আক্ষেপ করতে লাগলাম, হায়! যদি আরেকটু সুযোগ পেতাম, তাহলে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতাম এবং যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তা শুধরিয়ে নিতাম।"

"হে আমার প্রভু! হে আমার দয়ালু মেহেরবান মালিক! এখন আপনার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র প্রয়োজন।"

আমার গলায় যে ঢিলা-ঢালা ফাঁদ পরিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটা প্রচণ্ডভাবে ঝটকা দেয়া হল। আমার পায়ের নীচে গভীর ও অন্ধকার খাদ। দূর কোথাও বেত্রাঘাতের শব্দ কানে ভেসে আসছে–যার সঙ্গে হৃদয়বিদারক, বুক ফাটা চিৎকার শুনা যাচ্ছে। আমার আশেপাশের পরিবেশে আতংক ভাব; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমার মধ্যে নেই কোন শঙ্কা কিংবা ভয়-ভীতি। তবে আমার ভিতর একটা চিন্তাই কাজ করছে, আমি যখন আমার রবের দরবারে উপস্থিত হব, তিনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

আমার মা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মোটকথা যাদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে সবারই কথা মনে পড়ল। এরপর কি হল, হঠাৎ এক রহমতের হাওয়া আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিল। মনে হল আল্লাহ পাক আসমান থেকে সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল করেছেন। আমি তাঁর সত্তার স্মরণে মাতোয়ারা হয়ে গেলাম। আপনা আপনি আমার মুখ থেকে তাওবা, ইস্তেগ্ফার ও দোয়া জারি হয়ে গেল।

দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থাটা চলতে থাকল। আমি আমার নিজের জায়গায় মুর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি। আমার ভাবনা জগতে অনেক ধরনের নুরানী চেহারা দেখছি যারা বিভিন্ন রঙ-বেরঙের। আমার মনে হল, আমার পা দুটো এখন আমার ভর সামলানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। গর্দানের ফাঁস খুব শক্তভাবে টান টান হয়ে গেছে। তাতে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। ওদিকে রীতিমত মানুষের বুকফাটা চিৎকার, চাবুক মারার শব্দ শো শো করে আমার কানে ভেসে আসছে। পায়ের নীচে গভীর অন্ধকার গহ্বর হা করে মুখ ব্যদান আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ইতোমধ্যে একজন অফিসার আমার কাছে এল এবং শাঁশিয়ে নির্দেশ দিল ঃ

"এ খাদে তোমাকে এখনি লাফিয়ে পড়তে হবে।"

আমি বললাম ঃ

"আপনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে তাতে ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু আমি নিজে তাতে লাফ দেব না।"

সে চেঁচিয়ে ওঠল ঃ

"না, তোমাকেই লাফিয়ে পড়তে হবে, এটা মার্শালের নির্দেশ।"

আমার সংবিৎ হারানোর উপক্রম। সেই অবস্থায়ই আমি এগিয়ে সেই গভীর গহ্বরে গড়িয়ে পরলাম এবং হঠাৎ উঁচু থেকে নীচে গিয়ে পড়লাম। গর্তের গভীরতা মাত্র তিন গজ। কিন্তু যেহেতু আমার চোখ বাঁধা, সে জন্য আমার কল্পনা শক্তি এটাকে কোন মারাত্মক গভীর গহ্বর বলে ভেবেছিল, যেখানে পড়ে গেলে বাঁচার কোনই উপায় নেই। মূলতঃ জালেমরা আমাকে এ গহ্বরে ফেলে দিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এখানে আনেনি, বরং মানসিক কষ্ট দেয়ার জন্যই তারা এ কৌশল গ্রহণ করেছে।

করুণ অবস্থায় আমাকে গহ্বর থেকে বের করে একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে মজলুম মানুষের চিৎকারের আওয়াজ খুব কাছে থেকে শুনা যাচ্ছে। আমার চোখ থেকে বাঁধন সরিয়ে দেয়া হল। আমি দেখলাম, আমার সামনে মেজর ফ. আ. এবং লেফটেন্যান্ট ইছাম আশ্‌শাওকী বসে আছে।

মেজর ফ. আ. বলল ঃ

"তোমার কিসমত ভাল। ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এখন নির্দেশ এসেছে তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে দেয়ার জন্য। তবে তারা কেন আগের নির্দেশ বাতিল করেছেন তার বিশদ বিবরণ দ্রুত আমাদের কাছে

পৌঁছে যাবে।"

পরিবেশটির ওপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা ছেয়ে রইল। এরপর মেজর আমাকে বলল ঃ

"তোমার সম্পর্কে যে সব তথ্য রয়েছে সে সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে জানাবে?"

আমি মাথা দুলিয়ে "না" বললাম।

"তোমার কি কোন বিশেষ কিছুর প্রতি আগ্রহ রয়েছে?"

আমি আবার মাথা দুলিয়ে "না" বললাম।

সে আমাকে কাঠের একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাতে বসতে বলল। একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। সে নিজেই আমার জন্য সিগারেটটি ধরাল। আমি তার আচরণে বিস্মিত হলাম। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার বিস্ময় কেটে গেল। সে কাগজ আর কলম আমার দিকে বাড়িয়ে দিল এবং বলল ঃ

"এখন তুমি স্বীকারোক্তি লিখবে।"

আমি পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"কোন্ কথার স্বীকারোক্তি?"

সে বলল ঃ

"আমি যা লিখতে বলি, তুমি তা লিখবে–তোমার আগের বর্ণনার আলোকেই লিখাব।"

আমি মনে মনে তার এ প্রস্তাবের শুকরিয়া আদায় করলাম। এটাও কম কথা না যে, সে এখন আমার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে না, অপদস্ত করছে না।

আমার গ্রেপ্তারীর শুরু থেকেই আমার মনে এ আগ্রহটাই ছিল, যেন তারা এ ধরনের কোন পন্থা অবলম্বন করে।

মেজর আমার কথা কেটে বলল ঃ

"তুমি এ কথা ভেবো না, আমি তোমাকে দিয়ে এমন কথা লিখাব যা তুমি কর নাই।"

আমি তখনি বললাম ঃ

"মাফ করবেন, পাশা! মিথ্যা, ছলচাতুরী কি কোন যুক্তিসঙ্গত পন্থা?"

সে বলল ঃ

"এখানে কথা হচ্ছে এটুকুই, তুমি বিভিন্ন সময় যা বলেছ, সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা স্পষ্ট রিপোর্ট তৈরী করাই আমার উদ্দেশ্য।"

আমি বললাম ঃ

"পাশা! আপনার প্রস্তাব সম্পূর্ণ মেনে নিলাম।"

সে লিখাচ্ছে, আর আমি লিখছি। বড় সাইজের ৯পৃষ্ঠা আমি সম্পূর্ণ লিখে ভরে ফেললাম। এখানে যা লেখা হয়েছে তার সারমর্ম এই ঃ

"মিশরের সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্য আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু গোপন নীল নকশা বানিয়েছিলাম। গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের গোপন পরিকল্পনার কথা কোন উপায়ে জেনে ফেলে। তারা আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার কারণে আমরা আমাদের সেই গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারিনি।"

এ স্বীকারোক্তির পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরা আমাকে বিশ-পঁচিশ বছরের জেল দিবে।

রাত হয়ে গেছে। আমি সেপাইদের পাহারায় আনন্দচিত্তে জেলখানায় ফিরে এলাম। ভাবলাম, তদন্ত শেষ। এখন শুধু মামুলী ধরনের আদালতের নিয়ম মাফিক মোকদ্দমার কার্যক্রম অপেক্ষা করতে হবে, ব্যস্, এটুকুই। এরপর রাজবন্দীদের জেল তুররাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে পাথরভাঙ্গার কাজ করতে হবে, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাকের মর্জি হয়।

এ রকম চিন্তা করে আমি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম যে, তবুও ভাল। এ জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে, যেখানে বর্বরতার কোন শেষ নেই।

জেল কম্পাউণ্ডে হৃদয়বিদারক দৃশ্য

ব্যারাকে যখন পা রাখলাম, দেখলাম সকালে যতগুলো মানুষ ছিল এখন তার দ্বিগুন হয়েছে। খাঁচার মত জেলের সামনের জায়গাটা কয়েদী দিয়ে ভরে গেছে। তাদের শরীরে লজ্জাস্থান ঢাকার মত কাপড়ও নেই। শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে। অনেকের এমন দূর্গতি যে, তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে। লাঠিধারী জালেমরা তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং বেধরক পেটাচ্ছে। কিছু বন্দীকে দেখলাম যাদের চোখ দুটো বেঁধে

দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। লাঠি দিয়ে তাড়া করা হচ্ছে। তারা দৌড়াচ্ছে এবং সামনের দেয়ালের সাথে টক্কর খাচ্ছে। তাদের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। কেউ পড়ে গেলে সে উঠে আবার দৌড়াচ্ছে। কারণ, লাঠি ও চাবুকের আঘাতও কম না, তার থেকে বাঁচার জন্যই তারা দৌড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় যে দৃশ্যটি দেখলাম, তাতে কিছু লোককে দেখলাম তাদেরকে লোহার রডের দেয়ালের সাথে উল্টো করে লটকিয়ে রাখা হয়েছে। তাদেরও চোখ বাঁধা এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মনে হচ্ছে তাদেরকে শুলীতে চড়ানো হয়েছে। হায় আল্লাহ! এ জালেমরা কি মানুষ! কোথায় গেছে মানবতা?

আমি ব্যারাকের এক কোণে যেখানে সুযোগ পেলাম ধরাম করে পড়ে গেলাম এবং গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেলাম।

তদন্তের নামে নির্যাতনের কারণে আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। এ দুরবস্থার মধ্যেই সকালে চোখ খুলল। ব্যারাকের সঙ্গীরা আমাকে ঘিরে ধরল। তারা আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। ওখানে আমার ওপর কোন ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে। কি কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আমি তার কি উত্তর দিয়েছি ইত্যাদি। অনেক সরল প্রাণ বন্ধু জিজ্ঞেস করল, আমরা সবাই কবে নাগাদ ঘরে ফিরছি?

ব্যারাক নতুন নতুন বন্দীদের দিয়ে খুব গাদাগাদি করে ভরছে। লোক বেশী হওয়ায় এখানকার অবস্থা শোচনীয়। এখন জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের খাবারের দিকে তেমন দৃষ্টি দিচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর কিছু কিছু খাবার আসে। তার মধ্যে এমন দুর্গন্ধযুক্ত গোশ্‌ত থাকে যে, সহ্য করা যায় না। অনেক শক্ত কলিজার মানুষও তা চিবিয়ে খেতে পারে না। আমরা পানি দিয়ে গোশ্‌তটা ভালমত ধুয়ে নিতাম, যাতে দুর্গন্ধ কিছুটা কমে। এরপর সেটা মুখে দিতাম।

কালো দিবসের কাহিনী

সে সব কালো দিবসের কথা। সেপ্টেম্বর মাস। জেলখানায় অনেক নিষ্পাপ বালককেও নিয়ে আসা হল। ওদের সম্পর্ক ছিল তাবলীগ-জামাতের সাথে, যারা মূলত কোন রাজনীতি বা আন্দোলনের সাথে জড়িত না। এ সব বাচ্চা ছেলে জেলখানার ভয়াবহ নির্যাতন দেখে প্রতিটি মুহূর্তে ভয়ে থরথর করে কাঁপত। ওদের ওপরও চলত সব ধরনের বর্বরতা। ভেবে দেখুন, এসব

নিষ্পাপ ছেলের ওপর নির্যাতন কি কোন মানুষ করতে পারে? অথচ মুসলমান নামে কলংক এ সব বেদ্বীন নাস্তিক জেল কর্মকর্তা এ সব শিশুর ওপরও সব ধরনের হিংস্রতা চালায়। এদের একটাই দোষ, তা হল এরা কেন আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)কে মানে। এরা কেন ইসলামের বিধান মেনে চলে। এটাই এ সব বন্দীর অপরাধ, আর কিছু নয়।

বন্দীদের মধ্যে এমন বৃদ্ধও ছিলেন যারা নাড়া-চাড়া করতে পর্যন্ত অক্ষম। তারা সব সময় কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। তারাও কিন্তু জেলের বর্বরতা থেকে রেহাই পেতেন না।

যখন ব্যারাকের কোন হতভাগাকে তদন্তের জন্য তলব করা হত, তখন এ সব বুজুর্গ লোক সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য সূরায়ে ইখ্‌লাস তেলাওয়াত করতে থাকতেন। তাদের বিস্ফারিত চোখে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারায় দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং পেরেশানী ফুটে উঠত। তবে এদের অধিকাংশকেই তদন্তের জন্য একবারও ডাকা হয়নি। কোন সংগঠনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা রাজনীতি বলতে কিছুই বুঝেন না এবং এ ব্যাপারে নাক গলাতে পছন্দও করেন না। তারা সকলেই চরম বিস্মিত, কেন তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। চিন্তাধারা ও মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও আমাদের সবার মধ্যে বিরাজ করছে মহব্বত, ভালবাসা ও সহমর্মিতাবোধ। কারণ আমরা সবাই একই গাড়ীর মুসাফির। তাই কাউকে কষ্টে দেখলে তার প্রতি দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবার তদন্ত

আবু যা'বাল জেলখানার ব্যারাকে তিন দিন কাটল। আমি ভাবলাম আমার বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। এ সময় আমি ব্যারাকের দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখতাম। নির্যাতন দেখে নির্যাতিত লোকদের চেয়ে বেশী কষ্ট আমি আমার নিজের ভিতরই অনুভব করতাম। ব্যারাকের দরজা জেলকম্পাউণ্ডের দিকে ছিল। জেলের সামনে জায়গাটাকে এখানকার জেলখানার পরিভাষায় 'মাহমাছা' অর্থাৎ মাড়াইস্থান বলা হয়। যেমন ধান, গম এবং ডাল মাড়াই হয়। তেমনি এখানে সব লোককে দিয়ে ভরে দেয়া হয় যাদেরকে তদন্তের জন্য প্রস্তুত করা হয় কিংবা যারা নিজেদের সিরিয়ালের অপেক্ষায় থাকে। সব বন্দীই উলঙ্গ থাকে, যেন সদ্যোজাত শিশু। অফিসাররা সন্ধ্যায় যার যার ঘরে চলে যেত। বন্দীদেরকে ঘুম কিংবা বিশ্রামের অনুমতি না দিয়েই ছেড়ে দেয়া হত। সকালে অফিসাররা ফিরে এসে আবার তদন্তের কাজ শুরু করত এবং আগের দিন তদন্ত কাজে যতটুকু কমতি রয়ে গিয়েছিল, পরদিন সকালে এসে সেটা পূরণ করত। বরং নির্যাতনের যত ধরনের পদ্ধতি আছে সেগুলো তারা এসব নিরীহ তৌহিদী জনতার ওপর প্রয়োগ করত। তাদেরকে শারীরিক কষ্টের সাথে সাথে মানসিক কষ্টও দেয়া হত। খোদ রাত জাগাটা যে কত বড় শাস্তি, যারা এর ভুক্তভোগী তারাই তার তীব্রতা অনুভব করতে পারবে। এটা যে কত বড় শাস্তি, মানুষকে কয়েকদিন পর্যন্ত ঘুমুতেই দেয়া হয় না। আমারও দুর্ভাগ্য, কিছুদিন পর আমাকেও এসব লোকের মধ্যে শামিল করা হল, যাদেরকে জেল কম্পাউণ্ডে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

এ সব অসহায় মজলুমকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা হত। তাদের চোখও বাঁধা হত। এ ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যেত। কেউ জানত না রাত কখন শেষ হবে, কখন দিন আসবে! কেউ যদি চোখের বাঁধন খুলে ফেলত, যে তার মন ও মস্তিষ্ককে অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, তাহলে তার জন্য ধ্বংস ছিল অনিবার্য। প্রতিটি ব্যক্তি উচ্চস্বরে একটি বিশেষ বাক্য আওড়াত। যদি রাতের শুরুতে এ বাক্য জপতে শুরু করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত তাকে এভাবে জপতে হবে, যতক্ষণ না দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়া হয়। পাগলের মত সেই বাক্য আওড়াতে তাকে ক্লান্তিবোধ করলে চলবে না। তা না হলে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। বাক্যটি হচ্ছে ঃ

"সমুদ্রে শাক আছে, সমুদ্রে শাক আছে।"

এ বাক্য প্রত্যেক বন্দীকে জোরে জোরে জপতে হবে, সব সময়। আবার কারোর জপবার জন্য কোন সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যেমন কাউকে ৭, কাউকে ৮, কাউকে ৯ অথবা অন্য কোন সংখ্যা।

এ সব রাতভর তাদেরকে গলা ফাটিয়ে বার বার পড়তে হবে। এ দৃশ্য দেখে মনে হত, এটা জেলখানা নয়, পাগলাগারদ। কেউ যখন এখানে আসে, তখন তার জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত ঘুম বিশ্রাম এবং খাবার হারাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু একগ্লাস পানি দেয়া হয়। যখন কারোর পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন হয়, তাকে নিজের জায়গায়ই তা সারতে হয়।

আবার কোন বন্দীকে জেলকম্পাউণ্ডের ভিতর লোহার রডের যে উঁচু বেড়া আছে, তার ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকা মানুষটা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে দেয়ালের সেই উঁচুস্থান থেকে পড়ে যেত। তার মাথা ফেটে যেত কিংবা হাটু ভেঙ্গে যেত অথবা অন্যকোন যখম হত। যত কিছুই হয়ে যাক, তাতে কারোর কিছু আসে যায় না। সবাই নির্বিকার।

নির্যাতিত লোকদের সাথে 'বিনোদন' করার হৃদয়বিদারক দৃশ্য

কখনো কখনো কোন অফিসারের ইচ্ছা হত জেল কম্পাউণ্ডে নির্যাতন শিবিরে ঘেরা অসহায় মানুষগুলোর সাথে 'ফুর্তি' করার। তখন সেই অফিসার

এসে বন্দীদের সাথে নিজের ভাল সময়টা কাটাত এবং নির্যাতন করার যত ধরনের ফন্দি তার জানা আছে কিংবা তার মস্তিষ্ক আবিষ্কার করতে পারে, তার সবই তার 'ফুর্তি'র জন্য সে বন্দীদের ওপর প্রয়োগ করত। তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

জেল অফিসার সবাইকে একটা দীর্ঘ সারিতে একজন আরেকজনের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিত এবং নিজে লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে যেত। লাইনের শেষে যে দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর পাষণ্ড অফিসারটি প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মারত। ভয়াবহ শব্দ নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ফেলত। এরপর সে বন্দী লোকটাকে বলত তার সামনের লোকটাকে এমন ভাবে জোরে ঘুঁষি মারার জন্য। এভাবে করতে করতে লাইনের প্রথম মাথা পর্যন্ত চলতে থাকত।

আরো অপমানজনক ব্যাপার হচ্ছে, সেই অফিসার সে সময় নিজের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখত। লাইনের একেবারে প্রথম মানুষটা পর্যন্ত ঘুঁষি মারতে কতক্ষণ সময় লাগল, এটা সে দেখত। এরপর এ অপমানজনক খেলায় অংশ নেয়া হতভাগাদের ওপর রাগে ফেটে পড়ত এ কারণে যে, তাদের মারের গতি কেন এত স্লো। এজন্য তাদেরকে ধমক দেয়া হত এবং হুঁশিয়ারী শোনানো হত। সে চাইত যেন ঘুষি মারার খেলা আরো দ্রুত শেষ হয়।

বন্দীরা চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলত। তারা ভীষন ভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এ রকম অপবিত্র খেলায় তাদের মনুষ্য অনুভূতি লোপ পেয়ে যেত। প্রত্যেকেই শাস্তি কমানোর আশায় সেই অফিসারকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। তাকে সন্তুষ্ট রাখার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে তার সামনে যে আছে তাকে খুব জোরে এবং দ্রুত ঘুঁষি মারা। কিছু সময় পার হওয়ার পর কাজটা এতই জঘন্য ও লজ্জাকর হয়ে উঠে, যা দেখে মানবতা হায় হায় করে উঠবে। কিন্তু অফিসারটি হাসতে হাসতে আটখানা। পুরো পবিবেশটির মধ্যে মাত্র একজনই হাসছে, আনন্দ উপভোগ করছে। অন্য দিকে জগতের আর সবাই মজলুমানের দূরবস্থা দেখে কাঁদছে।

অনেক অফিসারই এ ধরনের জঘন্য খেলা খেলত। তাদের মধ্যে মেজর ফ. আ. একজন। এ জালেম ব্যাপারটাকে আরো মারাত্মক করে তুলত। সে কয়েদীদেরকে দু লাইনে দাঁড় করাত। প্রথম লাইনের লোকদের দ্বিতীয় লাইনের লোকদেরকে যত শক্তি রয়েছে ঘুঁষি মারতে বলত। এরপর যারা ঘুঁষি খেয়েছে তাদেরকে প্রথম লাইনের লোকদের ঘুঁষি মারতে বলত। এভাবে

খেলা চলতে থাকত। মেজর দেখত কে কে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যায়। এ নির্মম খেলা চলত কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত। যখন কোন অসহায় বন্দী ঘা খেতে খেতে শক্তিহীন হয়ে পড়ে যেত, তখন মেজর খুশীতে ফেটে পড়ত। সে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত।

লোহার দেয়ালের সাথে যাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের হাতে কিংবা শরীরে একটি কাগজ দেয়া হত, যাকে "রোস্তাহ" বলা হত। এ কাগজে তাদের আচরণ বিধি লেখা থাকত। অর্থাৎ কয়েদীর নাম, টয়লেটে যাওয়ার সময়, এক গ্লাস পানি খাওয়ার সময়, রুটি খাওয়ার সময় এবং তাকে কখন পিটানো হবে সে সময়ও লেখা থাকত। পানীয়-খাবার দিন হিসেবে দেয়া হত। কিন্তু বেত্রাঘাত ও মারপিট ঘন্টা হিসেবে দেয়া হত। অর্থাৎ পানি দিনে একবার, একগ্লাস দেয়া হত। কিন্তু দু ঘন্টা পর পর বেত্রাঘাতের "লাগাতার বর্ষণ" ঝেড়ে দেয়া হত।

জেলখানার প্রাঙ্গণ ও বিরামহীন লাঠি বর্ষণ

এক সকালের কথা। তখন সব দিকে চড়ুই পাখির কিচির মিচির শোনা যাচ্ছে। আমাকে ব্যারাক থেকে জেল কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়ে দেয়া হল। ঢুকার সাথে সাথে আমাকে লাঠির একটা "লাগাতর বর্ষণ" হজম করতে হল। জেলের পরিভাষায় "লাগাতার বর্ষন"কে তারীহা বলে। এক তারীহাতে অনুমান দুই শ বার বেত্রাঘাত করা হয়। তারীহা নেয়ার পর আমাকে লোহার রডের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এরপর প্রতি দেড় ঘন্টা পরে নতুন নতুন করে আমাকে তারীহা নিতে হচ্ছিল।

তিন দিন পর্যন্ত আমাকে লোহার রডে ঝুলিয়ে রাখা হল। ঘুম আর আরাম থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আজও সে কথা মনে পড়লে শরীর শিউরে ওঠে, কলিজা শুকিয়ে যায়।

এ ঘটনাটি তো কয়েকটি শব্দেই ব্যক্ত করা যায়, যা বর্ণনা করতে মানুষের এক সেকেণ্ড বা দুই সেকেণ্ড লাগে। কিন্তু সে সময় আমার অবস্থা এত মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল যা বর্ণনাতীত। কোন ভাষায় আমার পক্ষে তা প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। ঐ ঘটনা এখনো আল্লাহর স্মরণ এবং আখেরাতের ভয় মনে করিয়ে দেয়। আমার পাশে একজন ডাক্তারকেও

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শুনেছি, সে পরবর্তীকালে মুক্তি পেয়ে চিরদিনের জন্য মিশর ছেড়ে চলে গেছে। এদেশ তার জন্মভূমি। যেখানে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে। কিন্তু আজ এ জনপদ তৌহিদী জনতার জন্য আতংক হয়ে দাঁড়াতে সে তার মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সে ডাক্তারের অবস্থা আমার চেয়েও মারাত্মক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আমার অবস্থা দেখে মর্মাহত হত এবং সহানুভূতি দেখাত।

সে আমাকে পরামর্শ দিল, আমি যেন মিথ্যে মিথ্যে কিডনীর রোগীর রূপ ধারন করি। তার কতগুলি সিম্পটম সে আমাকে বলে দিল এবং কিভাবে কিডনী রোগীর ভান করা যায় তা বিস্তারিতভাবে বলে দিল। আমি এসব কথা মাথায় ঢুকিয়ে রাখলাম। যদি কোন দিন বা কোন মুহূর্তে আমার অবস্থা চরম ভয়াবহ রূপ নেয় যা আমার জীবনের পক্ষে হুমকী হয়ে দাঁড়ায়, তখন ঐ কৌশল করে মুক্তির কোন পথ খুঁজে নেব।

পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিডনী রোগীদের সাথে কি তারা নরম ব্যবহার করে থাকে?

তার উত্তরে বলব ঃ

হ্যাঁ, তদন্তের খাতিরে অনেক সময় বন্দীদেরকে ছাড় দেয়া হত যাতে তদন্ত শেষ হয়। নতুন কোন তথ্য হাসিল করতে পারবে এ লোভে তারা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইত।

কিন্তু চরম মুহূর্ত এসেই গেল। মেজর ফ. আ.-এর নেতৃত্বে অজগরের মত ডাণ্ডার রুখ আমার দিকে ধেয়ে এল। খুব ভীষনভাবে আমাকে ডাণ্ডা দিয়ে পিটান হচ্ছে। মারাত্মক ব্যথায় আমার সংবিৎ হারানোর উপক্রম। আমি পাগলের মত বিলাপ করছি এবং চিৎকার করে করে বলতে লাগলাম, আমার কিডনীতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ কথা শুনামাত্র তারা পিটান বন্ধ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ আগে বলে ছিলাম, এরা আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না পেয়ে আমাকে প্রাণে শেষ করে দিবে না। এ জন্যই তারা হাত গুটিয়ে নিল।

জেলখানার বদমাশ ডাক্তার এল। সে আমাকে ব্যথার ইনজেকশন দিল এবং বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দিল। বিশ্রাম আর কি...! পুরো রাত আমাকে দেয়াল সামনে রেখে বসে থাকতে বলা হল। এটাই আমার বিশ্রাম। সে বিশ্রাম আমি নিয়ে নিলাম। কিন্তু ঘুমানোর মোটেও অনুমতি ছিল না। খুবই কঠিন রাত। ঘুম চতুর্দিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ করছে। সেই ঘুম থামানো আমার পক্ষে চাবুকের আঘাত এবং আগুন দিয়ে ছেঁকা দেয়ার চেয়েও

বেশী কষ্টকর মনে হচ্ছে। এ যন্ত্রণা একমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব।

এক নতুন বিপদ

সকাল হল। এবার এক নতুন বিপদ দেখা দিল। আমাদেরকে হুকুম করা হয়, যেন আমরা চিত হয়ে শুয়ে নিজেদের পাগুলো ওপরে উঠিয়ে রাখি। আমরা লম্বা এক লাইনে শুয়ে পড়লাম। ব্রিগেডিয়ার এ. আর. আমাদের পরিদর্শনে আসবেন। ব্রিগেডিয়ার আসলেন। তার সাথে রয়েছে তার তিনজন আরদালী, যারা মোটাতাজা শক্তিশালী জোয়ান। নতুন আরেক নির্দেশ অনুযায়ী আমরা চোখের বাঁধনের ওপর দিয়ে জ্যাকেট রেখে দিয়েছি, যেন চেহারার কোন আঘাত প্রকাশ না পায়। ব্রিগেডিয়ার লাইনের শুরু থেকে পরিদর্শন আরম্ভ করলেন। তিনি প্রত্যেকের কাছে এসে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। বন্দী তার উত্তর দিচ্ছে। অথচ ব্রিগেডিয়ার আগেই সবার নাম জানে এবং তাদেরকে কেন তদন্ত করা হচ্ছে, সে বিষয় সম্পর্কেও অবগত আছে। প্রতিটি বন্দীর নাম জিজ্ঞেস করার পর তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জিজ্ঞেস করছে। উত্তরে সে সন্তুষ্ট হতে পারল না। কারণ সবই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। সে তার সঙ্গের সেপাইকে বলল, এর জন্য লিখ, "পঞ্চাশ", ওর জন্য লিখ "ত্রিশ", ওর জন্য লিখ "একশ"। বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন সংখ্যা বলে দিল। সংখ্যার অর্থ হচ্ছে, সে অনুযায়ী বেত্রাঘাত করা। তবে এরা যেভাবে বেত দিয়ে পেটাত তার বিশটা পঞ্চাশটার সমান। যে লোকটা লাইনের শেষে শুয়ে আছে তার পক্ষে জরুরী হচ্ছে, সে যেন পা দুটো ওপরে উঠিয়ে রাখে যতক্ষণ না ব্রিগেডিয়ার সে পর্যন্ত পৌঁছে। যদি কোন বন্দী অক্ষম ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পা নামিয়ে ফেলে, তার আর রক্ষা নেই। সৈনিকরা ঐ লোকের শরীরের মাংস কিমা কিমা করে ফেলবে।

প্রতিদিন সকালে এ ভাবে শুয়ে থাকার শাস্তি ধারাবাহিকভাবে চলল। এ অবস্থা আড়াই ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। বন্দীরা রাতও এমন ভাবে কাটায় যে, তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। কারণ, পুরো রাত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, চাবুকের আঘাত ও লোহার রডে ঝুলে কাটাতে হচ্ছে। আবার সকালের টর্চারে পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। সকালের আড়াই ঘণ্টার নির্যাতন শেষ হলে আবার তাদেরকে রডে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, যতক্ষণ না তদন্তকারী অফিসাররা এসে তদন্ত শুরু করত।

লাইটার দিয়ে দাগানোর শাস্তি

রাতের বেলা মেজর ফ. আ. আমার কাছে এল। আমার ভাগ্য খারাপ। এ পাষণ্ড আমার পিছনেই বেশী লেগে থাকে। সে দেয়ালের বাইরে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। আমি কাপড় পরেছি দেখে সে রাগে ফায়ার হয়ে গেল। জেল-কম্‌পাউণ্ড নির্যাতন শিবিরে যে সেপাই ডিউটি করছিল তাকে তলব করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে জিজ্ঞেস করল ঃ

"কোন্ অপদার্থ একে কাপড় পরতে অনুমতি দিল?"

সেপাই বলল ঃ

"স্যার! এ লোক কিডনী রোগে ভুগছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে একে এ সুযোগটা দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে মেজর ডাক্তারকেও যা তা বলে গালাগাল করল। সমস্যা মিটল এভাবে, আমাকে তখনি দেয়াল থেকে নামিয়ে ফেলা হল। এরপর কাপড় খুলে আমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে গরম গরম ভীষণভাবে তারীহা দেয়া হল। এরপর আমাকে আবার লোহার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হল। মেজর আবার আমার কাছে এল। তার চোখে ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখলাম। হাতে লাইটার জ্বলছে। হতচকিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, যদি সে এই আগুন আমার শরীরে লাগায়, আমি নিশ্চিত মরে যাব। কিন্তু সত্যিই তা-ই হল। মেজর দানবের মত অট্টহাসি দিয়ে লাইটার দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দিল। আমি মারাত্মক ব্যথায় ছটফট করছি। অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছি, আগুনের তাপে গলে যাওয়া চামড়ার পোড়া-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এরপরও মৃত্যু এলো না।

মেজর ফ. আ. একদম অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন অযথা কথা বলা শুরু করে দিলঃ

""তুমি কি কিছু বলতে চাইবে?"

"কি ব্যাপারে?"

"এবার আমরা এক সুনির্দিষ্ট কথা জানতে চাই।"

"কোন্ কথা?"

"ইয়াহ্ইয়া হুসাইন সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"যা কিছু জানি আগেই বলে দিয়েছি। নতুন কোন কথা আমার কাছে নেই।"

"তুমি কি জানতে যে, সে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূনের গুপ্ত শাখার সদস্য?"

"অবশ্যই না।"

"তার সাথে তোমার শেষ দেখা হয়েছে কবে?"

"কয়েক মাস আগে।"

"অর্থাৎ সে সুদান পালিয়ে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?"

"এ ধরনের কোন অবস্থা হয়নি।"

"তাহলে কি তুমি ইখ্ওয়ানের গুপ্ত শাখার সদস্য?"

"অবশ্যই না।"

"তুমি তার সদস্য কেন হওনি?"

"এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুবই মুশকিল।"

"এ কথার ব্যাখ্যা কর।"

"আপনার মতে, আমার জন্য কি এটাই উত্তম, যেন আমি স্বীকার করি, আমি ইখ্ওয়ানের তথাকথিত গুপ্ত সংগঠনের সদস্য। আর সে আলোকেই আপনি ব্যাখ্যা চাচ্ছেন? অথচ যে সংগঠনের কথা আপনি বারবার বলছেন, আদৌ তা গঠন করা হয়নি এবং আমাকে সদস্য হওয়ার দাওয়াতও দেয়া হয়নি!"

তা সত্ত্বেও তুমি তাদের (গুপ্ত শাখার) অনেক লোককে জানো।"

"জি, এটা ঠিক আমি অনেককে জানি।"

"মেজর বলল ঃ

"তুমি মিথ্যা বলছ।"

"তবে সত্য কি?"

"সত্য হচ্ছে, তুমি ইখ্ওয়ানের গোপন শাখার সদস্য এবং এ কথাটা তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, বুঝলে?"

"আচ্ছা, বুঝলাম।"

"আচ্ছা, এখন বল, তুমি কি বলতে চাও?"

"আপনার সিদ্ধান্তের পর আমি আর কি বলতে পারি। এটাই বলব, আমি গোপন শাখার সদস্য।"

"তাহলে সংগঠনের নেতাদের সাথেও তোমার সম্পর্ক আছে?"

"হ্যাঁ, সংগঠনের নেতাদের সাথেও আমার সম্পর্ক আছে।"

"বরং তুমি সংগঠনের একজন নেতাও বটে।"

"..., ..., ...।"

"চুপ হলে কেন?"

"বুঝে আসছে না, কি বলব।"

মেজর শাঁশিয়ে বলল ঃ

"তোমাকে বলতে হবে। নয় তো তোমার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে।"

"আমি একমত।"

"কোন্ ব্যাপারে?"

"এই যে, আমি সংগঠনের একজন নেতা।"

"এটা লিখিত দিতে হবে–এ রকমই তো না?"

"এক শর্তে দিতে পারি, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।"

"আমরা একমত। তোমাকে নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়া হবে। এস, কি লিখবে?"

"একথাই লিখব, আমি ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর একজন সদস্য।"

"এরপর তোমাকে ইখ্ওয়ানের গোপন সংগঠন ও তার সাথে কারা কারা জড়িত রয়েছে এবং তার নেতৃত্ব কে কে দিচ্ছে–এর পূর্ণ বিবরণীও লিখতে হবে।"

মেজর সাহেব! এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। আগে আপনি যা বলেছিলেন তা থেকে একটা শব্দও আমি বাড়িয়ে লিখব না। এতে করে আপনি আমার সঙ্গে যা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। যা বলেছি তার চেয়ে একটা কথাও বেশী বলতে পারব না। বিশ্বাস করুন।"

এরপর আমাকে কঠিন আযাবের চুল্লীতে ঠেলে দেয়া হল। দুর্ভাগ্য, কষ্ট ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। আমাদেরকে এ সব শাস্তি ব্যাপক ধর-পাকড়ের আগে দেয়া হয়। ব্যাপক ধরপাকড়ের নির্দেশ আসে ১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর। ঐ নির্দেশের ফলে সব ব্যাপারেই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সেই নির্দেশে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয় ইখ্ওয়ানের যে সব লোককে আগে (১৯৬৪ সনে) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদেরকে আবার গ্রেপ্তার করা হোক। উপরন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ক্ষমতা দেয়া হল, যে ব্যক্তির ব্যাপারেই ইখ্ওয়ানের সদস্য, কর্মী বা সমর্থক বলে সন্দেহ হবে তারই বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করতে পারবে। এটাও এক আজব কাহিনী। ১৯৬৫ সনের ৩রা সেপ্টেম্বরের কথা। ব্যাপক ধরপাকড়ের নির্দেশের আগে আবু যা'বাল বন্দীশালায় বন্দীদের বড় একটি দল এলো। তাদের মধ্যে আমার ভাইও ছিল। সে কোন দল করে না। তবে দোষ এটাই যে, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তার

কিছুটা পরিচয় ছিল। কোন একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার সেই বন্ধুর কাছে আমার ভাই দাওয়াতনামা পাঠিয়ে ছিল। আমার সে বন্ধু গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তার করার সময় যে তল্লাশী হয়, তখন অন্যান্য কাগজের মধ্যে সেই দাওয়াতনামাও পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারকারীদের নিয়ম ছিল, তারা যাদেরকে গ্রেপ্তার করত, সেই বন্দীর কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করত। সেই কাগজপত্রে যদি কারোর নাম লেখা থাকত, তাকেও গ্রেপ্তার করত। সে কাগজপত্র ঋণ, কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র হোক বা অন্য যাই কিছু হোক না কেন।

একটা বিষয় আজ পর্যন্ত আমি গোয়েন্দাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখছিলাম। তবে সেটা দেশের আইন, শৃঙ্খলা, শান্তি ও সরকার সংক্রান্ত কোন বিষয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আমার এক বন্ধু, যে নতুন বন্দী হয়ে এসেছে, সে গোপন কথাটি, যেটা আমি তদন্তের শুরু থেকেই জানের বাজি রেখে তদন্তকারীদের কাছ থেকে গোপন রাখছিলাম, প্রকাশ করে দিল। আমার এ বন্ধুকে এ জন্য গ্রেপ্তার করা হয় ঃ ইয়াহইয়া হুসাইনের বন্ধুদের মধ্যে কারো ঘরে একটি ঈদকার্ড পাওয়া যায়। তাতে আমার এ বন্ধুর নাম ছিল। যাহোক, যখন একে আবু যা'বাল জেলে নিয়ে আসা হল, আমার সাথে দেখা হয়ে গেলে তাকে আমি সুযোগ মত কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার কারণ বলে দিলাম। আর তাকে গুরুত্ব দিয়ে এ কথাটিও বুঝিয়ে বল্লাম, আমি যে বিষয়টা তদন্তকারীদের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করছি, তা যেন সে ভুলে যায় এবং কোন অবস্থাতেই তা সে মুখে না আনে। কিন্তু আল্লাহ তাকে মাফ করুন, যখনি তার ওপর ভীষন শাস্তি শুরু হয়ে গেল, সে মারের চোটে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, মাতালের মত হয়ে যায়। তাকে যা বলা হচ্ছে, সে স্বীকার করে নিচ্ছিল, সে সেটা জানুক বা না জানুক। এক পর্যায়ে সে সেই কথাটি পর্যন্ত বলে দিল যা এতদিন পর্যন্ত আমি জানের বাজি রেখে গোপন করে রাখছিলাম। তখন সেপাইরা, যারা তার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিল, আমাকেও তলব করল। এরপর বলাবাহুল্য, আমার ওপর ভীষন আযাব শুরু হয়ে গেল। জগত অন্ধকার হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর আমি সম্পূর্ণ সংবিৎ হারিয়ে ফেলাম।

কেয়ামতের দৃশ্য

এরপর ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন এসে গেল। এ দিনটি কেয়ামতের চেয়ে

কম ছিল না। মিশরের উজান এলাকার পল্লী অঞ্চল থেকে বন্দীদের নতুন দল আনা হয়। তাদের সংখ্যা অনেক হবে। ঐ সময় সরকারের কসাইখানায় যাদেরকে বলি দেয়া হয়েছে, এদের মধ্যে তাদের একটা বড় অংশ ছিল। এদের সবাইকে সেনা অফিসাররা নির্দেশ দিল, তাদের আসবাবপত্র একদিকে রাখতে। তারা পেরেশান হয়ে যার যার সামানপত্র ছুড়ে মারল। এরপর আচমকা জল্লাদ সৈনিকরা তাদের কাপড় টেনে তাদেরকে নগ্ন করে ফেলল এবং সাথে সাথে তাদের ওপর লাঠি বর্ষন করতে লাগল। অসহায় গ্রামের লোকগুলো তাদের বিবস্ত্র শরীরে লাঠির মারাত্মক আঘাত খেয়ে দিশেহারা হয়ে এমনভাবে এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে, যেমন খাঁচা বদ্ধ ইঁদুর অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক লাফালাফি করে। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। ফলে কমপাউণ্ডে বেশী দৌড়াদৌড়ি করার সুযোগ ছিল না। কমপাউণ্ডের দৃশ্য তাদেরকে আরো ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিচ্ছিল। যেমন লোহার রডে অনেক মানুষকে ঝুঁলিয়ে রাখা হয়েছে। ঝুলন্ত লোকদের শরীর থেকে টপটপ রক্ত করে বেয়ে পড়ছে, আবার কারোর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে। ঘা থেকে পুঁজের দুর্গন্ধ উঠছে। এ সব দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে একজন আরেকজনের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

সবখানে চিৎকার ও বিলাপের বুকফাটা আওয়াজ ভেসে আসছে। কিন্তু আমরা যারা আগে থেকে রডে ঝুঁলে আছি, ভয়-ভীতি ও আতংক থেকে অনেকাংশে নাজাত পেয়ে গেছি। কারণ, জল্লাদরা আমাদের কাছে এখন অপরিচিত নয়। তাদের বর্বরতাও সবসময় দেখছি। তবে এখনো বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও একটা জিনিস থেকে মুক্তি পাইনি, সেটা হচ্ছে ব্যথ্যা। আমি মনকে অনেকবার বুঝালাম যে, কষ্ট হল এমন অনুভূতির নাম, যা আসলে মানুষের মস্তিষ্কের কোন এক কোণে জন্ম নেয়। আর কিছু নয়। আমি ভাবতাম, আমি এ দর্শন মেনে নিয়ে আমার কষ্টকে জয় করতে পারব। সে অনুযায়ী যখনই আমার ওপর নির্যাতন শুরু হয়ে যেত, আমার মস্তিষ্ককে আমি সেই দর্শনের দিকে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু যখন শাস্তি ভীষণ আকার ধারন করত, তখন আমার এ দর্শন কোন কাজে আসত না। বরং ব্যথা ও লাঞ্চনা আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গ্রাস করে ফেলত। হয়ত আমার দর্শন তার জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু সে জন্য দরকার এমন কল্জের, যে সব ধরনের ব্যথার অনুভূতিকে জয় করতে পারে। তা তো আমার নেই।

আবু যাবল জেলে শাস্তির সূচনা হত মানসিক আযাব দিয়ে। যেমন বন্দীকে সবার আগে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলা হত। সে বন্দী আলেম হোক, মুফতী হোক, কিংবা ইমাম, বড় শায়খ, কিংবা কোন সাধারণ শিক্ষিত, যাই হোক। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে করে বন্দী তার মর্যাদা ভুলে যায় এবং সে ভাবতে বাধ্য হয় যে, সে একটি নিকৃষ্ট প্রাণী ও মর্যাদাহীন বস্তু। এরপর তার গুপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে খেলা করা হত; হাসি-ঠাট্টা করা হত। তাতে বন্দী আরো অপমান বোধ করত। তার ভিতরে গভীর হতাশা ছেয়ে যেত। এরপর তাকে বেধড়ক, লাগাতার পিটাই করা হত। তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটত। জ্বলন্ত আগুন দিয়ে দাগ দেয়া হত এবং দানা-পানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হত।

আবু যাবাল জেলের শাস্তি দেয়ার আসল হাতিয়ার হচ্ছে শক্ত ডাণ্ডা। এটা বাছাই করার মূল কারণ হচ্ছে এসব ডাণ্ডা শরীরে কোন গভীর যখম সৃষ্টি করে না। তার যখম তাড়াতাড়ি কিংবা দেরীতে নিরাময় হওয়া সম্ভব। যদিও এ ডাণ্ডা প্রতিদিন অনেক বন্দীর জান কেড়ে নিচ্ছে। চামড়ার চাবুক গোয়েন্দারা খুব কমই ব্যবহার করে। সাধারণত ভীতি প্রদর্শনের জন্য তারা এটা ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু চাবুক যখন শূন্যে দোলানো হয়, তখন তার শোঁ শোঁ শব্দ বড় বড় বাহাদুর পুরুষের কলজেও শুকিয়ে দেয়।

আবু যাবাল জেলের গোয়েন্দা পুলিশ আর সামরিক জেলের ক্রিমিনাল মিলিটারী গোয়েন্দাদের মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটি শাস্তি ও নির্যাতন করার সময় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও চালাকি ব্যবহার করে। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি হিংস্রতা, বর্বরতা, অপমান করার ব্যাপারে অতুলনীয়। তাদের সবকিছু সীমার বাইরে। এ জন্য দেখা যায়, আবু যাবাল সহ যত বেসামরিক জেলখানায় নির্যাতন করে লোক মারা হয়েছে, তার কয়েকগুণ বেশী লোক মারা পড়েছে সামরিক জেলখানাগুলোতে। যে বন্ধুর ব্যাপারে আমি বলছিলাম যে, সে আমার গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে, সে আমার গ্রেপ্তারীর বছর ১৯৬৫ সনের এপ্রিল ও মে মাসে (তখনও আমি গ্রেপ্তার হইনি) বিভিন্ন বিষয়ে পড়তে এবং আলোচনা করতে আমার সঙ্গে সন্ধ্যা বেলা সময় কাটাত। এখানে আমি সেই গোপন কথা সম্পর্কে পাঠকদেরকে জানানো ভাল মনে করি। কথাটি হচ্ছে এই ঃ

আমরা খাঁটি দ্বীন শিক্ষা ও ইসলামী জীবনধারা অর্জনের জন্য একটা কার্যক্রম প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা এ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি জায়গায় একত্র

হতাম। সেখানে আমরা সবাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান ও মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের কিছু বন্ধু সেই মজলিসে উপস্থাপনের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেকচার (বক্তৃতা) তৈরি করতেন এবং সুযোগমত তা শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করতেন। আমাদের এ আকর্ষনীয় প্রোগ্রামের সুন্দরভাবে সূচনা হয়েছিল।

এসব জমায়েতের আসল উদ্দেশ্য আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে ইসলামের ভাবধারায় গড়ে তোলা। অন্য কোন উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। প্রোগ্রামটি একদম প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। ইতোমধ্যে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। যদি আমি ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তাদেরকে বলতাম আমরা নিছক ধর্মীয় শিক্ষা ও দ্বীনি আচরণ শেখার জন্য এ প্রোগ্রাম চালু করেছি এবং এ জন্যই জমায়েত হতাম, তাহলে তারা কখনো আমার এ কথা বিশ্বাস করত না। এ কারণেই আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এ প্রোগ্রামের ব্যাপারে তাদেরকে কিছুতেই কিছুই বলব না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ইতোমধ্যে আমার বন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আসল। সে আমাদের সেই দ্বীনী ও তরবিয়তী বৈঠক সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসারদেরকে খুবই সরলভাবে সবকিছু বলে দিল। কিন্তু সেই বৈঠকগুলো যে নিছক ধর্মীয় বিষয় জানার জন্য হত, তার এ কথা তদন্তকারীরা মানল না। বরং গোয়েন্দা অফিসারদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সরকার উৎখাত করার জন্য এসব বৈঠক ও মিটিং করতাম। ফলে যা হবার তাই হল।

মিশরের শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষী সংস্থাগুলো সে সময় এমন সন্দেহ বাতিক ছিল যে, মিশরীদের সবাই জামাল আব্দুন নাসেরকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে বলে আশংকা করত। আমার বন্ধুটির ওপর এমন ভীষনভাবে নির্যাতন চালানো হল যে, তার পক্ষে আমাদের সেই তরবিয়তী (চরিত্র গঠনমূলক) মিটিংকে ষড়যন্ত্রকারীদের মিটিং স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় রইল না। কিন্তু তাদের কাছে ষড়যন্ত্র স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন জোড়ালো প্রমাণ। একটা নিছক ধর্মীয় জমায়েতকে ষড়যন্ত্রকারীদের মিটিং বলে স্বীকার করে নিলেও তার দাবীর মধ্যে থেকে যায় অনেক দুর্বল পয়েন্ট। সে দুর্বল পয়েন্টগুলো কাটিয়ে এমন একটি ঘটনার কাল্পনিকভাবে রূপ দিতে হবে, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা সত্যিই ঘটেছে; এটা কাল্পনিক নয়। বক্তব্য জোড়ালো ও সুসংহত হতে হবে। তদন্তকারীরা এটাই

আমাদের কাছ থেকে চাচ্ছে। আমরা যদিও ভীষন নির্যাতনের কারণে তাদের অবাস্তব কথা মেনে নিয়েছি, কিন্তু তারা যেভাবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যে সুসংগঠিত সূত্র তারা চাইছে, সেভাবে জবানবন্দী দেয়া আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। একটা অবাস্তব কাহিনীকে প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব রূপ দেয়া খুবই জটিল ব্যাপার। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, আমি তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়েই অনেক কিছুই স্বীকারোক্তিমূলক লিখে দিয়েছি, যেভাবে মেজর ফ. আ. আমার কাছ থেকে চেয়েছে। আমি নিজের কলম দিয়ে তাতে স্বাক্ষরও করেছি। এখন আমার পুরোপুরি মনেও নেই, আমি তখন কি লিখেছিলাম। বিষয়বস্তু কি ছিল। তবে আমার এটুকু অবশ্যই মনে আছে যে, সেখানে আমার বক্তব্য অগোছালো, গড়মিল এবং নিষ্প্রাণ ছিল। সেটা এমন মনগড়া ষড়যন্ত্রের কাহিনী, যা এমন এক সরকারের বিরুদ্ধে হয়েছে, যাকে জাতি অন্তর থেকে ঘৃণা করে এবং জাতি তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে।

আমি মেজর ফ. আ.কে বললাম, "আমার এতে কোনই আপত্তি নেই কিংবা অভিযোগ নেই, যদি আপনি আমার কাছ থেকে নতুন কিছু বিষয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে নেন এবং তাতে আমি স্বাক্ষরও দিয়ে দেব। কিন্তু আরজ এই, আমার আগের স্ট্যাটমেন্ট কি যথেষ্ট নয়?"

মেজর চোখ লাল করে বলল ঃ

"ইয়া ইবনাল কাল্‌ব! (হে কুত্তার বাচ্চা!) আমরা কি স্ট্যাটমেন্টের মধ্যে কোন পরিবর্তন করি? আমরা তো বাস্তব তথ্য জানতে চাই!"

আমার মুখ থেকে আর কোন কথা বের হল না। আমার ওপর ভীষন নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে পোড়ানো হল। আমার মুখেও স্যাঁকা দেয়া হল। সিগারেটের পোড়ানো দাগে অনেক দিন পর্যন্ত আমার চেহারা বিকৃত অবস্থায় ছিল।

আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, আমাদের আরেকজন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ছিল খুব ভীতু। সামান্য ব্যাপারে তার মন কেঁপে অস্থির হয়ে যেত। জেলখানায় তার আসাতে তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কাহিনীটি প্রস্তুতে অনেক সহায়ক হয়। আসলে তদন্তকারীদের কথা না মেনে উপায় নেই। তারা যা চাচ্ছে সেভাবেই বলতে হবে, সেভাবেই কাহিনী প্রস্তুত করতে হবে। সাফাই পেশ করে, সত্য বলে এবং কাকুতি মিনতি করে কোন ফায়দা নেই। বরং

আমরা যদি জেলখানার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই, তাহলে আমরা যেন বেশী বেশী মিথ্যা বলি এবং এমনভাবে বলি যেন সেটা সত্য বলে নিশ্চিত ধারণা হয়। ঘটনা বর্ণনায় নিখুঁত বিন্যাস থাকতে হবে। সেই ষড়যন্ত্রের ঘটনা দাঁড় করাতে গিয়ে কত যে নিরীহ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

কালো যুগের কথা

তদন্তকারী অফিসারদের মুখে বন্দীদের উদ্দেশ্যে একটি কথা সব সময় লেগে থাকত, "তোর মৃত্যু তো অনিবার্য, কোন সন্দেহ নেই। মরার আগে তোকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলতে হবে।"

আমি আগে বলেছি, মিশরের যতগুলো নিরাপত্তা রক্ষাকারী এজেন্সী আছে সবাই সমগ্র জাতিকে জামাল আব্দুন নাসেরের প্রতিপক্ষ ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে মনে করে। কাজেই তাদেরকে কিভাবে ষড়যন্ত্রকারীর চক্রে ফেলানো যায়, তা প্রমাণ করার জন্যই যতধরনের জুলুম-অত্যাচার চলে। এরপর যেন অভিযুক্ত নাগরিকদেরকে গণ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। সরকারের মনোরঞ্জনের জন্য তারা নিরীহ বন্দীদের ওপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারকে এটা দেখানো যে, তারা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছে এবং তারা সত্যিই যোগ্য। মূলত বর্তমানে সমস্ত এজেন্সীগুলো জাতির বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্যতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, সে আলোকে এ কথা বলা যায় যে, জামাল আব্দুন নাসের সরকার ও তার তল্পীবাহক গোয়েন্দা এজেন্সীগুলোই মিশর জাতির এক নম্বর শত্রু। তারাই দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি করছে। গুটি কয়েক জালেমকে হেফাজতের জন্য সিভিল ইন্টেলিজেন্স, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত গোয়েন্দা পুলিশ সংস্থা, ইনফর্মেশন ব্যুরো যেটা আব্দুন নাসেরের পার্সোনাল সেক্রেটারী সামী শারফ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সহ আরো কত অজানা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিটি শহর, অলি-গলি, হাটবাজার, সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালতে প্রতিটি এজেন্সীর দু'জন দু'জন করে সদস্য কাজ করে যাচ্ছে। মনে হয় তাদের সংখ্যা সাধারণ নাগরিকের চেয়েও বেশী। এতগুলো লোকের বেতন কোত্থেকে আসে? এরা হচ্ছে জাতির ওপর বড় বোঝা। এই অচলাবস্থা জামাল নাসেরের মস্তিষ্ক-প্রসূত। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, তিনি যদি

মিশরের তৌহিদী জনতার বিরুদ্ধে তার পোষ্য কুকুরদেরকে লেলিয়ে না দিয়ে তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতেন, তাহলে জাতি অনেক অগ্রসর হয়ে যেত এবং কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা দিত না। এমন কি এ ধরনের অযৌক্তিক এজেন্সীরও দরকার হত না। জাতির কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে তাদেরই বিরুদ্ধে হিংস্র কুকুর পোষার জন্য।

আবু যা'বাল জেলে আমি সতের দিন ছিলাম। ২৮ই আগস্ট, ১৯৬৫ সনে আমি ওখানে ঢুকি। এরপর ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনে ওখান হতে বের হলাম। এ দিনগুলোতে একটি মুহূর্তের জন্যও আমার ভাগ্যে আরাম জুটেনি। প্রতিটি মুহূর্ত কিয়ামতের মত মনে হয়েছে। জেলখানার নির্যাতন প্রাঙ্গনে থাকার কারণে আমার অনেক অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে। যেমন ঃ

এক লোককে গ্রেপ্তার করে আনা হল। তল্লাশীর সময় তার পকেটে একটা কাগজ পাওয়া গেল। তাতে ১১জন লোকের নামের একটা তালিকা। ঘটনাচক্রে পুরো এগারজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ লোকটি কিন্তু কিছুই জানে না, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই কাগজে উল্লেখিত ১১জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে–এ ব্যাপারেও সে কিছুই জানে না। লোকটাকে আমার কাছেই লোহার রডে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইন্টেলিজেন্স-এর পাণ্ডারা যখন দেখল যে, ১১ জনের সবাই স্টুডেন্ট এবং ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাত্রটির বয়স বিশের নীচে, তখন তাদের সন্দেহটা একটু জোড়াল হল যে, হয়ত এ সব কঁচি ও অপরিপক্ক ছেলেগুলোকে সরকার উৎখাতের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এসব ছাত্রের ওপর ভীষন টর্চারিং করা হয়। ওদের কাছ থেকে এ কথা স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয় যে, ওরা সত্যিই সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার ষড়যন্ত্রে জড়িত। এ জন্য ওদের ওপর এমন অত্যাচার চালানো হয় যে, মরণাপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ওরা তো বিস্ময়ে হতবাক, তদন্তকারীরা এ সব কি বলছে। ওদের কিছুই বুঝে আসছিল না, কি উত্তর দেবে। অবশেষে পুলিশ অফিসাররা নিরূপায় হয়ে ঐ লোকটার কাছে গিয়ে ওদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, যার পকেট থেকে ওদের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের ফলে অবশেষে হাস্যকর তথ্য বেরিয়ে এল।

আসলে এ লোকটা তার মহল্লায় একটা ক্লাবের ফুটবল টীম গঠন করার জন্য ছাত্রদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচিত করে তার একটা তালিকা তৈরী করে। এরাই হচ্ছে তারা।

এ ধরনের হাজার হাজার হাস্যকর ব্যাপার সে সময় এখানে ঘটেছে। এক চায়ের দোকানের ঘটনা। একদিন দু'বন্ধু সেখানে বসে চা খাচ্ছে। একজনের নাম যায়েদ, অপরজনের নাম আমর। তখন আরো অনেক লোক বসে সেখানে চা খাচ্ছে। তো আমের কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে যায়েদকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"বন্ধু! তোমার সাথে আমার কিছু পার্সোনাল আলাপ আছে, সময় করে ধীরস্থিরভাবে বলতে হবে।"

সেই দোকানে তখন বসা ছিল গোয়েন্দা পুলিশের কিছু পাণ্ডা। তারা দুজনকে তো গ্রেপ্তার করলই। সাথে সাথে যে সব লোক ঐ চায়ের দোকানে যাতায়াত করে, চা খায়, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় এনে নির্যাতন চালায়। গোয়েন্দাদের ধারণা, অবশ্যই সেই পার্সোনাল কথাটা সরকার উৎখাতের ব্যাপারে হবে। কিন্তু সেটা যে নিছক পারিবারিক ব্যাপার ছিল, তা গোয়েন্দারা মোটেই মানতে রাজী নয়। এভাবে হাজার হাজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

ভয়ংকর দৃশ্য!

আরেকটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম। ছেলেকে দিয়ে তার পিতাকে লাঠি দিয়ে পিটান হচ্ছে। ছেলেও বিলাপ করছে, বাপও বিলাপ করছে। জল্লাদ সেপাইরা ডাণ্ডা হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে যদি সামান্যতম দুর্বলতা দেখাচ্ছে তাহলে তারও নিস্তার নেই। ওমনি ওর ওপর গরম গরম লাঠি বৃষ্টি হচ্ছে। এ করুন দৃশ্য দেখে সবার চোখে পানি চলে আসে।

আবু যা'বালের এক রাতের কথা আমি কখনো ভুলব না। ঐ রাতে পুরো জেলখানা বন্দীদের দিয়ে ভরে গেছে। পুলিশ নির্দেশ দিল ঃ

"প্রত্যেকে নিজ নিজ চোখ আচ্ছামত এঁটে বেঁধে নাও।"

কিছুক্ষন পর আবার এ নির্দেশ জারি হল। যারা তখনো বাঁধেনি তাদেরকে বেদম পিটিয়ে চোখ বাঁধতে বাধ্য করা হল। পূর্বেই বলা হয়েছে, জেলখানার বিল্ডিং তিনতলা। সব ব্যারাকে নির্দেশ দেয়া হল, যেন সমস্ত বন্দী জেল প্রাঙ্গনে একত্র হয়। অতিরিক্ত এ নির্দেশও শুনিয়ে দেয়া হল, যেন সব বন্দী দুহাত এবং দুপায়ে ভর করে (চতুষ্পদ জন্তুর মত) এবং ছাগলের মত ম্যা ম্যা

করে প্রাঙ্গনে জমা হয়। উপর তলাগুলো থেকে বন্দীরা সেই চতুষ্পদ জানোয়ারের মত ম্যা ম্যা করতে করতে নীচে নামছিল। তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। সবাই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এবং চোখ বাঁধা। এর সাথে সাথে লাঠির বর্ষন এবং অপমান ও লাঞ্ছনা চলছে। অসহায় হতভাগা উলঙ্গ মানুষের ঢল জেলের সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জেলের প্রাঙ্গণ মজলুম বন্দীদের দিয়ে এমনভাবে ভরে গেল যে, পা রাখার পর্যন্ত জায়গা নেই। সবাইকে আলাদা আলাদা ডাণ্ডা মারার নির্দেশ দেয়া হল। নির্দেশ পালন করার জন্য যথেষ্ট পুলিশ ছিল না। এ জন্য জেলখানার পুরো স্টাফকে ডাকা হল। তার মধ্যে সিভিল কর্মচারী, হাসপাতালের কর্মচারী, এমনকি যারা তন্দুর রুটি বানায় তারাও রয়েছে। সমস্ত বন্দীর ওপর জোরে জোরে ডাণ্ডা পড়তে লাগল। কে বৃদ্ধ, কে রোগী, কে আহত এবং কে বালক, কোন বাছ-বিচার করা হচ্ছে না। কেউই শাস্তি থেকে রেহাই পেল না। আমরা শুনেছি, জননেতার (জামাল আব্দুন নাসের) পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে, মিশরের জনতাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

ঐ দিন দু'হাজারের বেশী লোককে আচ্ছামত লাঠি পিটাই করা হল। এরা হচ্ছেন সে সব লোক যাদের মুখে সব সময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, গুনকীর্তন জারি থাকে। সব সময় আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করেন।

"ওয়ামা-নাকামূ মিনহুম ইল্লা-আইয়ু'মিনূ বিল্লাহিল আযীযিল হামীদ"

"ওরা তাদের বিরুদ্ধে এজন্য প্রতিশোধ নেয় যে, তারা ঈমান রাখে এমন এক সত্তার ওপর, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত।"

সমস্ত লোকের চোখ বাঁধা রয়েছে। ডাণ্ডা দিয়ে যখন তাদেরকে মারা হচ্ছিল তারা ব্যথায় ছটফট করছিল, বিলাপ করছিল। তাদের হৃদয়বিদারক চিৎকারে মনে হয় আরশে-আযীম কেঁপে উঠছে।

গভীর রাত পর্যন্ত তাদের ওপর চলে ভীষন নির্যাতন। এরপর জালেমরা বন্দীদেরকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে যায়। প্রত্যেকেই ক্ষত-বিক্ষত। শরীর বেয়ে শোনিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ব্যথায় সব গোঙ্গাচ্ছে।

কেউ বিলাপ করছে। কেউ পানির পিপাসায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু তাদের সাহায্যে কেউ এলো না। এই অমানবিক ঘটনা তারা সবাই দেখেছেন যারা ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সনে আবু যা'বাল জেলে ছিলেন। তারা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী, যাদের অনেকে এখনো জীবিত আছেন। আমি সেই পুলিশ অফিসারকে কখনই ভুলব না যিনি নতুন নিয়োগ পেয়ে এসেছেন। ৭ই

সেপ্টেম্বরের সেই রাতে তিনি অসহায় বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের দৃশ্য দেখে জেলের এক কোণে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বন্দীদের অসহায়ত্বের জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছিলেন। সেই মানব দরদী খোদা প্রেমিক পুলিশকে পরে আর দেখা যায়নি। মনে হয় তাকে নাসেরের পাণ্ডারা হত্যা করেছে।

আমাকে যেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তারই কাছে দেখলাম কয়েকজন ক্ষতবিক্ষত বিমর্ষ বন্দীকে। তারা পানি পানি বলে চিৎকার করছে। রাতভর তারা একফোটা পানির জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু কোন সেপাই তাদেরকে পানি খাওয়ানোর জন্য এগিয়ে এল না। যখন সকাল হল, দেখা গেল অনেক বন্দী তৃষ্ণায় মারা গেছে।

সেই ভয়ানক রাত

গোয়েন্দা বিভাগের কসাইরা আবু যা'বাল জেলে যে সব বন্দীকে নিজেদের 'মেহমান' হিসেবে রেখেছিল, তাদের মধ্যে কেউই ৩১ই আগস্ট ১৯৬৫ সনকে ভুলতে পারবে না।

ঠিক এ দিনে প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোয় সোভিয়েত ছাত্রদের ক্লাবে তাঁর প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মত প্রকাশ করলেন। মূলত ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের সাথে আদৌ জড়িত ছিল না। এটা তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কের আবিষ্কার। জামাল নাসের ইসলামী শক্তির মূলোৎপাটন করার জন্যই কেজিবির সহায়তায় 'তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত ষড়যন্ত্রের' কথার অবতারণা করেন। তিনি সেই ক্লাবে আরো ঘোষনা করলেন ঃ

"১৯৬৪ সনে ইখ্‌ওয়ানকে আমি মাফ করে দিয়েছিলাম। তারা সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করেছে। এখন আর তাদের সঙ্গে কোন ধরনের নম্র আচরণ করা হবে না। তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।"

তাঁর এ সতর্কবানী সত্যে পরিণত হল। তার সেই বিবৃতির পর আবু যা'বাল জেলখানা নিরীহ ও তৌহিদী জনতার জন্য কসাইখানায় পরিণত হয়।

আবু যা'বাল বন্দীশালা মানবতার কসাইখানা

আবু যা'বাল জেলখানায় আমি আমার ছোট ভাইকে লাগাতার লাঠির বৃষ্টি খেতে দেখলাম। ও এবং আমার আরো কয়েকজন বন্ধু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে। লাঠির আঘাতে তাদের শরীর থেকে টাটকা রক্ত ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। ওদের বিলাপ ও আহাজারি আমার হৃদয় খানখান করে দিচ্ছিল। আবু যা'বাল জেলে ঐ সময় আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে সমস্ত আশা ছেড়ে দিলাম যখন আমাদেরকে চালানকারী একজন অফিসারের হাতে সোপর্দ করা হল। যে পুলিশ অফিসার আমাদেরকে গ্রহণ করছিল, সে খুব সতর্কতার সাথে আমাদেরকে গ্রহণ করছিল। একজন একজন করে বন্দীদেরকে গুণে গুণে গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু চালানকারী অফিসার তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"কোন চিন্তা করবেন না। সংখ্যায় যতগুলো ঘাটতি হবে, আমি সেগুলো পূরণ করে দেব।"

মনে হচ্ছে, তারা মানুষ নয়, বকরীর একটা পাল কারোর হাতে সোপর্দ করছে।

আবু যা'বাল জেলে আমি ডাক্তার আহমাদ আলমুশিতকে দেখেছি। তিনি মিশরের হার্ট অপারেশনের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার। তাকে লাথি মেরে মেরে মারা হয়েছে। এরপর নির্যাতনের সব ধরনের অস্ত্র তার ওপর প্রয়োগ করা হয়। নির্যাতনের প্রচণ্ডতা এত শেী ছিল যে, তিনি বাকশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন।

আমি আবু যা'বাল বন্দীশালায় অগনিত নিরীহ নিরপরাধ বন্দীদেরকে দেখেছি–যারা জানে না, কোন্ অপরাধে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তাই না গ্রেপ্তারকারীরাও জানে না, কেন তারা তাদেরকে ধরে এনেছে!

আবু যা'বালে গোয়েন্দা পুলিশরা নির্যাতন ও শাস্তি দেওয়ার জন্য যে সব হাতিয়ার দেশের জনগনের ওপর ব্যবহার করেছে, রোমক ও পারসিকরা তাদের আমলে বন্দীদের শাস্তি দেয়ার জন্য যে সব অস্ত্র ব্যবহার করত, ওগুলো তার চেয়েও মারাত্মক ছিল। কিংবা খ্রিস্টানরা মধ্যযুগে তাদের বিরোধী মতাবলম্বীদের ওপর যে অবিচার চালাত, যে সবের কথা আমি বিভিন্ন ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি। আমার ধারণা, আবু যাবালের অবিচার তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। মানব ইতিহাসে বর্বরতার যত কাহিনী পাওয়া যায়, আবু যা'বাল বন্দীশালায় যেন সবগুলোর একত্রে সমাহার ঘটেছে।

এখানে তোদের খোদাও ঢুকতে পারবে না

–জনৈক উদ্ধত অফিসারের দম্ভোক্তি ঃ

আমি যেদিন গ্রেপ্তার হলাম, সেদিনই একজন সেনা অফিসার যুক্তি ও তর্কের ভঙ্গিতে বলল ঃ

"শুনেছি, তুমি একজন উচ্চশিক্ষিত লোক, সব সময় জ্ঞান অর্জন এবং নতুন কিছু জানার জন্য আগ্রহী থাক?"

লেখক ঃ

"আমি আশা করছি, এ কারণে আপনারা আমার সঙ্গে সদাচারণ করবেন।"

সেনা অফিসার ঃ

"আমার বেলায় আমি বলতে পারি, তোমার সঙ্গে কোন রূঢ় আচরণ করব না। যদিও তোমার সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জোড়াল প্রমাণ ও নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। আমার পক্ষে কোন মানুষকে মারা কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি কি ইউরোপীয় আদালত সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেছ?"

লেখক ঃ

"জি।"

সেনা অফিসার ঃ

"(অত্যন্ত ব্যথিত সুরে) এখানে তুমি কিছুক্ষণ পর থেকে যা দেখবে, তা খুবই ভয়াবহ। তুমি যা পড়েছ তার চেয়ে অনেক গুণ মারাত্মক।"

লেখক ঃ

"আপনারা কি আমার সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করবেন?"

"তোমাকে কেন বাদ দেয়া হবে?"

"কোন ধরনের আপীল কিংবা যুক্তি আমার কি কাজে আসবে না?"

"স্বয়ং খোদাও এখন তোমার কাজে আসবে না, তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।"

এরপর অফিসার সাঁপের মত ফোঁসি করে উঠল ঃ

"এটা এমন জায়গা যেখানে তোমার খোদাও ঢুকতে পারবে না। এখানে কি হয় সে সম্পর্কে তোমার খোদা কিছুই জানে না (নাউযুবিল্লাহ)। আমার কথা কতটুকু বাস্তব, সেটা তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে।"

"তাহলে আমি কি করতে পারি?"

"তুমি বলতে থাক। যা জান, সবকিছু বলে ফেল। খুঁটিনাটি সব। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রটা কি ছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছু?"

"কিন্তু ষড়যন্ত্রের তো কোন ভিত্তি নেই।"

"একদম বাজে কথা। তুমি জান যে, ষড়যন্ত্র হয়েছে।"

মোটকথা, যে লোক এখানে ঢুকে, যেখানে তাদের কথা অনুযায়ী (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহরও ঢুকার শক্তি নেই–তাকে অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক এবং সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সাজতে হবে; যদিও সে আদৌ এমন না। সে যদি ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে নিজেকে স্বীকার করে না নেয়, তাহলে সে নিজের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলবে। এতেই বুঝা যায়, তদন্তের ফলাফল কি দাঁড়াবে। সেই অফিসার আমার কাছে একটা কথা সত্য বলেছে, আরেকটা মিথ্যা। সত্য কথাটা হচ্ছে, আমি এমন মারাত্মক নির্যাতন দেখব যা ভয়াবহতায় মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানাবে। বাস্তবেই আমি এ দিনগুলোতে কঠিন ও ভয়াবহ বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছি। এমন শাস্তি দেখেছি যে, প্রতিটি বন্দী প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুই বেশী কামনা করেছে। অনেক কয়েদী মানসিক দিক থেকে এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, যারা লাঠির সামান্যতম আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এখানে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই বেশী প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দৃশ্য আমার ভিতরটাকে, আমার শরীর ও অনুভূতিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত জানি, এখানে যত বন্দী রয়েছে, সবাই বেকসুর, নিরপরাধ। তাদের কোন দোষ নেই। নিষ্কলংক। তাদের মধ্যে এমন লোকও দেখেছি যারা ধৈর্যের পাহাড়, সাহসের অন্ত নেই।

অনেককে দেখেছি, তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। মৃত্যু তাদের একদম কাছে; সামান্য দূরত্বে অবস্থান করছে। এমন মুহূর্তেও তারা জল্লাদদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করছে। তাদের কোনই পরোয়া নেই। ভয় নেই, ভীতি নেই।

ভয়াবহতার মাঝে আল্লাহপাকের দর্শন লাভ

তার পরের কথাটা মিথ্যা, "এখানে খোদাও ঢুকতে পারবে না। এখানে কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।" আমি সত্য করে বলছি এবং

হলফ করে বলছি, এখানে আমি নিজে অনেকবার আল্লাহ তাআলাকে দেখেছি। ভয় ও আতংকের ঘোর অমানিষার মাঝে আমি সেই পবিত্র সত্তা মহান রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভ করেছি। বরং আমি বলব, সত্যিকারের মা'রিফত অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পরিচয় আগে আমার ছিল না। এখানেই এসে সেটা হয়েছে। এ সৌভাগ্য আমার ঐ সব মুহূর্তে হত, যখন আমাকে নির্যাতন করতে করতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেত যখন মনে হত মৃত্যু আমার অতি নিকটে। খানিক পরেই আমার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাবে। তখন দুনিয়া থেকে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যেত। তখনই আমি আমার প্রভুর দর্শন লাভ করতাম (সুবহানাল্লাহ।)

আবু যা'বাল জেলে কৃষি ইঞ্জিনিয়ার এম. এন. জেডও ছিলেন। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। তবে সম্পর্কটি সালাম কালাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, তেমন গভীর নয়। তিনি আমার বন্ধু মুগীরার কাছে থাকতেন। মুগীরার কাছে আমি কখনো কখনো আসা-যাওয়া করতাম।

এরা সবাই কৃষি কলেজের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তাদের সবার সম্পর্ক ছিল ইয়াহইয়া হুসাইনের সঙ্গে। কৃষি কলেজের খুবই দুর্ভাগা ছাত্র এরা। পরিস্থিতি তাদের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। তারা সবাই নিজ নিজ কর্মজীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একবার ঘটনাক্রমে আমার ও মুগীরার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে দেখা হয়ে যায়। তখন বিকাল। ঐ সময় আমরা যায়তুনা মহল্লার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিলাম। দীর্ঘক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ হল। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আমরা কথাবার্তা বললাম। মত বিনিময় করলাম। দোয়া-সালামের পর আমরা পরস্পর বিদায় হলাম। সেই সাক্ষাতে আমরা জানতে পারলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছোহাজ প্রদেশে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগে চাকুরী করেন। সে সময় তিনি ছোট একটা কাগজে তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখে বন্ধু মুগীরার কাছে দিলেন। এ কাগজের টুকরোটিই তার জন্য দুভার্গ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ঐ ঘটনার পর অনেক দিন কেটে গেল। দু'জনের মধ্যে কোন ধরনের সাক্ষাত ও যোগাযোগ রইল না। ব্যাপক ধর-পাকড়ের সময় আমাদের সেই ইঞ্জিনিয়ার এম. এন. জেডকে ছোহাজ থেকে এমন অবস্থায় গ্রেপ্তার করে আনা হল, যখন তিনি তার দফতরে বসে কৃষি বিষয়ে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করছিলেন। জেলে যখন তাকে আনা হল, তার দু'পায়ে বেড়ী পরানো ছিল।

আবু যা'বাল জেলে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর গোপন শাখার ব্যাপারে তাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, যেমন মুনকির নাকীর ফেরেশতারা কোন অবিশ্বাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেই বেচারাকে নির্মম শাস্তি দেয়া হল। তিনি মোটেও কিছু জানতেন না, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমার মনে পড়ে, একবার তিনি জেলপ্রাঙ্গনে উলঙ্গ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলেন। তার দুহাত শিকল দিয়ে বাঁধা, পায়ে বেড়ী। ব্যথায় তিনি পাগলের মত বিলাপ করছিলেন।

ভয়াবহ শাস্তি দেয়ার পর অবশেষে তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি ইখ্ওয়ানের গুপ্ত শাখার সদস্য। বলাবাহুল্য আদৌ সত্য ছিল না এ কথা। এরপর তিনি অনেক চেষ্টা করলেন তার সেই স্বীকারোক্তিকে শক্তিশালী ও জোড়ালো বানানোর জন্য, কিন্তু তাতে তিনি সফল হলেন না।

সত্যিই তিনি যদি এ ধরনের সংগঠনের ব্যাপারে সামান্য কিছু জানতেন, তাহলে তার জ্ঞানের যে পরিধি, তার আলোকে তিনি অবশ্যই তদন্তকারী লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। কিন্তু একটা কাল্পনিক সংগঠনের ব্যাপারে কতটুকুই বা বলা যায়! ফলে তাকে আরো কঠিন শাস্তি দেয়া হল।

তিনি মানসিক দিক দিয়ে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। গ্রেপ্তারীর পর থেকে জেলখানার পুরো সময়টি তিনি মস্তিষ্ক-বিকৃত অবস্থায় কাটান। বছর পর যখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েন। তার পুরো জীবন বরবাদ হয়ে গেল।

সপ্তম অধ্যায়

সামরিক জেলখানা

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনের রাতটি আমি জেগে কাটালাম। পুরোরাত জেল প্রাঙ্গনের রডে ঝুলে রইলাম। সকাল হলে আমাকে জেলের কাছে এক বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হল। আমার চোখ বাঁধা। এ বাংলোতেই তদন্তের নামে রক্তের হোলী খেলা হয়। পুরো দিনটি ভীষণ গরমের মধ্যে কাটল।

এ দিন আমার ওপর এমন নির্যাতন চলানো হল যে, এর সামনে আগের সমস্ত বর্বরতা ম্লান হয়ে যায়। আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল।

সেই জালেম মেজর ফ. আ. তার উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত খেয়ালী তথ্য জানার জন্য পুরোদিন আমাকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিতে থাকে। আমি তাকে বার বার দৃঢ়তার সাথে বললাম, "ইতিপূর্বে আমি যা কিছু বলেছি, তার বাইরে আমার কাছে বলার আর কিছুই নেই। আমি গুপ্ত শাখার সদস্য নই। সংগঠনের অন্যান্য লোকের কাছ থেকে আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। যাদেরকে আপনারা গুপ্ত সংগঠনের হর্তাকর্তা বলছেন, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক সালাম কালাম পর্যন্ত, এর বেশী নয়। তারাও কখনো আমাকে তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য বলেনি এবং হয়ত ভাবেওনি। তাদের কাছে আপনি নিজে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

মেজর বলল ঃ

"আচ্ছা, বল, হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি রকম?"

লেখক ঃ

"এটা আবার কোন্ মসিবত! তার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই

মেজর ঃ

"কিন্তু তোমার ঘর থেকে যে সব কিতাব ও বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার ভিতর তো হিযবুত তাহরীরের বই আছে।"

লেখক ঃ

"এ সব বই কায়রোর লাইব্রেরীগুলোতে বিক্রি হচ্ছে। আপনি যে কোন একজন সেপাইকে পাঠিয়ে দেখুন। সে এ ধরনের হাজার কিতাব কিনে আনতে পারবে।"

মেজর ঃ

"ঐ সব বইয়ের প্রতি তোমার আকর্ষনের রহস্যটা কি?"

লেখক ঃ

"জেনারেল নলেজ বাড়ানোর জন্য আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি। মানুষের তো তার আশে পাশে কি হচ্ছে, এ ব্যাপারে জানা উচিত এবং সেটা তার জানার অধিকার রয়েছে।"

মেজর ঃ

"ঠিক আছে, ঠিক আছে! ক্যাসেট শেষ হওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। তুমি নিশ্চয়ই ইখ্‌ওয়ানের গুপ্ত ঘাতক সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জান।"

লেখক ঃ

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ! আমি এ ব্যাপারে কিভাবে জানব?"

মেজর ঃ

"তুমি যেহেতু মাত্রই বললে যে, মানুষের আশেপাশে কি হচ্ছে এ ব্যাপারে তাকে জানা উচিত এবং তার জানার অধিকার রয়েছে। তোমার আকর্ষনটা অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও তার ভাবধারার দিকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। আর ইখ্‌ওয়ান এ ধরনেরই একটি সংগঠন।"

লেখক ঃ

"জনাব! আপনি যে সংগঠনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন তাতে আপনার উদ্দেশ্য কি তার প্রকাশ্য সংগঠন, নাকি গুপ্ত সংগঠন?"

মেজর ঃ

"ঐ ইবনুল কাল্‌ব (কুত্তার বাচ্চা)! আমি তো গুপ্ত সংগঠনের ব্যাপারেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।"

লেখক ঃ

"এটা তো গুপ্ত বস্তু। আমি সে সম্পর্কে কিভাবে জানব?"

মেজর গালটা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠল ঃ

"হে ইবনুল কাল্‌ব! সবাই বলছে, তুমি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির একজন?"

লেখক ঃ

"হায় হায়, পোড়াকপাল! একলাফে পাঁচ সদস্যের একজন হয়ে গেলাম! এটা একদম ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক কথা। আপনি সেই পাঁচ সদস্য কমিটিকেই জিজ্ঞেস করুন।"

মেজর ঃ

"পাঁচ সদস্য কমিটিকে জিজ্ঞেস করার পর যদি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়?"

লেখক ঃ

"তাহলে আমাকে গুলি করে হত্যা করা আপনার জন্য বৈধ হবে।"

মেজর ঃ

"সে অবস্থায় তোমাকে জুতা মেরে হত্যা করব।"

মেজরের সাথে বার বার এ ধরনেরই কথাবার্তা হত। এগুলোই ছিল বিষয়বস্তু। তবে শব্দগুলো হয়ত কোন সময় সামান্য পরিবর্তন হত। আসরের সময় আমাকে আবার মেজর ফ. আ.-এর কাছে হাজির করা হয়। সে কোন ভূমিকা ছাড়াই প্রশ্ন শুরু করে দিল।

"তুমি কি খানগাহ্-এর শাবান কে চেন?"

লেখক ঃ

"এই শাবান আবার কোন্ কাহিনী?"

"ঐ কুত্তার বাচ্চা! আমি যা প্রশ্ন করি তার ঠিক ঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা কর। জানো তো, কতগুলি ঘুষি তোমার ওপর পড়বে। আর দেখছ, কতগুলো লাঠি আমার সামনে পড়ে আছে?"

"জি হুযূর! যা আজ্ঞা হয় বান্দা হাজির।"

"তাহলে বল, খানগাহ্-এর বাসিন্দা শাবানকে চেন?"

"এ নামের কোন লোককে আমি চিনি না। আমার সাথে যারা দেখা

করেছে তাদের মধ্যে শাবান নামের কোন লোক নেই। শাবান নামের কোন লোক আছে কিনা, আজ পর্যন্ত তাও জানি না। আমি আমার এ কথা লিখে দিতে প্রস্তুত আছি।"

মেজর বলল ঃ

"খুব ভেবে চিন্তে বল!"

"স্যার! অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই বলছি এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছি। আমি মোটেও এ ধরনের লোককে জানি না–যার নাম শাবান। সে খানগাহ্-এর বাসিন্দা হোক কিংবা অন্য কোন শহরেরই হোক।"

মেজর ঃ

"তোমার ওপর ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে।"

"বর্তমানে যে কষ্টে আছি, এর চেয়েও কি বড় বিপদ হতে পারে?"

"তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে বর্তমানের বিপদের তুলনায় আরো মারাত্মক কোন বিপদ হতে পারে কিনা।"

"মহান রাব্বুল আলামীনের কসম! যিনি সব ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, আমি শাবান নামের কোন লোককে চিনি না।"

মেজর ঃ

"ছাড়ো তোমার এসব বোগাস কথা! এখন থেকেই তৈরী থেকো। তোমাকে আজ রাতে সামরিক জেলে পাঠানো হচ্ছে।"

যদি কেউ আমাকে গুলি করত, তাও গায়ে লাগত না। আমি গুরুত্ব দিতাম না; কিন্তু সামরিক জেলের কথা শুনে আমার হৃদ-স্পন্দন যেন থেমে গেল। ভয়ে আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম।

আবু যা'বাল জেলে অবস্থানকালে আমরা সামরিক জেলের কাহিনী শুনতাম। আমরা এখানে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দিন পার করলেও আমরা বুঝতাম, পরকালের আযাব ছাড়া সামরিক জেলের শাস্তির চেয়ে অন্য কোন বড় শাস্তি নেই। আমি এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভাবিনি যে, আমাকে সামরিক জেলেও যেতে হবে। আমি এ মনে করে মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম, মেজর শুধু ভয় দেখানোর জন্য সামরিক জেলখানার কথা বলেছে। সেখানে যাওয়া অনেক দুরূহ ব্যাপার। আমরা কোথায়, আর সামরিক জেল কোথায়! এ ভাবে ক্ষনিকের জন্য আমার মনটা কিছুটা হলেও শান্তি বোধ করল।

লেফটেন্যান্ট ইসাম শাওকী আমার কাছে এল। সে আমার চোখ থেকে বাধন সরালো। সে বলল, আমি যেন তার পেছনে পেছনে জেলখানার ভিতর ঢুকে নিজের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে নিই এবং জেলের পোশাক জেলওয়ালাদের কাছে দিয়ে দিই।

আমি মনে মনে বললাম, এটাও ভয় দেখানোর আরেক চাল। অতএব, আমাকেও এমনভাব দেখানো উচিত যে, আমি তাদের কথায় সত্যিই কাতর হয়ে গেছি, যেন তাদের উদ্ধত মন কিছুটা শান্তি পায়। আমরা জেলখানার দিকে চললাম। এ প্রথমবার আমি এ পথ দিয়ে খোলা চোখে চলছি। আমি ধারাল চুখা পাথরের স্তুপ দেখলাম। এ পাথরের ওপর দিয়ে চলার সময় আমি অনেক হোঁচট খেয়েছি। অগনিত কাঁটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। যতবার এ পথ দিয়ে গিয়েছি, আমার পা রক্তাক্ত হয়েছে। এখনো আমি খুব কষ্টে এ পথ দিয়ে হাঁটছি। পা দুটো কাঁটা ও চুখা পাথরের আঘাতে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে। এমন কি ফুলে পর্যন্ত গেছে। অনেক কষ্টে জেল পর্যন্ত পৌঁছুলাম। জেলের দেয়ালে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তারা এমন কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন মনে হয় আমি একজন শয়তান।

জেলখানার গেইটে এমন একটি বড় গাড়ী দাঁড়ানো আছে যেটা সাধারণত কয়েদীদেরকে এদিক-সেদিক নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের গাড়ী দিয়েই আমাদেরকে কেল্লার জেল থেকে এখানে আনা হয়েছিল। গাড়ীটা দেখে আমার অন্তর আঁতকে ওঠল। তাহলে কি তারা যে হুমকি দিচ্ছিল তা আসলেই সত্য?

ইসাম শাওকী বলতে লাগল, তার কথাগুলো মনে হচ্ছে কোন গভীর কূঁপ থেকে ভেসে আসছে ঃ

"তোমাকে এখনি সামরিক জেলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।"

"কেন?"

"আমি কি জানি, তোমাকে ওখানে কেন তলব করা হচ্ছে! তবে তোমাকে এ কথাটা কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, যদি ওখানে তুমি এমন কিছু বল–যা এখানে বল নাই, তার অর্থ এই দাঁড়ায়, আমরা কাজ করতে পারি না। আমাদের কাজ করার যোগ্যতা নেই। যদি অবস্থা তাই হয়, তাহলে তুমি বুঝে নাও, আবার যখন এখানে আসবে, তখন তোমাকে খুন করার জন্য অন্য কোন বাহানার প্রয়োজন হবে না।"

এ কথা শুনে যেন চারদিক থেকে ভয়-ভীতি আমাকে ছেয়ে ধরল। ব্যাপার তো সত্যই। কোন ঠাট্টা, কিংবা ভয় দেখানো নয়। হে আল্লাহ তুমি আমায় সাহায্য কর, দৃঢ়পদ থাকার তৌফিক দান কর। আমি জেলখানায় ঢুকলাম। চেহারা ফ্যাকাশে, অনুভূতি লোপ পেয়েছে। সিঁড়ির কাছে আরো বাইশজন লোক বসে আছে। তাদেরকে আমার সাথেই সামরিক জেলখানায় যেতে হবে। তাদের দিকে একবার তাকালেই অনুমান করা যায় তাদের অবস্থা কত সংগীন। সবাই জোড়-আসন করে বসা। চেহারার রং ফ্যাকাশে বিবর্ণ। মাথা নীচের দিকে ঝুলে আছে। প্রচণ্ড গরমের সাথে সাথে তীব্র আতংক সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছে।

দুনিয়ার জাহান্নাম

লেফটেন্যান্ট আমাকে একজন মেজরের হাতে সোপর্দ করল। এর নেতৃত্বেই আমাদের হতভাগা লোকদের কাফেলা সামরিক জেল অর্থাৎ দুনিয়ার জাহান্নামের দিকে রওনা হবে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

"তোমার সেই পোশাকটা কোথায় যেটা গ্রেপ্তারীর মুহূর্তে তুমি পরেছিলে?"

"উপরের ব্যারাকে পড়ে আছে।"

"কুত্তারবাচ্চারা! দৌড় লাগাও, ওটা জলদি করে নিয়ে এসো!"

আমি ব্যারাকে গেলাম। দেখলাম, পুরো ব্যারাক বন্দীদের দিয়ে ভরে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে এটা ব্যারাক নয়, মানুষের খনি। সমস্ত পুরানো বন্দী যারা আমার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, সবাই আমার অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বন্ধু আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

"বন্ধু হিম্মত রেখো, সাহস হারিও না। মরণ তো একদিন আসবেই। কেয়ামতও অবশ্যম্ভাবী। সেদিন আল্লাহ পাক কবর থেকে সব মানুষকে ওঠাবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফের মিযান (মানদণ্ড) কায়েম করবেন, যেখানে সকল মানুষ তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে।"

আমার মুখ থেকে দোয়া বের হয়ে আসতে লাগল। আমি নিজেকে সংবরন করার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। অবশেষে সেই

কাপড় পরে নিলাম যা গ্রেপ্তারের সময় পরেছিলাম। জেলখানার পোশাক ভাঁজ করে পেচালাম। পেয়ালা, প্লেট ও এ্যালুমিনিয়ামের একটা ছোট্ট চামচ যা আমি এই প্রথমবার ব্যবহার করেছি, একটি পুটলায় বেঁধে নিলাম। ব্যারাকের সমস্ত লোকগণ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে আমাকে বিদায় জানালেন। যেন এমন লোককে বিদায় জানানো হচ্ছে যাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নীচ তলায় চলে এলাম এবং আমার হাতে ছোট যে পুটলা রয়েছে তা জেলকর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে আমার নিজের আমানত আমি নিয়ে নিলাম। এ আমনত আবার কি? মিশরীয় ত্রিশ টাকা। এই ত্রিশ টাকা নিয়ে আমি এক জেল থেকে আরেক জেলে স্থানান্তরিত হচ্ছিলাম। এ সময় এ জেলটি (আবু যা'বাল জেলখানা) আমার কাছে খুব আপন ও প্রিয় মনে হতে লাগল।

কারণ, যেখানে এখন আমাকে পাঠানো হচ্ছে, সেটা জাহান্নামের মত। যে ব্যাপারটা আমাকে বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে তা হল, আমি দেখছিলাম, খোদ জল্লাদরা পর্যন্ত আমার মত লোকদেরকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখছে যারা সামরিক জেলে চলে যাচ্ছি। তার অর্থ এই, তাদের ধারণা সামরিক জেলের গুরুজ আবু যা'বাল জেলের গুরুজের থেকে বেশী শক্ত ও নির্মম। সামরিক জেলে আমাদের ওপর যে মুসিবত নাযিল হবে, তার কথা ভেবে এখানকার পাষান হৃদয় জল্লাদদের মনেও সহানুভূতি ও হামদর্দী প্রকাশ পাচ্ছে। "হে আমার রব! কবে আমরা এ মুসিবত থেকে মুক্তি পাব। তোমার ফায়সালা তো সময় মতই হবে। হে অবুঝ মন! হিম্মত রাখ, সাহস হারিও না।" আমার অন্তর থেকে প্রার্থনা বেরিয়ে এলো।

আমাদের দুজন দুজন করে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হল। আবার সবগুলো হাতকড়াকে একটা লম্বা শিকল দিয়ে গেঁথে দেয়া হল। এভাবে পুরো গ্রুপকে একটা সুসংবদ্ধ কাফেলায় পরিণত করা হল। তবে সত্যি বলতে কি, এদেরকে শুধু লোহার হাতকড়া সুসংবদ্ধ করেনি, একই সাথে দুঃখ, ব্যথা ও সীমাহীন কষ্টেও সবাই একই বন্ধনে আবদ্ধ। জল্লাদরা আমাদের চোখগুলো বাঁধতে ভুলল না। এ কাজটাও তারা করে নিল এবং এটা করার সময় যে ধরনের অমানবিক আচরণ তারা করে থাকে, তাঁর সবই করল। যেমন লাঠি বর্ষন, অশ্লীল গালি ও ঘুষি ও লাথি। চলার মুহূর্তে তারা আরেকটি ওয়ার্নিং দিয়ে দিল ঃ

"যে যাওয়ার পথে মুখ খুলবে, তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং তার সাথে কোন ধরনের নম্র ব্যবহার করা হবে না।"

এ সতর্কবাণীর কোন গুরুত্ব ছিল না। কারণ আমাদের মধ্যে কেউই কথা বলতে ইচ্ছুক না। কথা বলার মত মনোবলও নেই। আমরা সামরিক জেলখানার দিকে যাচ্ছি–যেখানে মৃত্যু আমাদের অপেক্ষা করছে। তবে মৃত্যুও আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছু নয়, যাকে আমরা ভয় পাই। মূলত আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত আখেরাতের কথা চিন্তা করে।

আমাদের এই গ্রুপে দুজন আর্মির জওয়ান ছিল। এরা প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের শরীর স্পর্শ করছিল। আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করছিল এবং বিভিন্ন অশ্লীল গালি দিয়ে যাচ্ছিল। একজন সৈনিক বলল ঃ

"তোমাদের ওপর আসমানওয়ালার (আল্লাহর) অনেক বড় মেহেরবানী হবে যদি তোমাদের এ পুরো গ্রুপটি নদীতে গিয়ে পড়ে এবং সবাই ডুবে মারা যায়।"

সে যখন কথাগুলো বলছিল, তখন বন্দীদের গাড়ীটি ইসমাইলিয়া নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গাড়ীর আগে ও পেছনে পুলিশের গাড়ীও ছিল। আরেকজন সেপাই বলল ঃ

"তোমরা কি জান, তোমরা যে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছ, সেখানে তোমাদের নসীবে কোন্ ধরনের শাস্তি আছে।"

সৈনিকদের কথাগুলো শুনে আমার ঠোঁটে আপনা আপনি কিন্তু খুবই ক্ষীণ স্বরে অত্যন্ত কাতরভাবে এ দোয়া বেরিয়ে এলো ঃ

"আয় আল্লাহ! প্রথম সৈনিকের কথা তুমি কবুল করে নাও, যেন আমাদের এ গাড়ী নদীতে নিমজ্জিত হয় এবং আমরা সবাই ডুবে মারা যাই।" বরং আমি এ জন্য আফসুস করতে লাগলাম। "হায়, খুব ভাল হত যদি গতকাল আমাকে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলা হত।"

কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্ত ছিল অন্য রকম। তিনি চাচ্ছেন যেন আমরা আরো পরীক্ষার সম্মুখীন হই। যেমন যুগে যুগে তার প্রিয় বান্দাদেরকে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেছেন। এ কারণেই আগ্রহ সত্ত্বেও আমাদের গাড়ী নদীতে গিয়ে পড়ল না। পরে আমি জানতে পারলাম, আমার মনের ভেতর যেমন ইচ্ছা ছিল, অন্য বন্দীদের মনেও সেই একই ইচ্ছা ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রত্যেকেই ঠিক সেই দোয়া করছিলেন, যা আমি করছিলাম। ইসমাইলিয়া নদীর পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী চলছিল। নদীটা আমরা দেখতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পরেই আমরা কায়রো সড়কের সেই কোলাহল, শোরগোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যা রাজধানীর ব্যস্ততম পরিবেশ

থেকে উঠে আসছে। কায়রোর জনগন কিছুই জানে না, এই গাড়ীর দুর্ভাগা বন্দীদের কথা। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। পথিমধ্যে বেশ কিছু পুলিশ স্টেশন ও গোয়েন্দা পুলিশ কেন্দ্রে আমাদের গাড়ীটা কিছু সময়ের জন্য থামল।

দু ঘণ্টা চলার পর হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম মানুষের কোলাহলের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। গাড়ীর ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ এখন আর শুনা যাচ্ছে না। আমরা বুঝে ফেললাম, কসবায়ে নসরের সীমানায় আমরা ঢুকে পড়েছি। এখানেই সেই ভয়ানক কুখ্যাত সামরিক জেলখানা, যার পাঁচিল দেখলে মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। যেখানে খুবই হিংস্রতা ও ঔদ্ধত্যের সাথে মানুষের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং জাতির সম্মানিত লোকদের লাঞ্চনার শেষ স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমার মাথায় ভীষণ তোলপাড় চলছে। আমার আত্মা ব্যাকুল। আমি ভাবছি, কি করে একজন মানুষ তারই মত আরেকজন মানুষের সাথে এই ভয়ানক সামরিক জেলখানায় বর্বর আচরণ করতে পারে। তার মধ্যে কোন মনুষত্ব নেই? আমাকে কেন এখানে তলব করা হয়েছে? এখানে আমার ওপর কী ধরনের নির্যাতন চলবে?

গাড়ী থেমে গেল। ভয়ের কারণে হঠাৎ করেই আমার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আমার অনুভূতির মধ্যে তখন কিছুটা স্পন্দন সৃষ্টি হল যখন লোহার শিকল বাজতে লাগল এবং আমার হাত কড়া আমাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই একই শিকলের বন্ধনে আবদ্ধ। ঠাণ্ডা ও শক্ত লোহার শিকল কসবায়ে নসরের গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রাণের শিতল একটা ভাব সৃষ্টি করছিল।

দ্রুত আমরা গাড়ী থেকে নীচে নামলাম। আমার দুই চোখ বাঁধা। আমার কানে এক ধরনের আওয়াজ ভেসে এলো, প্রথমে খুবই ক্ষীণভাবে ছিল এবং তারপর আচমকা সেই শব্দ উঁচু হতে লাগল। এখন সে শব্দ প্রচণ্ডরূপ ধারন করল। মনে হয় সে শব্দের প্রচণ্ডতার কারণে কানের পর্দা ফেটে যাবে। আমার শরীর কাঁপতে লাগল। এগুলো চাবুক ও ডাণ্ডা মারার শব্দ–যার আঘাত শুধু শরীরকেই ক্ষত-বিক্ষত করছে না, বরং বাতাসকেও ভারী করে তুলছে। সেই শব্দের সাথে সাথে হিংস্র প্রাণীদের ডাকের মতও কিছু আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত হিংস্র দানব এখানে জমা হয়েছে। এ সব আওয়াজের মধ্যে একটা মানুষের চিৎকার ধ্বনিও শুনতে পেলাম। এটা

বলা মুশকিল, এ আর্ত চিৎকার একজন পুরুষের, নাকি মহিলার অথবা কোন বাচ্চার! কারণ সামরিক জেলে তিন ধরনের মানুষকেই শাস্তি দেয়া হচ্ছিল।

এ মুহূর্তে আমার অন্তর চিৎকার করে ওঠল, হায় বিশ্ববিবেক! তুমি কি শ্রবনশক্তি হারিয়ে ফেলেছো। তুমি কি সেই নিরীহ অসহায় মানুষের হৃদয়বিদারক চিৎকার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছো না। সভ্যতার শরীরে কি পঁচন ধরেছে, তার আত্মা কি অকেজো হয়ে গেছে কিংবা ধ্বংস হয়ে গেছে!

আমরা সামরিক জেলে পৌঁছে গেলাম। সবাই গেইটের সামনে দাঁড়ালাম। আমার হাতকড়া ও ভারী শিকল দিয়ে বাঁধা। চোখ বাঁধা। ইতোমধ্যে সৈনিকরা আসল এবং আমাদেরকে ডাণ্ডা ও চাবুক দিয়ে মারতে মারতে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তারা এমনভাবে নির্যাতন শুরু করে দিল, যার দৃশ্য আমি কল্পনা পর্যন্ত করতে পারব না। তবে ইতিহাসের বইয়ে যুগে যুগে এ ধরনের নির্যাতনের কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মিশরে সেই অন্ধকার ও বর্বরতার যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটবে–এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি ভেবেও কুল পাচ্ছি না সভ্যতার এই কেন্দ্রস্থলে কেন অন্ধকার যুগের বর্বরতা সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে সব সময় নয়া দর্শন, চিন্তাধারা ও আন্দোলন জন্ম নিচ্ছে–যেগুলোর মূল শ্লোগানই হচ্ছে স্বাধীনতা, মানবতা ও সভ্যতা। আর সেই সভ্যতার পীঠস্থান মিশরে জাতির স্বাধীনতা হরনকারী লুটেরা এবং ডাকাত শাসক ও তার চেলারা দম্ভের সাথে পুরো দেশ চুষে বেড়াচ্ছে। ঘর থেকে নিরীহ লোকদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে অজানা ও অপরিচিত স্থানে নিয়ে তাদের ওপর এমন নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে, এ যুগের সবচেয়ে জালেম এডলফ হিটলার ও তার জল্লাদ প্রকৃতির গেস্টাপো পুলিশ বাহিনীও যে আচরণ করেনি। সরকার ও তার চেলারা সাম্য, মানবতা ও প্রগতির শ্লোগান উচ্চারণ করে। জাতির সভ্য, নিরীহ ও খোদাভীরু লোকদেরকে হত্যা করে, তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তারা কোন্ ধরনের লাল বিপ্লব দেশে আমদানী করতে চায়? মিশরে আজ কোন্ নব্য ফেরাউনের পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত শাসন চলছে–যে মানুষের ইজ্জত-সম্মান স্বাধীনতা অধিকার সব হরণ করে নিচ্ছে। সাম্যবাদের ধ্বজাধারীরা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তৌহিদী জনতার রক্ত প্রবাহিত করে কোন্ ধরনের সাম্যবাদ কায়েম করতে চাচ্ছে?

সামরিক জেলখানার ভিতর ঢুকে মনে হল, এমন একটা অন্ধকার অরন্যে প্রবেশ করেছি, যেখানে মানুষ খেকো হিংস্র প্রাণী ভরা। হিংস্রপ্রাণীর মধ্যেও

আল্লাহ পাক এমন হৃদয় দিয়েছেন যার মধ্যে মায়া-মমতা, দয়া আছে। কিন্তু লুটেরা অপদার্থ লোকগুলো যারা সামরিক জেলে বিচরণ করছে, তাদের মধ্যে দয়া-মায়া বলতে কোন কিছুই নেই। তারা বছর ভর আমাকে বিভিন্ন প্রকারের আযাব দিতে থাকে। তাদের চরিত্রের ভিতর এমন কুৎসিত পঁচন ধরেছে যার কাছ থেকে ভালোর কিছুই আশা করা যায় না। তারা আগুনের গোলার মত, যা সব কিছুই পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মানুষের মধ্যে যে সব ভাল গুণ ও সৌন্দর্য রয়েছে, তাদের মধ্যে তার বিন্দুমাত্রও নেই।

অসহায় নির্যাতিত মানুষের হৃদয়বিদারক চিৎকার, বিলাপ ও গোঙ্গানীর মধ্য দিয়ে একটা কর্কশ ও গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনা গেল ঃ

"এই শিকলে বাঁধা অপদার্থ লোকগুলো কারা?"

"পাশা? এরা হচ্ছে নতুন বন্দী। তাদেরকে আবু যা'বাল জেল থেকে এখানে আনা হয়েছে।"

"তাদের চোখ পট্টি দিয়ে বাঁধা কেন?"

"পাশা সাহেব! সিভিল ইন্টেলিজেন্সদের এটাই নিয়ম।"

পাশা বিদ্রূপাত্মক হেসে বলল ঃ

"সিভিল ইন্টেলিজেন্স-এর লোকেরা বন্দীদের চোখ পট্টি দিয়ে বেঁধে দেয়, কারণ তারা ভয় পায়, না জানি ছাড়া পেয়ে এরা ভবিষ্যতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করে কিনা। কিন্তু আমরা তো শাস্তি দেই। আর জানে মেরে ফেলি। শাস্তিও হত্যাও। আমাদের কারোর কোন ভয় নেই। এখানে যারা আসে তাদের দুটোর একটা ছাড়া উপায় নেই, হয় সে চিরদিন মহান নেতা জামাল নাসেরের অনুগত গোলাম হয়ে যাবে। আর না হয় তাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। আর যদি সে কোন কারণে যা আমাদের নাগালের বাইরে, মৃত্যু থেকে বেঁচেও যায়, তাহলেও সে জীবনেও কখনো এই আকাশচুম্বী কেল্লা এবং এদিকে আসার যে পথ আছে ঘূর্ণাক্ষরেও সেদিকে পা বাড়াবে না। অতএব এ সব ইঁদুরের চোখের বাঁধন সরিয়ে ফেল।"

আমাদেরকে জেলের দেয়ালের দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। বেড়ী, শিকল ও হাতকড়া খুলে দেয়া হল। এরপর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল, যেন নিজেদের চোখ থেকে বাঁধন খুলে ফেলি। চোখের বাঁধন খুলে বন্দীদের মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এলো যেন তারা কোন শোক মিছিল করছে আর তারা যেন একটি ভয়ানক কূঁপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেউ

জানে না এখানে তাদের ওপর কী ধরনের নির্যাতন হবে!

যখন আমরা সামরিক জেলে পা রাখলাম, সব ধরনের আতংক থাকলেও আমি আমার চিন্তাশক্তিকে কিছুটা হলেও সক্রিয় রাখতে সমর্থ হলাম। সেই শক্তির জোরেই আমি আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে বিদায় জানালাম এবং অনুমান করে নিলাম যে, আমি আখেরাতের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। এখন আমি নিজেকে মেহেরবান দয়ালু খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি। তিনি যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। যাই হবে ভাল হবে। আখেরাত আমার জন্য মঙ্গলই হবে। এ ধরনের চিন্তা ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। এ মুহূর্তে আমি ঠোঁটে ঠোঁটে এ দুটি কবিতা পড়লাম। কবির নাম আমার মনে নেই।

লা তুদ্দাব্বির লাকা আমরান-ফা উলুত্ তাদবীরি হালাকা

সাল্লিমিল আম্‌রা তাজিদুনা-তাজিদুনা আওলা বিকা মিনকা

অর্থ ঃ তুমি তোমার নিজের জন্য কোন তদবীর করো না,

অনেক তদবীরকারী ধ্বংস হয়ে গেছে।

তুমি নিজের ব্যাপার আমার কাছে সঁপে দাও,

আমি তোমার জন্য তোমার চেয়েও বেশী হিতাকাঙ্খী।

আমি এখানে নিজেকে আল্লাহপাকের মেহমান ভাবতে লাগলাম। অথচ এখানকার প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহপাকের সত্তাকেই চ্যালেঞ্জ করছে। সেই আল্লাহ তাআলা যিনি মহান, সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র।

সামরিক জেলের একরাত অর্থ দুনিয়ার সব কষ্ট

সম্মানিত পাঠক ভাইয়েরা! এখানকার অবস্থা আপনাদের কাছে কী বর্ণনা করব! এখানকার কালো দিনগুলো যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা কেঁপে ওঠে। যদি এখনও ভুলেও আমার তখনকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, আমি ভয়, আতংক, দুঃখ, বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়ি। যার নসীবে সামরিক জেল জুটেছে সে জঘন্য থেকে জঘন্যতম, ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতম অবস্থা দেখতে পেয়েছে যা মানবজীবনে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আমার অনুভূতি অনুযায়ী, দুনিয়ার সমগ্র মুসিবত একত্র করলেও

এখানকার এক রাতের বিপদের সমান হতে পারবে না।

আমি যত বিস্তারিত লিখতে চাই না কেন, কলমে যত জোর দিই না কেন, সামরিক জেলের অবস্থা, দৃশ্য যথার্থভাবে অংকন করা সম্ভব নয়।

জেলখানার 'অভ্যর্থনা' প্রথা

সামরিক জেলে আগে থেকে একটা রীতি চলে আসছে, তাকে জেল পরিভাষায় 'অভ্যর্থনা' বলা হয়। এই রীতি অনেক আগে থেকে চলে আসছে। প্রতিটি জল্লাদ তা পালন করে আসছে। তারা চলে গেলে তাদের পরবর্তীরা তা পালন করে। বহুকাল ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। তার মধ্যে আসছে আরো নির্মমতা।

সেই প্রথার সারকথা হচ্ছে, জল্লাদরা যখন বন্দীদেরকে গ্রহণ করে, তখন গ্রহণ করা মাত্রই বন্দীদেরকে এমন নির্মমভাবে নির্যাতন করে, য়ার ফলে অনেক সময় সেখানেই বন্দীরা মারা যায়। জল্লাদদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, "প্রথম দিনেই বিড়াল মারা"র নিয়ম অনুযায়ী নতুন বন্দীরা যাতে সম্পূর্ণভাবে তাদের কথা মেনে চলে, নিজেদেরকে অক্ষম ও তুচ্ছ মনে করে এবং কোন সময় তারা জল্লাদদের সামনে মাথা উঁচু করে না চলে।"

অভ্যর্থনার স্তর আমাদেরকে পার হতে হয়েছে। তার ভয়াবহ কাহিনী আমরা আবু যা'বাল জেলখানায় শুনতাম। আমি কি আপনাদের সামনে অভ্যর্থনার চিত্র তুলে ধরতে পারব? মনে হয় না। তবে চেষ্টা করব। সামরিক জেলে যখন আমরা ঢুকলাম, তখন তার কেমন অবস্থা ছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি। বুকফাটা চিৎকার ওঠছে। হায় হায় শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। হৃদয়বিদারক বিলাপ আর গোঙ্গানীর আওয়াজ পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মানুষের রক্তে রক্তাক্ত ডাণ্ডাগুলোর ঠাশ-ঠাশ, শা-শা শব্দ কানের সাথে বারি খাচ্ছে। এরই মধ্য গোশ্‌ত-মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য অনেকগুলো হিংস্র কুকুর আনা হল। কুকুরগুলোর গর্দান শিকল দিয়ে বাঁধা। সেপাইরা শিকল ধরে রেখেছে। কুকুর খেউ খেউ শুরু করে দিয়েছে। ধীরে ধীরে আমাদের ঠ্যাং-এ দাঁত বসাতে শুরু করেছে। আমরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় ও আতংকে পাথর বনে গেছি। এরপর সেপাইদের একটা দলকে ডাকা হল, যারা খুবই গাট্টাগাট্টা এবং তাদের হাতের পাঞ্জা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে হবে। তাদের প্রত্যেককে নির্ধারিত

খেলা দেখাতে হবে। তারা কুকুরের মতই ট্রেনিংপ্রাপ্ত। পূর্বেও তারা সেই নির্মম কাজগুলো করত। কুকুরের মতই হিংস্রতা। প্রতিটি সেপাইয়ের ডিউটি ছিল, তারা আমাদের প্রত্যেকের সামনে দিয়ে যাবে এবং আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে একটি করে শক্তিশালী ঘুঁষি বসিয়ে দেবে। তারা তাদের খেলা শুরু করে দিল। কিন্তু এটা ঘুষি নাকি শক্তিশালী বোমা! যেমন কষ্ট তেমন শক্ত। আমার এক পাশে একজন খুনখুনে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে যখন ঘুঁষি মারা হল তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলাম না, ভয়ে নাকি ঘুঁষির আঘাতে। আমি এ অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে তার ওপর ঝুকে পড়লাম। আমার মনটা তার জন্য সহানুভূতিতে ফেটে যাচ্ছে। বুড়ো আল্লাহওয়ালা লোকটি বুকফাটা বিলাপ করছে। আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের (সাঃ) দোহাই দিচ্ছে। খুবই অসহায়ত্ব ও করুণার সাথে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছে। এ অবস্থায়ই হঠাৎ তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। চিরদিনের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মারাত্মক আতংকের কারণে তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে। আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন।

আমাকে লাইন থেকে আলাদা করা হল। সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্মম নির্যাতন চালাতে লাগল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে সংবিৎ হারিয়ে ফেললাম। যখন হুঁশ এলো, নিজেকে সাথীদের মাঝে মাংসের স্তুপের মধ্যে পেলাম। আমাদের সবাইকে মারা হয়েছিল এবং ভীষন ভাবে মারা হয়েছে। এমন মারা হয়েছে যে, আমরা মারের চোটে গোশ্‌তের স্তুপে পরিণত হয়েছি। কুকুরগুলো স্তুপের কাছেই রয়েছে। তারা খুবই হিংস্রতার সাথে আমাদের রক্ত চাটছে। বিষাক্ত দাঁত বসিয়ে বন্দীদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ রাতে কুকুরগুলো কত পরিমাণে বন্দীদের গোশ্‌ত আর রক্ত খেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

দুনিয়ার জাহান্নামের প্রথম রাত

আমরা ছাইয়ের স্তুপের মত পড়ে আছি। আচানক সেপাইরা চিল্লিয়ে বলতে লাগল ঃ

“কুত্তার বাচ্চারা! সবাই দাঁড়িয়ে যাও। নতুন নির্দেশ তোমাদেরকে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে।”

ভীষন কষ্ট সত্ত্বেও নির্দেশ পালন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জোড়া-জোড়া ব্যথা আর দুর্বলতায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তারা নির্দেশ দিল মার্চ করে সেখানে যাওয়ার জন্য, যেখানে আমাদের রাত কাটাতে হবে। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার দোযখের প্রথম রাত। এ নতুন নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সবাই "বড় জেল" বলা হয় যে অংশটাকে সেদিকে হাঁটতে থাকলাম।

সামরিক জেলের চতুর্দিকে উঁচু দেয়ালের বেষ্টনী। এ দেয়ালের ভিতর রয়েছে অনেকগুলো দালান। প্রত্যেকটা দালানের নম্বর রয়েছে। ১নং দালানকে "বড় জেল" বলা হয়। এটার মধ্যে ঠুঁসে ঠুঁসে একহাজার লোক ঢুকানো যাবে। ভিতরে রয়েছে তিনশ সেল। দালানটি তিন তলা। এখানেই আমি আমার বন্দী জীবন কাটিয়েছি। ১নং দালানের পর ২নং দালান, ৩নং দালান, ৪নং দালান ... এরপর হাসপাতাল, যেখানে সে লোকই যায় যে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে অথবা মারা গেছে। এরপর ব্যবস্থাপকদের অফিস। এগুলোর সাথেই রয়েছে নির্যাতনের সেল। সামরিক জেলের মধ্যেই একটা মনোরম সুন্দর বাংলো রয়েছে–যেখানে জেলের সবচেয়ে বড় জল্লাদ হামযা বাছিওয়ানী থাকে। সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, ইতিহাসে যখন নির্যাতন, হত্যা এবং অপদস্ত করার অধ্যায় লেখা হবে, তখন সর্বাগ্রে তারই নাম লিখতে হবে। এ সব বিশাল বিশাল দালানের মধ্যখানে একটা জীর্ণ-শীর্ণ ভাঙ্গা মসজিদ রয়েছে, যে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে এখানকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করছে। জেলের দেউড়ী যেখানে আমাদেরকে তিনঘন্টা পর্যন্ত "অভ্যর্থনা" জানানো হয়েছে, এখান থেকে নিয়ে বড় জেলের মাঝে দূরত্ব হল অনুমান দুই শ পঞ্চাশ মিটার। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল, যেন আমরা কোন পথপ্রদর্শক ছাড়াই বড় জেলের দিকে অগ্রসর হই। অথচ পথটা ছিল আঁকা-বাঁকা এবং সম্পূর্ণ অচেনা। সেপাইরা ডাণ্ডা মেরে মেরে আমাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে এ নির্দেশও ছিল যেন আমরা প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর ঘাড়ে জোরদার ঘুঁষি লাগাতে থাকি। যারা এ নির্দেশ না মানবে তাদের বিপদ অনিবার্য।

আমরা মার খেতে খেতে খুবই শোচনীয় অবস্থায় বড় জেলের সামনে পৌঁছলাম। আমাদের ভয় আরো তীব্র হয়ে গেল যখন জানতে পারলাম আমাদেরকে আরেকটা "অভ্যর্থনা" নিতে হবে। এটা হচ্ছে "স্থানীয় অভ্যর্থনা" যা বড় জেলের ময়দানে দেয়া হবে।

এ ময়দানটা অনেক বিস্তৃত ও চারকোণা। তার প্রস্থ একশ পঞ্চাশ মিটার। এর এক প্রান্তে একটি কূঁপ রয়েছে যেখানে মিশরের অগণিত ইসলামের সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। কূয়াটা বড় জেলের দরজার ডান পাশে অবস্থিত। পানি দিয়ে ভরা। এর কাছেই রয়েছে লোহার একটা লম্বা টেবিল। সাধারণত এখানেই বসে জেলখানার প্রহরীরা খানা খায়। আমরা সেই ময়দানটাতে ঢুকে পড়েছি।

আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে। আমরা তাই করলাম। প্রহরীদের একটি দল যারা তখন খানা খাচ্ছিল, তড়িঘড়ি করে আমাদের দিকে অগ্রসর হল। পরে আমরা জানতে পারলাম, এ সব সেপাই খাওয়া-দাওয়ার ওপর শাস্তি ও নির্যাতন করা ছাড়া অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেয় না। আমাদেরকে দেখে তারা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে আমাদের দিকে ধেঁয়ে এলো।

কারণ তাদের কাছে খাওয়ার চেয়েও প্রিয় হচ্ছে মানুষের সাথে অমানবিক আচরণ। এটা তাদের কাছে অত্যন্ত মজার ব্যাপার। তারা নিরীহ মানুষকে লাথি মেরে, লাগাতার ডাণ্ডা মেরে এবং বিভিন্নভাবে বর্বর আচরণ করে যে মানসিক শান্তি পায়, তা অন্য কিছুর মধ্যে পায় না। এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আপনি এমন অনেক অস্বাভাবিক লোক দেখতে পাবেন যারা মানুষের রক্ত পান না করলে তাদের মনে তৃপ্তি আসে না, শান্তি আসে না। তারা মানুষের রক্তাক্ত দেহ না দেখলে তাদের চোখে ঘুম আসে না। এরা সেই প্রকৃতির।

বড় জেলের "অভ্যর্থনা আসর" দু ঘন্টা পর্যন্ত চলল। তারা নির্যাতন করার সেই পদ্ধতি গ্রহণ করল যা আমরা দেউরীতে দেখছিলাম। কিন্তু হিংস্রতা ও বর্বরতার দিক থেকে এরা পূর্বের সব রেকর্ড ভঙ্গ করল। আমাদের সমস্ত নগদ টাকা তারা হাতিয়ে নিল। হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নিল। কলম নিয়ে নিল। কিছু কিছু শার্ট যেটা পছন্দ হল নিয়ে নিল। এরপর আমাদের সবাইকে ৬নং ষ্টোরে বন্ধ করে রাখল। তখন আমরা মারের চোটে ক্ষত-বিক্ষত। ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত। মনে হল, এখনই কোন্ বিপদ এসে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে ছোবল মেরে নিয়ে যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

৬নং ষ্টোরের জগত

এ ষ্টোরটি এক কামরার। এটা প্রথমতলায় জেলের লোহার বড় গেইট দিয়ে ঢুকলে বা পাশে পড়ে। তার সামনে পানির কূপ। তার একটা জানালা "বড় জেল"-এর বাইরের দিকে, যেখানে সামরিক জেলের বড় পার্ক রয়েছে। কামরাটার একদম বিপরীত দিকে রয়েছে হাসপাতাল। বেশ কিছু দূরে যেখানে পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে রয়েছে তদন্ত অফিস।

এ কামরাতে দশজনের চেয়ে বেশী লোক ধরবে না, অথচ এখানে অগণিত লোকদের ভরে রাখা হয়েছে। সীমাহীন কষ্টে তারা থাকতে বাধ্য হচ্ছে। সকাল বেলা যখন সূর্যের আলো ছড়ালো, তখন আমরা বন্দী লোকদের গুনে দেখলাম। তাদের সংখ্যা দাঁড়াল পঁয়তাল্লিশে। অথচ এ কামরার–যাকে ষ্টোর বলা হয়, আয়তন ৩১২ বর্গমিটার মাত্র। প্রস্রাব, পায়খানা ও পুঁজের দুর্গন্ধে রুমটি ভরে গেছে। চাপা গোঙ্গানীর শব্দও হচ্ছে। কারণ, নির্দেশ ছিল, যেন কোন ধরনের আওয়াজ উঁচু না হয়। নির্দেশ না মানলে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেয়া হবে। এগুলোর কাছে যখমের দুর্গন্ধ খুবই পছন্দ। এখানে পাঠক ভাইদের কাছে বলে রাখা দরকার, আমরা যখন এ ষ্টোর রুমটাতে ঢুকলাম, তখন আমরা সবাই মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত ছিলাম। আমাদের যখমগুলো থেকে অনবরত রক্ত বেয়ে পড়ছে। বিলাপ, গোঙ্গানী, আহাজারীর একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ষ্টোরের মধ্যে ঢুকানো হল। ঘন অন্ধকারের কারণে আমরা একজন অপরজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে

পড়ছিলাম এবং যেখানে যে বসতে পারলাম, সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত ঠিক ঐভাবে পাথরের মত সেখানেই বসে রইলাম।

সেপাইরা কড়াভাবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, তারা কোন ধরনের শব্দ ও নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে চায় না। যে এমন করবে তার শাস্তি মৃত্যু। আমরা জানতাম, তারা যে ধমকি দিচ্ছে এটা কোন কথার কথা নয়; এরা যা বলে করে দেখায়।

তারপরও আমাদের একজন সঙ্গী নিরবতা ভাংলেন। তিনি প্রস্রাবের বেগ অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিলেন। আমাদের মধে তিনি খুব কম টয়লেটে যেতেন। তিনি ৩৬ ঘন্টা আগে টয়লেট করেছিলেন। যাহোক, খানিক পর তিনি ষ্টোরের দরজাটা সামান্য ফাঁক করলেন। দরজার বাইরে একজন কুৎসিত চেহারার বিশাল দেহী সেপাই-এর ছায়া নজরে এলো। তার হাতে শক্ত ডাণ্ডা। সে গলা উঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ

"কেউ কি টয়লেটে যেতে চায় না কি?"

আমরা কেউ উত্তর দিলাম না। একদম চুপ। সে অকথ্য গালাগাল করতে লাগল। এরপর আবার সেই একই প্রশ্ন করল।

ভীষন অন্ধকার, বন্দীদের চেহারা বুঝা মুশকিল। কিন্তু সবাই যে ভীত-সন্ত্রস্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। সেপাইটির দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করাতে আমাদের সেই সঙ্গীর কিছুটা সাহস হল বলে মনে হয় এবং তিনি টয়লেটে যাওয়ার জন্য মিনতি করলেন। ইনি কিছুদিন আগেও মিশরের সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল ছিলেন। সেই কুৎসিত সৈনিকটি হাম্‌তাম্‌ করে তেড়ে এলো এবং বন্দী জেনারেলকে বাহু ধরে টেনে হেঁচড়ে বন্দীদের ওপর দিয়ে ষ্টোরের বাইরে নিয়ে এলো। দরজার বাইরে খুব টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছিল। জেনারেলকে সেখানে এনে বেদমভাবে পেটাতে লাগল। তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এরপর হিংস্র কুকুর এনে লেলিয়ে দেয়া হল। আমাদের চোখের সামনে সেই রক্ত খেকো কুকুরগুলো তার শরীরের মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগল! ভয়াবহ দৃশ্য! এত শাস্তি দেয়ার পরও সেই বেচারাকে তারা কুঁয়ার মধ্যে ফেলে দিল। যখন মুমূর্ষ অবস্থা, তখন তাকে কুয়া থেকে উঠিয়ে এনে কামরার মধ্যে ছুড়ে মারল। একই সাথে রক্ত ও পানির ফোটা তার শরীর থেকে টপকে পড়ছে। তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন। বেশ খানিকপর তার কাপড় শুকিয়ে গেল বটে; কিন্তু রক্ত শুকালো না। এ শিক্ষা তাঁকে এ জন্য দেয়া হল

যেন আগামীতে তার টয়লেটে যাওয়ার কখনো প্রয়োজনই না হয়। এরপর তিনি নিজের জায়গায় প্রস্রাবও করলেন, পায়খানাও। দুর্গন্ধে কাছে যারা বসে আছেন, তাদের নাকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। আমারও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। যার যার জায়গায় বসে নিজের ভাগ্য নিয়ে ভাবতে লাগল। এ কিয়ামতের শেষ কোথায়? আতঙ্কে এখন কেউ টু শব্দ পর্যন্ত করছে না। এমন কি নিজের শ্বাস-নিঃশ্বাসেরও শব্দ শুনা যাচ্ছে না।

প্রতি পনের মিনিট পর দরজা খোলা হচ্ছে এবং এক একজন নতুন বন্দীকে আমাদের ওপর ছূঁড়ে মারছে। মানব সন্তানকে এখানে এমনভাবে ছুড়ে মারা হয়, যেন তারা মানুষ না; আলুর বস্তা! নতুন বন্দীরা হয়ত তদন্তের স্তরগুলো পার হয়েই এখানে আসছে। কিংবা সরাসরি ঘর থেকে ধরে এনে এখানে ঢালা হচ্ছে। ভয়াবহ 'হায় নফসী' অবস্থা!

ভীষণ অন্ধকার। আমরা চেহারা থেকে কাউকে চিনতে পারছিলাম না। তবে অনুভব করছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে কিছু হাত মুখের উপর ওঠছে। রক্তাক্ত হাত দিয়ে আমাদের মুখ চাপা দিতে চেষ্টা করছিলাম, যাতে কোন ধরনের গোঙ্গানী ও বিলাপের সুর মুখ থেকে বের না হয়। কারণ এ ধরনের শব্দ শুনলে সেপাইরা সুযোগ পাবে নতুন উদ্যমে নির্যাতন চালানোর জন্য।

আমরা ক্ষুধায় ছটফট করছি। তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু ভয় ও আতংকের সামনে এসব কিছুই না। ভয় এমনভাবে ঢুকেছে, মনে হয় বুক ফেটে আত্মা বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি চাপা কণ্ঠে বলল ঃ

"ভাইয়েরা আমার!" এ শব্দটি তার মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র সেই জেনারেল যার মলমূত্রে মেশা কাপড় থেকে ভীষণ বিশ্রী দুর্গন্ধ ওঠছে, একদম বলে ওঠলেন, "তুমি কি চাও! আমাদের ওপর দিয়ে যে দুঃখ-দুর্দশা যাচ্ছে, তোমার দৃষ্টিতে সেটা যথেষ্ট না?" কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই চাপা কণ্ঠটা আবার সরগরম হয়ে উঠল এবং সে বলতে লাগল ঃ

"আমি একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।"

"কী ব্যাপার?"

"দরজার কাছে দুটো রবারের পট পড়ে আছে।"

"কি জন্য?"

"আমার ধারণা, এ দুটো পটের মধ্যে একটা প্রস্রাব করার জন্য,

আরেকটা পানি খাওয়ার জন্য। তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না, কোন্‌টা প্রস্রাব করার জন্য এবং কোন্‌টা পানি খাওয়ার জন্য।" আমাদের একজন সঙ্গী এ কথা শুনে অতি সন্তর্পণে ওঠে দাঁড়াল এবং একটা পটে প্রস্রাব করল। আরেকজন সঙ্গী সেই প্রস্রাব পান করল।

সেই রাতে আমি জীবনে প্রথমবার প্রস্রাব পান করলাম অর্থাৎ করতে বাধ্য হলাম। তৃষ্ণায় কাতর মানুষ নিজের জান বাঁচানোর জন্য কিছু না কিছু উপায় খুঁজে। কিন্তু প্রস্রাব মুখে দেয়া কি এত সহজ ব্যাপার?

সে রাত আমাদের জন্য এমন কষ্টদায়ক ছিল যে, আমাদের কোন সঙ্গী এক মুহূর্তও ঘুমোতে পারল না। এ ছাড়াও এ ধরনের আরো অনেক রাত আমাদের নসীবে জুটেছে। আমরা যে নির্যাতন, দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছি, তার কারণে এ ব্যাপারে চিন্তা করারও সুযোগ খুবই কম পেতাম যে, যখন আমাদেরকে হঠাৎ করে তদন্তের জন্য তলব করা হবে, তখন সেখানে আমরা কি জবাব দেব, কিংবা কোন মত গ্রহণ করব!

আল্লাহর কি মর্জি! তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে আমাকে চল্লিশ দিনেরও বেশী অপেক্ষা করতে হয়।

আবু যা'বাল জেল ও সামরিক জেলের তদন্তের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। সামরিক জেলখানার তদন্তের সারাংশ হল, এখানে বন্দীদেরকে ডাণ্ডা মেরে মেরে কিংবা লোহার রড গরম করে সেক দিতে দিতে একদম জানে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাদের নখগুলো টেনে টেনে ওঠিয়ে ফেলা হচ্ছে। হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বন্দীদের শরীরের মাংস আলাদা করা হচ্ছে। বিদ্যুতের শক্‌ দেয়া হচ্ছে। অন্য দিকে ফৌজী বুটের লাথির আঘাতে বন্দীদেরকে প্রায় মরণাপন্ন করে দেয়া হচ্ছে।

সেনা অফিসারের মর্মান্তিক মৃত্যু

রাত ভীতিকর পরিবেশ ও নির্দয় অন্ধকারের মাঝে ডুবে আছে। ইতোমধ্যে কামরার দরজাটা খুলে গেল এবং আরো দুজন বন্দীকে আমাদের ওপর ছুঁড়ে মারা হল। এরপর একজনের নাম ধরে ডাকা হল। লোকটা ভয় ও আতংকে কাঁপতে কাঁপতে ওঠে দাঁড়াল। তার ওপর ভীতি এতই মারাত্মক ভাবে ছেয়ে গেছে যে, আমরা তার দাঁত বাজার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অন্ধকারের

ভিতর আমি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের আঙ্গিনার মৃদু আলো রুমের দরজাকে স্পর্শ করছে। যখন লোকটা দরজার কাছে পৌঁছল, তখন আমি মৃদু আলোয় তাকে চিনতে পারলাম। তিনি হচ্ছেন সেই বদনসীব ফৌজী জেনারেল, যাকে গত রাতেও ভীষন নির্যাতন করা হয়েছে। এখনো সেই নির্যাতনের রেশ তার শরীর থেকে কাটেনি। আবার তাকে তদন্তের জন্য তলব করা হয়েছে। আমার মনে আছে, ষ্টোরে যত বন্দী রয়েছে তারা সবাই আমার এই কাকুতি-মিনতির দোয়ার মধ্যে শরীক ছিল, তখন আমি বলছিলাম, "হায় মাবুদ! না জানি এ জেনারেল কোন্ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! আপনি তার মুসিবতকে আসান করে দিন। তার কষ্টকে লাঘব করে দিন।" তখন আমার সাথীদের মুখ থেকে চাপা গলায় আমীন বেরিয়ে এলো।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লে আমরা আমাদের সবার চেহারা দেখতে পেলাম। ষ্টোরের দরজা খুলে গেল। চারজন বিশালদেহী মোটাতাজা সেপাই সেই জেনারেলকে পাঁজাকোলা করে ওঠিয়ে কামরায় ঢুকল। ডাণ্ডার প্রচণ্ড আঘাতে জেনারেলের দেহ ফেটে ক্ষত-বিক্ষত। কুকুররা তার শরীরের মাংস খেয়ে পেট ভরেছে। শরীরের অনেক জায়গায় মোটেও গোশত নেই। সেপাইরা ঢুকেই তাকে আমাদের ওপর ছুঁড়ে মারল। ঘাসের ভারী বস্তার পতন হলে যেমন শব্দ শুনা যায় তেমনি শব্দ হল। আমাদের কারোর হিম্মত হল না তাকে স্পর্শ করার কিংবা কিছু সেবা-শুশ্রূষা করার, যাতে তার ব্যথিত হৃদয়ে কিছুটা শান্তি লাভ করে। তার ছেড়া-ফাটা কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তের কোন্ ধারা কোথা থেকে বের হচ্ছে, বলা মুশকিল ব্যাপার। তার সম্পূর্ণ শরীর ক্ষত-বিক্ষত। গভীর যখম। প্রতিটি অংশ থেকে রক্ত বেয়ে যাচ্ছে। সূর্যের কিরণ যখন ফুটছে, সেই জেনারেল হঠাৎ করে তার চোখ দুটো খুললেন এবং দুনিয়ার ওপর একবার দৃষ্টি বুলালেন। এরপর তিনি আল্লাহ ... বলে বিকট শব্দে চিৎকার করলেন। আমার মনে হল, জেলখানার প্রতিটি কোণা প্রকম্পিত হয়ে উঠল! চিৎকারের সাথে সাথেই তিনি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। ইন্না লিল্লাহি... রাজিউন।

ঐ রাতে দু'জন বন্দীকে মেরে ফেলা হয়। মারাত্মক আহত হয় চল্লিশজন। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সেপাই আসল এবং সেই নিরীহ সেনা অফিসারের লাশ একটা উলের কম্বলে পেঁচিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেল। কেয়ামতের

সময় উঠে হয়ত তিনি তার নির্যাতনের কথা প্রকাশ করবেন। দিন হয়ে গেছে। সূর্যের আলো প্রখর হচ্ছে। টর্চার করার যন্ত্রপাতির আওয়াজও শুরু হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে লুকাব না, রাতের বেলায় যারা নির্যাতন সয়ে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন, তাদের কারোর ব্যাপারে আমাদের কেউ দুঃখ প্রকাশ করল না। আমাদের মধ্য হতে কারোর অন্তরে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশের জন্য কোন জায়গা ছিল না। আমাদের প্রতিটি লোমকূপ বেদনা আর আতঙ্কে ভরা। বরং আমাদের তাদের জন্য ইর্ষা হয় যারা নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে শাহাদাতের মর্তবা পেয়ে গেছে এবং আল্লাহ দরবারে জ্যোতির্ময় চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে।

ষ্টোরের দরজা যখন সামান্য ফাঁক হল এবং জেলের আঙ্গিনায় উকি মারার সুযোগ হল, তখন এই অর্ধনির্মিলিত চোখ দুটো এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখল যা কখনো ভুলতে পারব না।

সেপাইদের একটা দল এক দুর্বল বৃদ্ধের উপর ডাণ্ডা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা তাকে নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে। বৃদ্ধ আর্তনাদ করছেন। তাদেরকে দোহাই দিচ্ছেন, কাকুতি-মিনতি করছেন না মারার জন্য। কিন্তু জল্লাদরা যেন তার কাকুতি-মিনতি শুনে আরো ফেটে পড়ছে। তারা তার কমযোর হাড় ও শীর্ণ শরীরের ওপর আরো প্রচণ্ড জোরে লাঠি বর্ষন করতে লাগল। এক পর্যায়ে বৃদ্ধের মুখ থেকে ফেনা বের হতে লাগল। তার দাঁতের পাটি লেগে গেল। চির দিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার দুটো হাত আসমানের দিকে ওঠে গেল। আমি আন্দাজ করতে পারলাম না, হাত দুটি ফরিয়াদের জন্য আসমানের দিকে ওঠেছে, নাকি আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য!

আঙ্গিনার দেয়ালে আর্ট করা দুটি ছবি দেখতে পেলাম। একটি হচ্ছে এ যুগের ফেরাউন জামাল আব্দুন নাসেরের, আরেকটা হচ্ছে আব্দুল হাকীম-এর। ছবি দুটি দেখে মনে হচ্ছে না, কোন অভিজ্ঞ আর্টিষ্ট এগুলো এঁকেছে। মনে হচ্ছে, ক্লাস ওয়ানের কোন শিশু এগুলো এঁকেছে। ছবিগুলোর উপর স্পষ্ট অক্ষরে একটা কথা লেখা আছে ঃ

“আমি ক্ষুধার্তকে প্রতারিত করি, যেন আমি আমার ইচ্ছামত জীবন-যাপন করতে পারি।” জানি না এ কথাটি কে লিখল! কোন ধোঁকাবাজ, নাকি শিল্পী নিজেই, নাকি আমার মত কোন হতভাগা, নাকি এখানকার জল্লাদেরা!

আমার মনে হচ্ছে, আমার আত্মা কোন ভয়ঙ্কর কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার আশেপাশে যা ঘটছে, এ সব নিয়ে আমার ভাববারও শক্তি নেই। আসল কথা হচ্ছে, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যে সীমাহীন বর্বরতা ও হিংস্রতা চালানো হচ্ছে, এর জন্য সরকারের এ সব জল্লাদ বাহিনীর কাছে নেই কোন যুক্তি, নেই কোন দলীল-প্রমাণ। এ ভীতিকর ও বিপদজনক নাটক কবে শেষ হবে, কিভাবে শেষ হবে, এর কল্পনাও আমার পক্ষে অসম্ভব। আসন্ন প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে আমি বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করি। আযাবের যে চাকায় আমি পিষ্ট হচ্ছি, দুর্বল মানুষ হিসেবে আমার পক্ষে এটা সহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ বাস্তবতা সত্ত্বেও নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ধীরে ধীরে আমি আমার মন থেকে নিদারুণ হতাশা ও নৈরাশ্য ভাব দূর করে দিলাম। আমি সেই সব সত্যিকারের মুমিন মহান মানবদের স্মরণ করতে লাগলাম, যারা অপরিসীম ও অচিন্তনীয় ত্যাগ স্বীকার করে ইসলামের বুনিয়াদ তৈরী করে গেছেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রভুর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। সে মহান সাহাবায়ে কিরাম (রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন)-এর ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

"রিজা-লুন ছদাকূ মা-আহাদুল্লাহা আলাইহি" (তারা হচ্ছেন সে সব লোক, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।) আমি নিজের অন্তরের গভীর থেকে দোয়া করতে লাগলাম ঃ

"হে আমার রব! তুমি আমাকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান কর। তাঁদের সাথে আমার হাশর করো এবং আমি আজ যে বিপদ ও মুসিবতের সম্মুখীন, আমাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দান কর। আমার মুখ থেকে যেন কোন ধরনের নালিশ ও অভিযোগ না বের হয় সেই তৌফিক ও শক্তি আমাকে দান কর।"

একজন গোয়াড়, বদমেজাজ ও কর্কশ কণ্ঠের সেপাই ষ্টোরে ঢুকল। পরে জানা গেল, তার নাম হচ্ছে রুবী। রুবী ষ্টোরে পা রাখতেই আমাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে লাগল। কিছু গালি আমরা বুঝতে পারছিলাম, কিছু বুঝতে পারিনি। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সে আমাদেরকে অত্যন্ত জঘন্য গালি দিচ্ছিল। তার হাতে একটা নোংড়া পাত্র ধরা। সে তার নোংড়া হাত দিয়ে আমাদেরকে 'তা'মিয়া' (মিশরের সাধারণ খানা)-এর এক এক

টুকরো করে দিতে লাগল। যে হাত দিয়ে সে খাবার দিচ্ছে, সে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে কয়েকবার নাক পরিষ্কার করল। এরপর তার পরনের সরকারী কাপড় দিয়ে হাত পুছল। আমার মনে আছে, তার কাজ দেখে আমার মনে কোন ধরনের ঘৃণা আসেনি। কারণ, পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ ছিল যে, এগুলো ভাববার অবকাশই ছিল না। বস্তুত আমাদের অনুভূতিই লোপ পেয়েছিল।

তা'মিয়া বিলিয়ে দিয়ে সে আমাদের মাথার ওপর কয়েকটা রুটি ছুঁড়ে মারল। এরপর সে চলে গেল।

আমরা রুটি গুনলাম। রুটি আর কি! মাত্র কয়েক টুকরো। মোট পাঁচটা মাত্র। অথচ মানুষ আমরা ছিলাম পঞ্চাশজন। প্রতি দশজন বন্দীর ভাগে একটা রুটি জুটল। তাও আবার অনেক ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হবার পর। এ জন্যই আমাদের অনেক বন্দী ভাই খেতে অস্বীকার করল। এর কারণ কিন্তু কোন প্রতিবাদ কিংবা অহংকার প্রকাশ না; বরং আমরা আসলে এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলাম যে, আমাদের ক্ষুধার অনুভূতিই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর সেপাইটি আবার আমাদের কক্ষে ঢুকল। আমাদেরকে ঠিক ঐভাবে গালি দিয়ে সম্মানিত করল যেমন আগেরবার করেছিল। এবার তার ডান হাতে লোহার একটা লম্বা রডএবং বা হাতে এ্যালুমুনিয়ামের পুরানো একটা ডোংগা। ডোংগাটা কিনারা পর্যন্ত চা দিয়ে ভরা। লোহার রড দিয়ে সে অনেক বন্দীর মাথায় পিটিয়ে যখম করে দিল। পেটানোর সময় ডোংগা থেকে বেশ কিছু চা ছলকে মাটিতে পড়ে গেল। অবশিষ্ট যতটুকু ছিল, সে ব্যাপারে সে গর্ব ভরে ঘোষণা দিল ঃ

"ডোংগার মধ্যে যতটুকু চা আছে ৬নং ষ্টোরের পঞ্চাশজন বন্দীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক।"

এবার আমরা কেউই চা খেলাম না। সবাই অস্বীকার করে বসলাম। আমরা ব্যাপারটাকে আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্য বলেই মনে করছিলাম। যোহর পর্যন্ত চা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল।

রুবী যখন জানতে পারল, আমরা তার চা খাইনি, রাগে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠল। দৌড়ে ষ্টোরে ঢুকে আঁমাদেরকে বেদম পেটাতে লাগল। আমাদেরকে সেই নির্মম মার হজম করতে হল।

টয়লেটের দৃশ্য

তার চলে যাওয়ার পর আরেকজন সেপাই এলো, যে রুবীর চেয়েও বেশী কুৎসিত, আরো কর্কশ এবং গোয়াড়। সে নির্দেশ দিল সবাইকে টয়লেটের দিকে হাটতে, যেন আমরা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন সারতে পারি, হাতমুখ ধুইতে পারি এবং প্রস্রাবের বদলে ভাল পানি খেতে পারি। এ নির্দেশ পেয়ে আমরা মনে মনে অনেক খুশী হলাম। কিন্তু আমাদের এ আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। টয়লেট ছিল নীচের তলায়। সে দিকে আমরা দৌড়ালাম। রাস্তায় আমাদের ওপর অগণিত হান্টারের আঘাত পড়তে লাগল। হিংস্র কুকুর তার বিষাক্ত দাঁত গেড়ে আমাদের শরীরের মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। সবাইকে এক একটি পায়খানায় ঢুকিয়ে দেয়া হল। বাথরুমের অবস্থা শোচনীয়। কমোডের পুরো জায়গাটি পায়খানা-প্রস্রাব দিয়ে ভরে টইটই করছে। আরো যন্ত্রণা দেখুন, সেখানে এক ফোটা পানিরও ব্যবস্থা নেই। এখানেই শেষ না; বরং যখন আমি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে প্রাকৃতিক ক্রিয়া করছি, ঠিক তখন আচমকা একজন সেপাই লাথি মেরে দরজা খুলল এবং আমার ওপর আচ্ছামত হান্টার বর্ষন করতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি বুঝে ওঠতে পারলাম না, লোকটা আমার কাছে কি চায়! কৃষ্ণ বর্ণের চেহারা, গর্তের মধ্যে চোখ দুটো, তার দাঁত ও মাড়িতে ময়লা জমে মারাত্মক ধরনের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তার কুৎসিত চেহারায় শ্বেতী রোগের কারণে সাদা সাদা দাগ চকচক করছে। সে বিশ্রী মুখটা হা করে গর্জন করে উঠল ঃ

"ও কুত্তার বাচ্চা! বের হ।"

"বাবুজি! একটু থামুন!"

"অপদার্থ, কমিনা ... কুত্তা... তোর এত বড় সাহস, আমার সামনে কথা বলিস।"

এ বলেই সে তার ডাণ্ডা ভীষনভাবে আমার ওপর মারতে লাগল। আমি ওখান থেকে ওঠে ষ্টোরে ফিরে এলাম। সেই ডাণ্ডার মারাত্মক ক্ষতের চিহ্ন আজও পর্যন্ত আমার মুখ, কাঁধ ও পিঠে রয়ে গেছে। টয়লেটে গিয়ে আমার কোন ফায়দা হল না।

আমি অন্যান্য সাথীকে দেখলাম। তারাও দিশেহারা ইঁদুরের মত এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। জল্লাদ সেপাইরা জন্তুর মত তাদের পেছনে পেছনে তেড়ে

আসছে। এই নির্দয় পরিবেশে হয় হান্টারের ঠুস্‌ঠুস্‌ গর্জন শুনা যাচ্ছে, না হয় হিংস্র কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ।

হান্টারের আগুন প্রায় সব বন্দীর শরীরকে ভুনা করে দিয়েছে। আমি বন্দীদের জ্বলন্ত, নিস্তেজ শরীরগুলোর মাঝে পড়ে রইলাম। ক্ষোভ ও দুঃখ আমার প্রতিটি লোমকূপকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমি দেখলাম একজন বন্দীও টয়লেটে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে আসতে পারেনি। সবার চেহারায় ছেয়ে আছে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ও বিষন্নতা। এ সময় হঠাৎ এক বন্দী সহ্য করতে না পেরে আত্মভোলা লোকের মত কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল ঃ

"এটা অন্যায়, এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।"

এ কথা শুনে আরেক বন্দী, যিনি হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন এবং সাদা পরিপক্ক চুলগুলো বলে দিচ্ছে যে, তিনি একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক, বললেন ঃ

"আমরা সবাই জানি, এখানে অবিচার, অন্যায় হচ্ছে। এটা কারো অজানা নয়। দয়া করে আপনি নিজেকে সামলান। এ রকম আর কোন শব্দ মুখ থেকে বের করবেন না। আমরা কেউ জানি না, আজ আমাদের কোন্ সঙ্গী মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে।" তার এ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনে স্টোরের ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল। এ নিস্তব্ধতাকে যদি কেউ ভঙ্গ করছে, তাহলে সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে ভেসে আসা হান্টারের ভীতিকর শব্দ ও মজলুম বন্দীদের চাপা আহ্‌আহ্‌ আর্তনাদের শব্দ।

আমাদের প্রত্যেকেই গভীর চিন্তায় ডুবে আছি। তবে আমার মস্তিষ্কে একটা শব্দ বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। শব্দটা কেল্লার জেলের তদন্তকারী অফিসার তদন্ত করার মুহূর্তে আমার সামনে উচ্চারণ করেছিল। অর্থাৎ খানগাহ্‌-এর বাসিন্দা শেখ শা'বান। হে শাবান! তুমি কোথায়? তোমারই কারণে সামনে আমার জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে। তোমার ব্যাপারে এরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে অথচ আমি তোমাকে চিনি না। তোমাকে না চেনার কারণে মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

শাবান! লাঠি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে মৃত্যু খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। শাবান! হতে পারে, এ মুহূর্তে তোমার ওপরও হান্টারের আঘাত পড়ছে। কিন্তু, কে তুমি? আর কোথায় অবস্থান করছ হে খানগাহ্‌-এর শেখ শাবান!"

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে চাপা কণ্ঠে ষ্টোরে বন্দী ভাইদের কাছে জিজ্ঞেস করে বসলাম ঃ

"ভাইয়েরা আমার! আপনাদের কেউ কি খানগাহ-এর শেখ শাবানকে জানেন?"

জনৈক ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল ঃ

"প্রিয় ভাই! আমি খানগাহ-এর লোক। আমার জানা মতে শাবান নামের কোন লোক ওখানে থাকে না। তবে ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ হয়ত এ নামে পরিচিত। তিনি ওখানকার একটি ডিস্‌পেন্সারীতে পিয়নের চাকুরী করেন।"

আমি এ বন্দীর আরো কাছে এগিয়ে গেলাম এবং অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"সেই ডিসপেন্সারীর শাবানের সাথে আপনার কি কোন পরিচয় বা সম্পর্ক আছে?"

"আমার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। তিনি হলেন একজন অশিক্ষিত লোক। রাজনৈতিক কথাবার্তা তার বোধগম্যের বাইরে।"

"ইখ্‌ওয়ানের সাথে কি তার কোন সম্পর্ক আছে?"

"অবশ্যই না।"

"আপনি কিভাবে জানেন, ইখ্‌ওয়ানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই?"

সেপাইরা শুনে ফেলে এ ভয়ে তিনি মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ

"দেখুন! আমি একজন ইখ্‌ওয়ানের লোক। বিশ্বাস করুন। পুরো এলাকায় শেখ শাবান নামে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন-এর কোন লোক নেই।

আমি আবার খুবই অনুনয় বিনয় করে ব্যথা ভরা কণ্ঠে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) দোহাই দিয়ে বললাম ঃ

"প্রিয় ভাই! মেহেরবানী করে আমাকে কিছু বলুন!"

"আপনি কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন?"

"শাবান সম্পর্কে আমাকে কিছু ধারণা দিন।"

"সেই শাবান সম্পর্কে কি ধারণা দেব যিনি ডিসপেন্সারীর পিয়ন?"

"জি, তার সম্পর্কেই বলুন।"

"তার ব্যাপারে কি জন্য জানতে চাচ্ছেন?"

"জেলের জল্লাদরা তার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অথচ আমি এ লোকটিকে মোটেও চিনি না, জানি না।"

অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে তিনি এ ব্যাপারে ইতি টেনে বলতে লাগলেন ঃ

"আমরা সবাই এক মহা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি। আমি আপনাকে বলে দিয়েছি, ডিসপেন্সারীর সেই নিরীহ শাবান দুনিয়ার ব্যাপারে কোনই খবর রাখে না। এমনও হতে পারে তিনি খানগাহ-এর বাইরে কখনো পা-ই দেননি। রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার তো দূরে থাক, তিনি হয়ত এটাও জানেন না, মিশরের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি। আপনাকে যে শাবানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তিনি অবশ্যই খানগাহ-এর সেই শাবান নন। আপনি এ নিরীহ লোকটির ব্যাপারে বেশী ভাববেন না। হতে পারে এতে তিনি কোন মুসিবতে ফেঁসে যাবেন। আর আমাকেও এ ব্যাপারে আপনি জড়াবেন না।"

"কিন্তু ...।"

তিনি কথা কেটে বললেন ঃ

"মেহেরবানী করে চুপ করুন। যতটুকু বলেছি, এরচেয়ে বেশী আমার পক্ষে আর কিছু বলার নেই।"

এরপর তিনি সেই আগের মত বিরান জগতের দিকে ফিরে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। ভয়, আতংক, বিষন্নতা ও দুর্ভাবনা আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। আমি অনেক চেষ্টা করলাম, তার কাছ থেকে শাবানের ব্যাপারে আরো কিছু কথা বের করতে, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমার অচঞ্চল বিরান চোখের কোণ্ দিয়ে বিভিন্ন সঙ্গীর চেহারা পড়তে লাগলাম এবং অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পরখ করতে লাগলাম। মনে হল, সীমাহীন বেদনা ও শোক তাদের চেহারাগুলোকে এমনভাবে চিবাচ্ছে, যেমন জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা তাদের শিকারকে চিবিয়ে খায়। বিবর্ণ ফ্যাকাশে চেহারা। পেরেশান ও বিষন্নতায় নিমজ্জিত চোখ, যাদের শরীরে ঘন রক্তের সাথে মাটি লেগে চাপড়া ধরেছে। এখনো অনেকের চেহারায় টাটকা খুন লেগে আছে, যা কপোল থেকে নেমে গাল বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু বন্দীরা এসবের প্রতি কোনই খেয়াল করে না। এটা যেন একটা মামুলী ব্যাপার। তারা একেবারে বিমূঢ়। কি বিরল দৃশ্য! চেহারা ও কাপড় দিয়ে রক্তধারা বইছে। সেই স্রোতধারা কেউ থামাচ্ছে না। থামানোর কোন কায়দাও নেই। তবে যখন রক্তের স্রোত চোখে ঢুকছে, তখন আঙ্গুলের সাহায্যে তারা তা পুছে নিচ্ছে। আমি এক একটা চেহারার প্রতি নজর বুলালাম। সব

চেহারাই উদাস, ধুলো-ধুসরিত এবং রক্তাক্ত। একটাকে আরেকটা থেকে পার্থক্য করার কোন আলামত অবশিষ্ট নেই। অবশেষে একটি বিশেষ চেহারার প্রতি আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এ লোকটা সূর্যোদয়ের কিছু আগে এখানে এসেছে। না জানি কেন সেই আবছা অন্ধকারের ভিতরই আমার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল। যখন দিনের আলো সব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, আমি সেই নবাগতকে পরিষ্কারভাবে দেখলাম। কিছুক্ষণ আগে কিছু সময়ের জন্য আমার মনটা সেই জেনারেলের শাহাদাত নিয়ে এমনভাবে বিভোর ছিল যে, অন্য কোন কিছুর খেয়ালই ছিল না। কিন্তু এখন যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হল, তখন এ লোকটাকে গভীরভাবে দেখার সযোগ পেলাম।

আতেফ ও নাবিলার হৃদয়বিদারক কাহিনী

নবাগত লোকটা খুবই সুদর্শন ও মসৃন দেহের অধিকারী। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তার ঠোঁটে নিভু নিভু স্মিত হাসি লেগে আছে। অন্য অর্থে এমন হাসি যেন মোমবাতি তার শেষ প্রহর গুনছে। নিভু নিভু আলো। নিভে যাবার উপক্রম। সে খুবই দামী ও সুরুচিপূর্ণ পোশাক পরে আছে। দাড়ি, গোঁফ কোনটাই নেই। সব পরিষ্কার। একটা অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে সে তার ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে কিছু খেলার চেষ্টা করছে। এরপর সে তার দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করে রাখছে। সে চেষ্টা করছে, তার মুচকি হাসি যেন ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই মুচকি হাসিতে একটা উদাস ভাব। মনে হয় হাসি মুছে যাবে। আমি অনিচ্ছাসত্বেও চেহারাগুলো বারবার দেখছিলাম। কিন্তু এ লোকটার মুখের দিকে তাকালে আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। আমি তার দিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি। লোকটিও ব্যাপারটি টের পেয়ে যায় । আমি মনে মনে ভাবছি, আমি কি এ লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছি? কোথায় দেখেছি? কবে দেখেছি? খানিক পর লোকটির কি পরিণাম হবে! আমারই বা পরিণাম কি হবে! আমরা সকলে ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছি।

আমাদের সকলেই মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে। এখানে আমরা সবাই একটি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছি। আর তা হচ্ছে মৃত্যু অনিবার্য। সবাই আমরা মৃত্যুর প্রহর গুনছি। সেই সুদর্শন যুবকটি আমার কাছে এলো। সে আগেও

আমার থেকে তিন-চার ফুট দূরে ছিল না। সে খুবই ধীরস্থিরভাবে গাম্ভির্যের সাথে আমার কানে কানে বলতে লাগল ঃ

"আমি আপনাকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানাতে চাই।"

এ শুনে ভয়ে আমার কান দুটো খাড়া হয়ে গেল। সে অবশেষে কোন্ অসাধারণ বিষয় সম্পর্কে আমাকে জানাতে চাচ্ছে। আমি নিজেকে নতুন অজানা বিপদ থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তাকে বললাম ঃ

"আমি আপনাকে চিনি না। আগে কখনো আপনাকে দেখিনি।"

আমার উত্তর শুনে সে হেসে ফেলল। আমার কথা সে মোটেও গুরুত্ব দিল না। আমার মনে হল, তার হাসির মধ্যে সজীবতা ফিরে এসেছে। কিন্তু পরে আমি বুঝলাম, তার হাসির মধ্যে কোন সজীবতা ছিল না; এটা আমার ভুল ধারণা। সে বলল ঃ

"আমার নাম আতেফ। আমি মিশর ব্যাংকে চাকুরী করি।"

"ভাই! আপনাকে আমি চিনি না। আপনার নাম শুনেও মনে পড়ছে না, এ ধরনের নামের কোন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কিংবা পরিচয় হয়েছে।"

"আপনি মেহেরবানী করে আপনার কণ্ঠটা উঁচু করবেন না এবং আমি যা বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।"

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ হয়ত কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার। তার ধারণা মতে আমি তাকে কোন সাহায্য করতে পারি। মনের ওপর পাথর বেঁধে অবশেষে আমি তার কথা শুনার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে মনে বড় সাহস নিয়ে আমার দিকে মনোনিবেশ করল। তার দুঃখ ও ব্যথাভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম ঃ

"আপনি কি চান? আমি হাজির। যদি আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারতাম তাহলে খুশী হতাম।"

সে বলল ঃ

"আচ্ছা ভাই! আপনি কি বাস্তবেই আমাকে চেনেন না?"

"অবশ্যই না।"

"আপনি কিছুটা আপনার স্মরণশক্তির ওপর জোর লাগান। আপনার চেহারা আমার কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে না। আমার মন বলছে, আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি।"

"আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এর আগে আপনাকে দেখিনি।"

"তাহলে আপনার চেহারা আমার কাছে কেন পরিচিত মনে হচ্ছে?"

"আমি জানি না।"

"আপনি কি গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন?"

"অবশ্যই, কিন্তু এটাই কি ভালো নয় যে, আপনার গোপন কথা আপনি আপনার কাছেই লুকিয়ে রাখুন। হয়ত ...।"

"হয়ত? হয়ত আবার কি? প্রতিটি মানুষ কি রহস্য লুকিয়ে রাখতে পারে?"

"শর্ত হল, সে মানুষটাকে ডাণ্ডার চেয়েও শক্ত ও মজবুত হতে হবে।"

"ডাণ্ডা কি মানুষের চেয়ে মজবুত হয়?"

"হয়ত হয়।"

"যাহোক, আমার কোন পরোয়া নেই। আমি আপনার কাছে আমার গুপ্ত কথা বলেই ছাড়ব।"

"আমি আপনাকে ধৈর্য ধারনেরই পরামর্শ দেব।"

"রাখুন একথা। এখন আমার কথা শুনুন।"

"আপনি কেন একমাত্র আমার কাছেই আপনার গোপন কথা বলতে চাচ্ছেন? আরো তো লোক আছে এখানে।"

"যেহেতু আপনার মুখখানা আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে।"

"আপনার কি ভয় হয় না যে, আপনার অনুমান ভুলও হতে পারে।"

"আমি এটা নিয়ে মোটেও ভাবছি না। আমার কোন পরোয়া নেই।"

"আমার মধ্যে আপনি আগ্রহ সৃষ্টি করছেন।"

"হতে পারে এটা এ জন্য যে, আমরা দুজন বন্ধু।"

"অতীতে তো আমরা কোন সময় বন্ধু ছিলাম না।"

"আমার আগ্রহ এখন আমরা বন্ধুত্ব তৈরী করি।"

"আপনি আসলে আমার সাথে ইয়ার্কি শুরু করে দিয়েছেন।"

"নিশ্চয়ই না। আমি যা বলছি, বুঝে শুনে বলছি।"

এ কথা শুনে এ আজব যুবকটার জন্য আমার ঠোটে আপনাআপনি একটা বিদ্রূপাত্মক মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এ অবস্থার মধ্যে কেন সে আমার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাচ্ছে। হয়ত আসন্ন বিপদের অনুভূতি তাকে এ জন্য বাধ্য করছে। সে কোন একটা উপায় সন্ধান করছে। হয়ত বা অন্য কোন কারণ

থাকতে পারে।

তার আকর্ষণীয় চেহারা বেদনা ও বিষন্নতায় ডুবে যাচ্ছে। তার উজ্জ্বল চোখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। এদিক-ওদিক বিস্ফারিত দৃষ্টি চরম বেদনার ইঙ্গিত বহন করছে।

সে আবার ঈষৎ হাসি হাসল। আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভরা এ হাসি আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমারও হাসি পেল। আমি বললাম ঃ

"আপনার কথা আমি গ্রহণ করে নিলাম। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আজ থেকে উভয়ে আমরা বন্ধু। আমার নাম ...।"

সে কথা কেটে বলল ঃ

"হ্যাঁ, আমি আমার গোপন কথা তো বলতে ভুলেই গেছি।"

"সেই গোপন কথাটি কি?"

"সেই রহস্য যে সম্পর্কে আমি কিছুক্ষণ আগে ইঙ্গিতও করেছি।

"ঠিক আছে। আমার শুনতে কোন আপত্তি নেই। আপনি বলুন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনব।"

সে পূর্ণ সতর্কতার সাথে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। ব্যাপারটা যে সিরিয়াস তার চেহারা থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে বলতে লাগল ঃ

"বিষয়টা নাবিলাকে ঘিরে।"

"নাবিলা?"

"হ্যাঁ।"

"কোন নাবিলা?"

"ধৈর্য ধরুন। আমি প্রতিটা ব্যাপার আপনাকে খুলে বলছি।"

আমার ভিতর নতুন করে ভয় ঢুকে গেল। এখন যে সামান্য আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে ভাবটা নষ্ট হওয়ার উপক্রম। কারণ এখানে আমি কোন মেয়ের কথা শুনতে চাচ্ছিলাম না। কারণ, অবস্থা এমন ভয়াবহ ছিল যে, এদিকে ঠোঁটে কোন মানুষের নাম বের হত, আর ওদিকে চোখের পলকে তাকে গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে আসা হত। চাই, সে মানুষটি ইফ্রিতই হোক না কেন। কিন্তু আতেফ আমার মানসিক অবস্থার প্রতি কোন দৃষ্টিই দিল না। সে কিছু বলতে আগ্রহী। সে খুবই বেদনাভরা কণ্ঠে বলল ঃ

"আমার ওর সঙ্গে খুবই ভালবাসার সম্পর্ক। ওও আমাকে অত্যন্ত

ভালবাসে।"

আমার ভিতরও কিছুটা রসিকতার ভাব জন্ম নিল। আমি বললাম ঃ

"তাহলে কি আপনি এখানে আপনার ইশ্‌ক ও মহব্বত, প্রেম ও ভালবাসার কাহিনী শুনাতে চাচ্ছেন?

সে খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল এবং বলল ঃ

"জি, আমার ইশ্‌কের কাহিনীই শুনাতে চাচ্ছি। এতে দোষের কি আছে?"

আমি বললাম ঃ

"কথা তো দোষের না। তবে এ জায়গাটা এ ধরনের ঘটনা বলার জন্য উপযুক্ত না।"

সে বলল ঃ

"আমি তো সম্পূর্ণ উপযুক্ত জায়গাই মনে করছি।"

আমি তার চেহারাটাকে গভীরভাবে পড়লাম। এ অসহায় ছেলেটা পাগল হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা সে সময় অনুভব করতে পারলাম, যখন গভীর দৃষ্টিতে আমি তার দিকে তাকালাম। আমার মনে ভীষণ ঝাঁকি লাগল। মনে হল, আমার হৃদয়টা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তার অবস্থা ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। যে অবস্থায় তাকে জেলে আনা হয়েছে তাতে সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। আমি চরম বিস্মিত। ভাবলাম, এর জন্য কি করতে পারি। কিছু করা সম্ভব না। ইতোমধ্যে হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল। ডুকরে ডুকরে সে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই তার মুখ থেকে যেসব কথা বের হল তা নিম্নরূপ ঃ

"ওকে তারা জোর করে উঠিয়ে নিল। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে, হাত জোড় করে কতই না বললাম ওকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করল না। ও খুবই ভাল ও সরল মেয়ে।"

তার ব্যথা ভরা কথা আমার অনুভূতিকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত আহত হয়ে গেলাম। আমি হঠাৎ করে তার কথা কেটে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"আপনি কার ব্যাপারে বলছেন?"

"নাবিলার ব্যাপারে। কাল আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ে পড়ানোর হুজুরও এসে গিয়েছিলেন ... কিন্তু ...।"

"কিন্তু কি?"

"আমাকে এবং ওকেও তারা গ্রেপ্তার করল। ওকে তারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।"

"কারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল?"

"মিলিটারী গোয়েন্দার লোকেরা।"

"বিয়ে অনুষ্ঠানের সময়?"

"জি, তবে এখনো বিয়ে পড়ানো হয়নি।"

"কেন নিয়ে গেল?"

"কারণ জানি না।"

"মনে হয় আপনাদের দুজনের ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন দলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।"

"আমি এবং ও মুসলমান। ইসলামকে ভালবাসি। ব্যস্, এটাই আমাদের অপরাধ।"

"এটা লাল জাহেলিয়াত (কমিউনিজম)এর যুগ।

গোয়েন্দার লোকেরা মুসলমানদেরকে অন্য কথায় ইসলাম প্রেমিক লোকদেরকে বেছে বেছে ধরছে।"

"কাকে খুশী করার জন্য এসব করছে?"

"রাশিয়া, আমেরিকা ও ইহুদীদেরকে।"

"ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট করাও কি তাদের লক্ষ্য?"

"অবশ্যই।"

"আমরা কি ইহুদীদের দুশমন না? আমাদের সাথে কি তাদের সংঘাত চলছে না?"

আমাদের ফিসফিস শুনে এক বুড়ো কমযোর কয়েদী আমাদের কাছে এলো। তার কপালের সিজদার চিহ্নের কাছ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"ওপরে ওপরে আমরা ঠিকই ইহুদীদের শত্রু। কিন্তু বাস্তবে আমরা তাদের বিশ্বস্ত ও একান্ত অনুগত সেবক।"

আমি বললাম ঃ

"আমরা বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন?"

বৃদ্ধ বললেন ঃ

"মিলিটারী গোয়েন্দার লোক, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের সবার লীডার জামাল আব্দুন নাসের। লানাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন (এদের সবার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক)।"

লেখক ঃ

"আপনি তো মারাত্মক বিপদজনক কথা বলছেন।"

বুড়ো কয়েদী ঃ

"আমি সত্য বলছি। রাষ্ট্রপ্রধান ও তার চেলাচামুণ্ডাদের এ ধরনের আচরণে মিশরের ইসলামী মিল্লাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখবেন, এ জাতি আগামীতে যুদ্ধে লড়তে পারবে না।"

লেখক ঃ

"কোন যুদ্ধের কথা বলছেন?"

বৃদ্ধ কয়েদী ঃ

"এ ধরপাকড় যখনই শেষ হবে, আমাদের দেশের সাথে ইসরাইলের আরেকটি নতুন যুদ্ধ বাঁধবে। কিন্তু সে যুদ্ধে ইসরাইলের হাতে আমাদের অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হবে। এ পরাজয় আমাদের বুনিয়াদকে একেবারে দুর্বল দেবে।"

লেখক ঃ

"আল্লাহর কসম! আপনি একটা আশ্চর্য ধরনের কথা বললেন।"

বৃদ্ধ ঃ

"আগামী দিনগুলো আপনার জন্য এমন সংবাদ বয়ে আনবে যা এখন আপনার বোধগম্য হচ্ছে না।"

আতেফ বেচারা আমাদের কাছে চুপচাপ বসে রইল। আমাদের বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা হয়ত তার বুঝে আসছে না। সে নিজের জগতেই মগ্ন থেকে বিড়বিড় করছে। তার মুখ থেকে বার বার এ শব্দগুলো বের হচ্ছে, আর তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে, "আমরা যখন এখানে এলাম, তখন নাবিলাকে তারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। তারা বলল, আমাদেরকে জেলখানায় রাখা হবে। ইন্সপেক্টর আমার হাত থেকে বিয়ের আংটিও ছিনিয়ে নিল।"

বুড়ো বললেন ঃ

"আংটাটা কি স্বর্ণের ছিল?"

আতেফ বলল ঃ

"জি, স্বর্ণের ছিল।

বুড়ো বললেন ঃ

"আপনি কি জানেন না, স্বর্ণ পুরুষের জন্য হারাম?"

আতেফ খামোশ রইল। এভাবে আমাদের সবাই যার যার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। আমার একটাই ভাবনা, খানগাহ-এর শাবান। শাবান কে লোকটি? কোথায় তার বাড়ী? আতেফের করুন কাহিনী যদিও আমাকে সমভাবে ব্যথিত করছে, কিন্তু তবু হঠাৎ সেই শাবানের কথা মনে পড়ায় আমার চিন্তাধারার দিক পাল্টে গেল। আর অন্য দিকে বৃদ্ধ কয়েদী এ চিন্তায় বিভোর যে, ইহুদীরা শীঘ্রই আমাদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে।

জুলুমের শেষ কোথায়?

ষ্টোরে সামগ্রিকভাবে নীরবতা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে কেউ জোরে দরজাটা খুলল। নীরবতা খানখান হয়ে গেল। একজন বেপরোয়া সেপাই ভিতরে ঢুকল। তার হাতে একটি ক্ষুর—যা সাধারণত নাপিতরা ব্যবহার করে। সে এমন ভঙ্গিতে ক্ষুরটা ধরে রেখেছে যা দেখলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তার মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে, সে এই চকচকে ধারাল ক্ষুর দিয়ে মানুষের গলা কাটতে চাচ্ছে। সে চেঁচাতে লাগল ঃ

"ঐ কমবখ্ত, কুত্তার বাচ্চা! ও হারাম যাদারা! এখন তোদের নোংড়া মাথা কামানো হবে। আব্দুন নবী তোদের সঙ্গে কথা বলছে। আমি হচ্ছি আছত্ব আব্দুন নাবী (সে এমন ভাবে বলছে, যেন সে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।) আমি হচ্ছি সাবেক হাজ্জাম (নাপিত)। আর এখন একজন সেনা অফিসার। আমি তোদের মাথা মুণ্ডিয়ে দেব। আমার কথা বুঝে আসছে তো। কোন পরিশ্রম, টাকা ছাড়াই তোরা অনেক সম্মান লাভ করবি। এদিকে আয়।"

এই বলে সে আমাদের একজনকে নির্বাচন করল। তার অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং চকচকে ধারাল ক্ষুরের প্রদর্শনীতে আমাদের সবার হুঁশ চলে যাবার উপক্রম। যাকে সে সবার আগে মাথা কামানোর জন্য ডেকে নিল,

তাকে সামনে আসার ইংগিত করল। সেই বদনসীব তার কাছে এসে অসহায়ের মত বসে গেল।

তার চোখ দুটো পাথরের মত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তার মুখে সুন্নতী দাড়ি। নূরানী চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে, অবশ্যই কোন আলেমে দ্বীন হবেন। আছত্বা আব্দুন নাবীর দাবী হল, সে বিশ্বের সেরা একজন হাজ্জাম (নাপিত)। সে ক্ষুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অগ্রসর হল এবং এমনভাবে তেড়ে আসল, যেন সে বন্দীর চুল কাটতে যাচ্ছে না। তাকে ফেড়ে ফেলতে চায়। সে বিরামহীন থাপ্পড়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং বিভিন্ন উপহাসের মধ্য দিয়ে সেই দাড়িওয়ালা ব্যক্তির হাজামাত (ক্ষৌরকার্য) করল। এটাকে হাজামাত তো বলা যায় না, মানে একটা কৌতুক। সেই বুজুর্গ লোকটার অর্ধেক দাড়ি এবং অর্ধেক মোঁচ চেঁছে দিল। আর শেষে মাথার মধ্যে চেপে ধরে খুব জোরে ক্ষুর চালিয়ে দিল। বন্দীর মুখ থেকে তীব্র চিৎকার বেরিয়ে এলো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আতংক, লাঞ্ছনা ও ব্যথায় তিনি সংবিৎ হারিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লেন।

আব্দুন নবীর ক্ষৌর অভিযান আড়াই ঘন্টার মত চলতে থাকল। অসহায় বন্দীরা তার ক্ষুর চালনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চিৎকার করছিল। চাপা কণ্ঠে আহ্‌আহ্ করছিল। জেলের বাইরে কুকুর খেউ খেউ করছে। আর এদিকে আব্দুন নবীর ধারাল ক্ষুর অসহায় মানুষের রক্তে গোসল করছে। সেপাইরা পাগলের মত হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছে। তাদের অট্টহাসি মজলুম মানুষের চিৎকার ও বিলাপের শব্দকেও হার মানাচ্ছে। জেলের আঙ্গিনায় হিংস্রকুকুরদের ভয়ঙ্কর খেউখেউ শব্দ শুনা যাচ্ছে। অবশেষে হাজামাতের জন্য আমার পালা এসে গেল। আমার ভাগ্যে একটা গভীর যখম জুটল যা কপালের উপরের অংশে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

রক্তাক্ত নাটকটি অবশেষে শেষ হল। আছত্বা আব্দুন নবী উৎফুল্ল চিত্তে নাচতে নাচতে চলে গেল। যাওয়ার আগে সে কতগুলি অশ্লীল গালি ছুড়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, সে দিন তার মুখ থেকে এমন এমন জঘন্য গালি শুনলাম যা আমার জীবনে আজ পর্যন্ত কখনো শুনিনি। আব্দুন নবী চলে গেলে আমরা আমাদের যখমগুলোতে পট্টি বাঁধার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। এখানে

কোন পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা আমাদের পরনের কাপড় ছিঁড়ে রক্তের ফোয়ারা বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম।

জিহ্বা দিয়ে জেলখানার সিঁড়িতে ঝাড়ুদান

আমার মনে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেপাই ষ্টোরে আরেকজন বন্দীকে ছুঁড়ে ফেলে যায়।

তাকে তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তদন্তকাজ শেষ হওয়ার পর তাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। দুদিন আগে এ মজলুম লোকটির ওপর নেহায়েত অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় এবং মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে ফেলে রাখা হয়। তার যখমে পঁচন ধরে এবং ভিতরে পুঁজ সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে বের হতে থাকে ভীষন দূর্গন্ধ। যে কারণে তাকে ভিতরে নিক্ষেপ করা মাত্র পুরো ষ্টোরে দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। লোকটা বস্তার মত আমাদের মাঝে পড়ে রইল। একটি মুহূর্তের জন্য ও তার বিলাপ থামছে না। সে বলছে ঃ

"ভাইয়েরা আমার! আমার পা, ভাইয়েরা আমার! আমাকে বাঁচান। আগুন আগুন, হায়, আগুন। মানুষ! হায়, আমি মরে যাচ্ছি। আপনাদের ভিতর কি কেউ মুসলমান নেই, নেই আল্লাহকে ভয় করার কেউ? খোদার কসম! আমি ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন সম্পর্কে কিছুই জানি না। রাজনীতির ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষন হোক।

ভাইয়েরা! আমি একজন গাড়ী চালক। ইখ্ওয়ানরা কি ধরনের মানুষ আমাকে বলে দিন। ইখ্ওয়ানরা কি জিনিস। ভাইয়েরা! আমার পায়ের আগুন নিভিয়ে দিন।"

তার বাম পা পুঁজ দিয়ে ভরে গেছে। এ কারণেই সে পুড়ে যাচ্ছিল। আমরা এ বেচারাকে কি সাহায্য করতে পারি! এ দোয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই, হে রহমানুর রাহীম! তোমার এ বান্দাকে সমস্ত ব্যথা থেকে মুক্তি দান কর। যখন তার ব্যথা আরো বেড়ে গেল এবং তার কাতরানো আরো উঁচু হতে লাগল এবং এক পর্যায়ে সেটা সীমার বাইরে চলে যেতে লাগল, তখন আমাদের একজনের রক্ত টগবগ করে উঠল। সে একদম ওঠে দাঁড়াল এবং জোরে জোরে দরজায় আঘাত করল। আওয়াজ পেয়ে একজন প্রহরী এলো।

তাকে দেখে আমার দেহের খুন শুকিয়ে গেল। আমার ধারণা, সবারই রক্ত শুকিয়ে গেছে। আমাদের সেই সঙ্গীকে আমরা ফিরিয়ে রাখতে পারিনি। কারণ সে তার কাজটি খুবই তড়িতগতিতে করেছে। মোটকথা, যার আশংকা আমরা করছিলাম তা বাস্তব হল। দরজা খুলে ইবলীস প্রকৃতির আরো তিনজন সৈনিক ভিতরে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে শক্ত লাঠি। তারা যেন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, কোন একটা বাহানা পেলেই তাদের অভিযান তারা শুরু করবে।

এদের লীডার–যে এদের সবার চেয়ে বেশী গোঁয়াড় ও বদমেজাজ, গলা ফেড়ে বলল ঃ

"এই কুত্তার বাচ্চারা! তোরা তো ফাঁদে আটকা পড়ে গেছিস। তোদের এ ভুলেরই অপেক্ষায় ছিলাম। এখন মজাটা দেখ। জ্বলদি সবাই বের হ।"

জল্লাদ সেপাইরা আমাদেরকে এক সারিতে কাছে কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু আহত লোকটা বাইরে এলো না, যার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়েই আরেক বন্দী সবার জন্য এ নতুন বিপদ ডেকে এনেছে। লোকটা দাঁড়াতেও পারছে না। সেপাইদের লীডার ষ্টোরের ভিতরই তার পায়ের ওপর লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে তাকে আটার খামিরের মত বানিয়ে ফেলল। তার একটি পাজরও ভেঙ্গে গেল। আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার তারা করল, আমাদের কাছে সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। তারা আমাদেরকে জেলের আঙ্গিনা হাতের তালু দিয়ে পরিষ্কার করতে বাধ্য করল। আঙ্গিনার এখানে সেখানে ভাঙ্গা কাঁচ পড়ে আছে। তালু দিয়ে ঝাড়ু দিতে গিয়ে তাতে কাঁচের টুকরো বিঁধে যাচ্ছিল। তালু রক্তাক্ত হয়ে গেল। এতেই কি ক্ষান্ত ছিল? তারা আমাদের ওপর লাঠি, লাথি, ঘুষি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করছিল। সবশেষে জেলের কয়েকটি সিঁড়ি জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে বাধ্য করল। এটাও আমরা করলাম। কিন্তু সাথে সাথে ডাণ্ডা ও লাঠির আঘাতও পড়ছে এবং কুকুর দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাংসও ছেড়া হচ্ছে। এ সব শাস্তি ভোগান্তির পর আবার আমাদেরকে ষ্টোরে বন্ধ করে রাখা হল। আমার জিহ্বা ভাঙ্গা কাঁচ, কাঁটা ও চোখা ধারাল জিনিসের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। আমাদের অনেক সঙ্গীর জিহ্বা তো এখন পর্যন্ত ফুলে আছে।

যে লোকটাকে আমরা আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, পুঁজ আর ব্যথায় চিৎকার করতে দেখে গেছি, ফিরে এসে তাকে আশ্চর্য এক কাণ্ড করতে দেখতে

পেলাম। সে পায়খানা করে তা নিজের ফোলা পায়ে লাগাচ্ছিল। এভাবে সে নিজের ব্যথা লাঘব করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে তার মধ্যে পাগলামী দেখা দিল। সে তার বর্জ্য খেতে শুরু করল এবং জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এবং পাগলামী থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এ বেচারার কি দোষ! এখানে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা) মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করা হচ্ছিল যে, যদি এই আচরণ অন্য কোন প্রাণীর সাথে করা হত, তাহলে তারা সহ্য করতে পারত না। এখানে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটছে। মানবতা ও ইনসানিয়্যাত চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে।

এ বন্দীর অবস্থা দেখে আমার চোখ পানিতে ভরে গেল। আমার গাল বেয়ে চোখের পানি পড়তে লাগল। আমার বুকটা খানখান হয়ে যাচ্ছে। এই মজলুম মানুষটার চরম কাতর অবস্থা দেখেও আমাদের কেউ এটা ভাবল না, সাহায্যের জন্য কোন সেপাইকে ডাকা উচিত! সারাটা দিন সে চিৎকার করছে, কত জিনিসকে ডাকছে। যখন রাতের আঁধার সব কিছুকে ঢেকে নিয়েছে এবং নাইট গার্ডরা তাদের ডিউটি শুরু করেছে, তখন লোকটা জোরে জোরে তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে ডাকতে লাগল। প্রহরারত সেপাইদের কাছে কাকুতি মিনতি করে আবেদন করল তাকে ক্ষমা করে দিতে। তার সে অপরাধ, যে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না মার্জনা করে দিতে। সেই আপীল করার মুহূর্তেই তার শরীরে প্রচণ্ড কম্পন দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা সম্পূর্ণ থেমে এল। তার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল। লোকটা মারা গেল। আল্লাহ তার ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করুন। আমীন।

সকাল বেলায় যখন আমরা তার চেহারা দেখলাম, তখন সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, তার চেহারা নূরে ঝলমল করছে। সমস্ত চিন্তা, ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি পেয়ে সে চিরশান্তির নীড়ে চলে গেছে। নিঃসন্দেহে মহান রাব্বুল আলামীন তাকে তার অজস্র রহমত ও মাগফেরাতের ছায়ায় ঢেকে নিয়েছেন।

রাতে যখন সে মারা গেল এবং ষ্টোরের লোকেরা সেটা জানতে পেল তখন বন্দীদের একজন ভাবাবেগে ভেঙ্গে পড়ল। সে কান্না জুড়ে দিল খুব চাপাকণ্ঠে। এরপর আর কি! পুরো ষ্টোরের লোকজন হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে শুরু করল এবং সবাই তার মাগফেরাতের জন্য দোয়াও করতে লাগল। ঐ

বেচারা পায়খানা-প্রস্রাবের মধ্যে পড়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে। তার চেহারায় স্নিগ্ধতা, প্রশান্তি ও ঈমানী হাসিতে উদ্ভাসিত। সামরিক জেলে এটা আমার দ্বিতীয় রাত যাতে ক্ষণিকের জন্যও আমি ঘুমোতে পারিনি। যদি সেই চারদিনও যোগ করি যেটা আবু যাবাল জেলপ্রাঙ্গণে নির্যাতন শিবিরে কাটিয়েছি, তাহলে সর্বমোট আমার অনিদ্রা হচ্ছে ছয়দিন। দৃশ্যত আমরা সবাই ভুলেই গিয়েছিলাম যে, মানব জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঘুম বা নিদ্রা। আজ রাতে প্রবল তৃষ্ণার কারণে আমার অন্তর ও বুক আগুনের মত জ্বলছে। আমি পিপাসায় পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত কুলাতে না পেরে রবারের যে পটে আমরা প্রস্রাব জমা করে রেখেছিলাম, তার বেশীর ভাগই পান করতে বাধ্য হলাম।

দিন হল। কয়েকজন সেপাই ডিউটিতে এলো। তারা আমাদের সাথে এখন আবার সেই একই ধরনের ব্যবহার করবে যেমনটি কাল সকালে করেছিল। তাদেরকে দেখে আমাদের এক সঙ্গী মরণাপন্ন লোকের মত করে বলল ঃ

"চৌধুরী জী! এখানে একজন লোক মরে গেছে।"

এ বলে সে মুর্দা লাশের দিকে ইংগিত করল। শুনে সেপাইটির চেহারায় একটা ঘৃণ্য হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে বলল ঃ

"ঐ কুত্তার বাচ্চা! মাত্র একজন মরল? আমরা ব্রিগেডিয়ার (শামস্ বাদরান) সাহেবকে কি জবাব দেব? তাকে মুখ দেখাব কিভাবে?"

আমি ভাবতে লাগলাম, সেপাই যে ব্রিগেডিয়ারের কথা বলল, সে কেমন মাখলুক? সে কি মানুষ না? একটা মর্মান্তিক মৃত্যু তার মধ্যে কি কোন ধরনের ভাবান্তর সৃষ্টি করবে না? এরপর দুজন সেপাই এসে লাশ ওঠাল। দুজন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে, বিদ্রূপ করছে। তারা মুর্দাকে এমনভাবে ওঠাচ্ছে যেন সে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। মোটকথা সেই নিরীহ লোকটা আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। আমরা তার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলাম না, লোকটা কে? কোন মা তাকে জন্ম দিয়েছে। আমরা তো শুধু তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা জানতে পারলাম–এদেরকে সে মৃত্যুর আগে শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত ডাকছিল। নিরীহ মানুষটা বিদায় নিল। সে জীবনের কন্টকপূর্ণ পথ অতিক্রম করে নিজের সেই রবের কাছে পৌঁছে গেছে যেখানে তার সাথে ইনসাফের আচরণ করা হবে, যেখানে রহমত, শান্তি ও আরাম তার নসীবে জুটবে।

আজ আমার মস্তিষ্কে বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন খেয়াল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠছে। জীবন কি? মৃত্যু কোন্ বস্তুর নাম? অন্যায় কি? ন্যায় ও ইনসাফ কি? সম্মান ও লাঞ্চনা কি? ভালবাসা কাকে বলে? শত্রুতা কি? ক্ষুধা কি? ভয় কি? এ সব কি শুধু শব্দের মারপ্যাচ? আমি কে? আমি তো শুধু একটা শব্দ। ব্যথা কি? এটাও একটা শব্দ। চিন্তা কি, তাগুত কি? এগুলো তো শব্দই। হক ও বাতিল এগুলোও শব্দ। তবে একটা আরেকটার বিপরীত। যেমন খাবিস (নোংরা) একটি শব্দ। যার উদাহরণ হিসাবে বলা হচ্ছে, এমন একটি নোংরা ও অপবিত্র বৃক্ষের নাম (যেমন মাকাল বৃক্ষ) যার মূল বা শিকড় জমিনের ওপর থাকে- নড়বড়ে ও দুর্বল। কোন জায়গায় স্থির থাকে না। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে তায়্যিব (পবিত্র) যাকে এমন একটি পবিত্র গাছের সঙ্গে (যেমন খেজুর গাছ) তুলনা করা হচ্ছে যার শিকড় স্থায়ী, মজবুত ও সুদৃঢ় এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে ধাবমান। আল্লাহ পাক মানুষের বুঝার জন্য এ ধরনের সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়েছেন। আমরা যে জগতে বাস করছি, সেখানে একজন আরেকজনকে গড়ছি, তৈরী করছি, বানাচ্ছি। আমাদেরকে কেউ গড়ছে। আবার আমরা কাউকে গড়ছি। এ জীবনে চলছে সংঘাত। আদর্শের সংঘাত। কথার সংঘাত। পবিত্র বাক্য ও অপবিত্র বাক্যের মধ্যে সংঘাত চলছে। খোদা-প্রদত্ত আদর্শ ও ইবলীসী আদর্শের মধ্যে চলছে সংঘাত।

আমরা মানুষরা দুই আদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, সংঘাতে লিপ্ত। একজন বিজয়ী হয়, আরেকজন পরাজিত হয়। একজন উঁচুতে ওঠে, আরেকজন নিম্নগামী হয়। তবে অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে, যারা পবিত্র কালেমার ধারক-বাহক, যারা আল্লাহর কালিমাকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। তাঁর কালিমা এত তাৎপর্যপূর্ণ যে সব সময় তাজা ফল দেয়। যার অনুসরণের মধ্যে রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তৃপ্তি ও অপরিসীম প্রশান্তি।

যতদিন পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে, এ কালিমা তাকে উপকৃত করতে থাকবে এবং পরকালেও সেটা তার উপকারে আসবে।

এ ষ্টোরের ভিতর আমরা মৃত্যুকে দেখেছি। বরং আমাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। এখানে আমি তিনদিন কাটালাম। চতুর্থ দিন আমাকে বন্দীদের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সামরিক জেলে আমি এক বছর কাটিয়েছি। পুরো বছরটা এমনভাবে কেটেছে, যেন মৃত্যু এক মুহূর্তের জন্যও

আমার থেকে পৃথক হয়নি। প্রতিটা নিঃশ্বাসের মধ্যে তাকে দর্শন করেছি। সে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ছিল। দিনগুলো আমার হৃদয়, মস্তিষ্ক ও শরীরের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে আমি কখনো ভুলতে পারিনি। এগুলো লিখেও বর্ণনা করা সম্ভব না এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কেবল সেই উপলব্ধি করতে পারবে, যে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে।

ভয়াবহ দিনগুলো এবং নতুন জ্ঞানের আবিষ্কার

যারা এখানে ভয়াবহ দিনগুলো কাটাচ্ছে, তাদের কাছে একটা নতুন ধরনের জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিদ্যার অধিকাংশ এমন যা অন্যের কাছে অর্থহীন মনে হবে। কিন্তু সেই অর্থহীন শব্দগুলোই এখানে প্রতিটি জায়গায় প্রচলিত। এগুলো এখানকার পরিবেশে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, যেমন বিদ্যুত তার তারের ভেতর ছড়িয়ে থাকে। শব্দগুলো যখনই এখানকার মানুষগুলো শুনতে পায়, তখনি তারা শব্দগুলোর এমন অর্থ বুঝে, যার ব্যাপারে কারো নেই কোন মতবিরোধ। যেমন, যখন প্রহরীদের মুখ থেকে বের হত ঃ

"ষ্টোরের দরজা বন্ধ করে দাও।"

তখন সে মুহূর্তে আমাদের মধ্যে গভীর শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ কাজ করত। যদিও ষ্টোরটি পায়খানা, প্রস্রাব ও পুঁজের দূর্গন্ধে ভরা থাকত। বন্দীদের খালি পেট, তাদের নোংরা ও ময়লাযুক্ত দাঁত ও মুখের দূর্গন্ধ পরিবেশকে যদিও আরো অসহনীয় করছে।

এর বিপরীতে, যখন সকালে দরজার সিটকিনি বেজে ওঠত, যেটা ইংগিত দিত যে, এখন দরজা খুলছে, তখন যে লোকই সেই কড়া নাড়ার শব্দ শুনত, একদম আঁতকে ওঠত। নিজেকে সংবরন করার চেষ্টা করত এবং আসন্ন বিপদের মুখোমুখী হওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকত। এরপর সে মুহূর্তটি আমাদের জন্য ভীষন খারাপ; কষ্টদায়ক ও কঠিন হত যখন আমাদেরকে খাওয়ার জন্য কয়েক "লোকমা" মাত্র খাবার দেয়া হত। খাবার শুধু পরিমাণে অল্পই হত না; বরং সেটা এতই নিম্নমানের যে, একে খাদ্য বলাও মুশকিল। এখানকার নরপশুরা যখন আমাদেরকে খানা দিত, তখন

তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমাদের ওপর চালাত অমানবিক নির্যাতন। প্রতিটি বন্দী ভীষন আতংক ও ভয়াবহ বিপদের অপেক্ষায় সন্ত্রস্ত থাকত। অর্থাৎ সেই বিপজ্জনক মুহূর্তের কথা ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত থাকত, যখন তাকে তদন্তের জন্য তলব করা হবে। তদন্ত খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু তার অপেক্ষায় থাকাটাও কম কষ্টদায়ক না। আমাদের অনেক সঙ্গী সেই অপেক্ষার যাতনায় প্রাণ হারিয়ে ফেলে। তাদের অন্তর সেই ভয় ও আতংক সহ্য করতে পারেনি। হার্ট এ্যাটাকে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ পাক তাদের রূহকে তার রহমতের আবরণ দিয়ে ঢেকে নিন। আমীন।

নবম অধ্যায়

তদন্তের অপেক্ষায় ২১০ নং কক্ষে অবস্থান

এসব দিনে আমি ভীষণভাবে মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। সব সময় ভাবতাম, আমাকে কেন সামরিক জেলে আনা হয়েছে? আমি বুঝতাম, এখানে শুধু সে সব লোককে আনা হচ্ছে, "ষড়যন্ত্র" করার পেছনে যাদের কোন ধরনের হাত আছে। আমি গোয়েন্দা অফিসারদের সে সব কথা নিয়ে অনেক ভাবতাম, যা তারা আবু যাবাল জেলে আমাকে বলেছিল। কথাগুলোর আসল অর্থ আমি অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। কারণ আমি সেই ভয়াবহ শাস্তির কথা ভেবেই অস্থির থাকতাম যা এখানে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেয়া হবে। আমি মনে মনে তদন্ত কাজের নকশা বানাতাম যে, আমার সাথে এ ধরণের আচরন করা হতে পারে। এরপর ভাবতাম, তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে কথা বলব, যার ফলে শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমি এটাও ভাবতাম, এ দিনগুলোতে মিশরের ভাগ্যাকাশে এ কোন্ জুলুম ও বর্বরতা চলছে। আমি পুলিশ ও সেনাবাহিনীদের ঐ সব এজেন্সী নিয়েও ভাবতাম যারা নিজেদের দ্বীন, ঈমান ও বিবেককে বিসর্জন দিয়ে যা ইচ্ছা করছে।

অনেকবার আমি আমার নিজের কাছে এ প্রশ্নটি করেছি, জেলের আঙ্গিনায় ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ভিতর যা কিছু ঘটছে, এ সম্পর্কে কি প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের জানেন? এ প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হিসেবেই

পেতাম এবং "হ্যাঁ"-এর পক্ষে অনেক যুক্তি আমার সামনে আসত, যা কোন মতেই ফেলে দেয়া যায় না। তার মধ্যে মাত্র একটা প্রমাণ দিচ্ছি ঃ

মিশরের নামকরা একজন সাংবাদিক হচ্ছেন মুহাম্মাদ হাসনাইন হায়কাল। তিনি হচ্ছেন জামাল আব্দুন নাসেরের ডান হাত। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যু পর্যন্ত মিশরের উঁচু পদে আসীন ছিলেন। সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের আধ্যাত্মিক পিতা এবং মিশরে আজকাল যা ঘটছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগের পরিকল্পনাকারী তিনিই। আমি একবার স্বচক্ষে দেখেছি, মুহাম্মাদ হাসনাইন হায়কাল নিজের কালো রঙের দামী গাড়ীটাতে চড়ে গাড়ী সহ সামরিক জেলপ্রাঙ্গণে ঢুকলেন। যখন গাড়ী ভিতরে দাঁড় করিয়ে গাড়ী থেকে তিনি বের হলেন, মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সাআদ জগলুল আব্দুল করীম দৌড়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। এই মিলিটারী গোয়েন্দারাই নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাদেরকে হত্যা করছিল এবং যতেচ্ছ দুর্ব্যবহার করছিল।

তিনি ভিতরে এলেন। তখন নির্যাতনের মিউজিক ঠিকই জোরে শোরে বাজছিল। অর্থাৎ একদিকে ডাণ্ডা ও চাবুকের শাঁশাঁ শব্দ উঁচু হচ্ছে, অন্যদিকে মজলুম মানবতার হৃদয়বিদারক আর্তচিৎকার, বিলাপধ্বনি এবং আহ্আহ্ শব্দ আসমানকে কাঁপিয়ে তুলছে। তখন সাংবাদিক মুহাম্মাদ হাসনাইন হায়কাল জেল প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি সব দেখছিলেন শুনছিলেন। মনে হয় মিটিমিটি করে হাসছিলেনও। এমন তো হতে পারে না যে, তিনি জামাল নাসেরকে এসব ঘটনা বলেননি। তিনি অবশ্যই প্রেসিডেন্ট সাহেবকে এ সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন। আর যদি প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজেই জেল ও হাজতের অবস্থা সম্পর্কে খবর না রাখেন, তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা ও অবাস্তব কথা।

ফেরাউন প্রকৃতির হাবিলদার

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন-এর সকালে সীমাহীন আযাবের চাকা পুরো জোরেশোরে ঘুরছে। মানবতা নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমাদের দরজাটা খুলে গেল। সেপাইরা গালিগালাজ, কিল-ঘুষির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ষ্টোরের

সামনে একসারি বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন হাবিলদার এলো। সে অনেক বড় সাইজের একটি রেজিস্ট্রী খাতা উঠিয়ে রেখেছে। হাবিলদারের বয়স খুব বেশী হলে আঠার বছর হবে। সে চেয়ারে বসল। চেয়ারটা এক সেপাই অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে তার সামনে রেখেছে। সে খুবই অহংকার ও দম্ভ ভরে ওখানে বসল। তার দম্ভের শেষ ছিল না। যদিও সে একজন হাবিলদার কিন্তু তার দাপট ও নির্দেশ হিটলারের নাৎসী জেনারেলদের নির্দেশের তুলনায় কোন অংশে কমছিল না–যাদের জুলুমের কথা আমরা বিভিন্ন ইতিহাসের বইতে পড়েছি।

মোটকথা, এটা কোন আচম্বিত ব্যাপার ছিল না। বস্তুত হাবিলদারকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে, সে কারোর কোন পরোয়া না করে মজলুম বন্দীদের সাথে যেমন ইচ্ছা আচরন করতে পারত। তখন তার সামনে অনেক সেপাই ও সামরিক অফিসার হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের মধ্যে বড় বড় সেনা অফিসারও আছে। যখন এমন অবস্থা, তখন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, শয়তান তাকে মানবতা লংঘন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিবে। তার ভিতর ইবলীসী প্রকৃতি ভালভাবেই বাসা বেঁধেছে। সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো বেশ কিছু জেলকর্মীকে হাবিলদার খুব পিটাল। এখন ডাণ্ডা মারার কারণ একটাই–সে আমাদেরকে আসলে এ জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ক্ষমতা অসীম এবং তার নির্দেশ ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি কারো নেই। (নাউযুবিল্লাহ।)

এরপর সে বন্দীদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল এবং কারোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই বিভিন্ন বন্দীকে বিভিন্ন সেলে পাঠিয়ে দিল। প্রথমে সে বন্দীদের নাম পড়ল। এরপর রুম নাম্বার। সাথে সাথে ঐ বন্দী বাতাসের মত দৌড়ে নিজের রুমে স্থানান্তরিত হচ্ছে। যে সামান্যও শৈথিল্য দেখাচ্ছে, দেরী করছে কিংবা যখমের কারণে পায়ে ভর করে দৌড় দিতে পারছে না, তার আর রক্ষা নেই; নরক যন্ত্রণা তার উপর নেমে আছে

হাবিলদার আমার নাম ডাকল। আমার সঙ্গে আরো দুজনকে। সেপাইদের কিল, ঘুষি, চড় ও বেধড়ক ডাণ্ডা পিটুনীর মধ্য দিয়ে হাবিলদারের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেলাম ঃ

"রুম নং ২১০।"

অন্যদের মত আমিও বিদ্যুতগতিতে দৌড় মারলাম।

আমার সঙ্গে কে দৌড়াচ্ছে, জানতে পারলাম না। জেলের আঙ্গিনায় প্রতিটি কদমে লাঠি এবং লাথি আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় যেতে হয়। ওখানেই আমার জন্য বরাদ্দ ২১০ নং রুম। সেই সিঁড়ির জায়গায় জায়গায় রয়েছে আযাবের 'ফেরেশতা'। প্রতিটি সিঁড়িতে কোন না কোন সেপাই বসে আছে। বিশালদেহী। তাদের শরীর ও মুখ দিয়ে মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। মানবতাকে অপদস্ত করার জন্য হাত ওপর দিকে উঠেই আছে। ঘুষি দেওয়ার জন্য হোক, কিংবা কালো চকচকে ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করার জন্য, যে জন্যই হোক।

রুম নং ২১০-এর দরজায় সামবু বসে আছে। আস্ত একটা শয়তান। এমন কে আছে যে সামরিক জেলে ঢুকেছে অথচ সামবুকে চেনে না। নাছোড়, পাগলা কুকুরের চেয়েও তার কুখ্যাতি বেশী। সে তার দুই হাত দিয়ে বন্দীদের মুখে ঘুষি মারত। আর যে ওর ঘুষি খেত, সারাদিন তার মাথা ঘুরত। আমরা যখন আমাদের রুমের কাছে পৌঁছলাম, সামবু আমাদেরকে অনেক কিছু শুনাল, এখন এগুলো মনে পড়ছে না।

সে আমাদেরকে আচ্ছামত ধোলাই করল। এরপর কক্ষের ভিতর ঠেলে দিয়ে জোরে দরজা বন্ধ করে দিল। দ্রুত দৌড়ানোর ফলে আমরা হাঁপাচ্ছি। ঘরে ঢুকেই আমরা তিনজন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা এখন কিছুটা আনন্দ বোধ করছি। আমরা যখন ষ্টোরে ছিলাম, তখন আমরা ভাবতাম যে, যখন আমাদেরকে ষ্টোর থেকে রুমে স্থানান্তরিত করা হবে তখন আমাদের ওপর নির্যাতন অনেকটা কমবে এবং আমরা সেপাইদের দৃষ্টি থেকে আঁড়ালে থাকব। এটা আমাদের ধারণা ছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সে ধারণাকে বাস্তব করে দেখালেন। আমরা তৃতীয় তলার একটি তালাবদ্ধ ঘরে সময় কাটাচ্ছি, এখানে কেউ আমাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না এবং আমাদের ব্যাপারে কারোর কোন অনুভূতিও নেই। আমরা সবাই যার যার সঙ্গীর ওপর দৃষ্টি বুলালাম। এরপর আমরা পাগলের মতই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। কয়েক মিনিট পর ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম, ঘরের ভিতর চতুর্থ একজন লোকও আছে। আমি যখন তার নিষ্পাপ চেহারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালাম, তখন পরিষ্কার হয়ে গেল, এ তো সেই ডাক্তার, যার সঙ্গে কিছু আগে আবু যাবাল জেলখানার নির্যাতন প্রাঙ্গণে দেখা হয়েছে। আমি অত্যন্ত

আবেগের সাথে তার কাছে এলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"আপনি সেই ডাক্তার না?"

"জি, আপনি অবশ্যই আহমাদ রায়েফ!"

আরজ করলাম ঃ

"জি, আহমাদ রায়েফ।"

এরপর আবার আমরা হাসতে লাগলাম। ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন। তার কাছে জানতে পারলাম, তিনি এ কক্ষে একাকী ছিলেন। এ কারণে তার অবস্থা প্রায় পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিল। এখন আমরা আসাতে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পুরো রুমটি একদম খালি। শুধু প্রস্রাব করার জন্য রবারের একটা পাত্র পড়ে আছে। ডাক্তার সাহেব প্যান্ট ও হালকা শীতের একটি জামা পরে আছেন। আমাদেরও সেই একই লেবাস। এ পোশাকে আমরা গরম ও শীত দুটোই কাটাচ্ছি। রুমের ভিতর আমাদের ব্যবহারের জন্য কোন কম্বল কিংবা চাদর ছিল না। শীতের রাতে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমাদেরকে এমনভাবে কাবু করছে যেমন ক্ষুধার্ত বাঘ তার শিকারকে কাবু করে খেয়ে ফেলে।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা তদন্ত কার্যক্রম, গ্রেপ্তারী, শাস্তি ও নির্যাতনের কথা সবই ভুলে গেলাম। আমরা দীর্ঘ একটা কাহিনী শুরু করে দিলাম। আমাদের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম তত্ত্ব, চাতুর্য ও রসিকতা। মূল কাহিনী আমাদেরকেই ঘিরে। আমাদের ওপর যে নির্যাতন ও অমানুষিক আচরণ করা হয়েছে, তাই হচ্ছে কাহিনীর আসল প্রাণ। আমরা হাসছি, লুটোপুটি খাচ্ছি। আমরা এখানে একে অপরের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন কত বছরের সম্পর্ক। অথচ আমাদের পরিচয় সবে মাত্র হয়েছে। আমাদের উদাহরণ সেই নৌযানে আরোহীদের মত, যেটা পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। আর আমরা তার মধ্যে মাত্র চারজন সাঁতারু ঘটনাক্রমে বেঁচে সমুদ্রের তীরে পৌঁছুতে পেরেছি। প্রত্যেকেই তার পরিচয় নৌযানে রেখে এসেছে। শুধু মন, মস্তিষ্ক ও দেহখানা নিয়ে কোন মতে এ বিরান অজানা তীরে এসে পৌঁছেছে।

অতীতকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতেরও কোন আশা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ হচ্ছি আমরা চার মুসাফির। একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা রিক্ত হস্ত। সেলের ভিতর জীবনের প্রহর গুনছি। আমরা এক সঙ্গী

অন্য সঙ্গীর সাথে এমনভাবে মিলিত হই যেন দুনিয়ার সমস্ত বস্তু থেকে সে সম্পর্ক পবিত্র। অত্যন্ত সরলতা ও ভালবাসা নিয়ে আমাদের জীবন কাটছে।

রুম নং ২১০-এ অবস্থানকারী সঙ্গীদের ব্যাপারে কিছু না বললে হয় না।

১. প্রথমে ডাক্তার সম্পর্কে বলতে হয়। একেবারেই যুবক। বয়স পঁচিশের উর্ধ্বে হবে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তার বাবা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন। বর্তমান যুগে মধ্যবিত্ত লোকেরা যা ভাবেন, তাদেরও সেই একই ভাবনা। অর্থাৎ বেঁচে থাকার আকাঙ্খা। সরকারের আনুগত্য, সে সরকার যে কোনরূপে হোক না কেন, তার মতবাদ, চিন্তাধারা যাই হোক না কেন। কোন অবস্থাতেই ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা না করা। ধন-দৌলত জমা করা, যাতে দূর ভবিষ্যতে কোন সমস্যা দেখা দিলে, খারাপ সময় এলে তখন কাজে আসে। কারণ ভবিষ্যত বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

যাহোক, এ যুবক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল। তার পরিবারের লোকেরা তার এ শিক্ষাকে উন্নতির বাহন হিসেবে ভাবছিলেন। তাকে ঘিরে তাদের মনে অনেক আশা। তারা অনেক কিছু স্বপ্ন দেখছেন। তার বাবার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ছেলে মেডিক্যাল কলেজের লেখাপড়া অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ করে। এরপর সে "দাম্মারদাছ" হাসপাতালে বড় ডাক্তার হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। হাসপাতালের শেষ দিনটি যখন সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল যে, এখন সে হাসপাতালের এসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর হতে যাচ্ছে, তাকে গ্রেপ্তার করা হল। শিক্ষা গ্রহণের সময় তার পরিচয় হয়েছিল ইয়াহ্য়া হুসাইনের সঙ্গে। এ পরিচয়টি ঘটে সে সময় যখন ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের একটি পিকনিক পার্টি "রাসূল বার"এর শীতল স্থানে নিজেদের ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এ ডাক্তার তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং ইয়াহ্য়া হুসাইন কৃষি কলেজের। ঘটনা চক্রের এ পরিচয়ের পর একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইয়াহ্য়া হুসাইন মিশর এয়ারলাইনের পাইলট বনে যায়। তখন ডাক্তার যুবকের মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষ। একদিন ইয়াহ্য়া হুসাইন খুব গোপনে ডাক্তারকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানালেন। ডাক্তার সে আহ্বানে সাড়া দিল না। কারণ, এতে সরকারের বিরোধিতা করা হবে এবং সরকারের শত্রুতাকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার পিতা তাকে সব সময় সতর্ক করতেন

এবং দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

আগস্ট ১৯৬৫ সনের একটি উত্তপ্ত দিনে ইয়াহ্‌য়া হুসাইন রাতের কোন এক অংশে ডাক্তারের কাছে গেলেন। তাকে একটি বিশেষ মিশন সম্পন্ন করার আবেদন জানালেন। বিষয়টা সম্পর্কে তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বলে দিলেন। ইয়াহ্‌য়া তাকে একটি নাম্বার দিলেন। বললেন ঃ

"যে লোকটার নাম্বার দিলাম, আপনি যোগাযোগ করে তাকে এটুকু বলে দেবেন যে, 'ধরা পড়ে গেছে।'

ডাক্তার এই বিশেষ মিশনের আসল লক্ষ্য বুঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ইয়াহ্‌য়া হুসাইন ওয়াদা করলেন, এখন যেহেতু সে অনেক ব্যস্ত। পরবর্তীকালে সে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করবে।

ইয়াহ্‌য়া হুসাইন চলে গেল। এরপর আর আসলেন না। ঐ রাতেই তার দেশ থেকে পালানোর প্রোগ্রাম ছিল। আদ্দিস আবাবাগামী মিশর এয়ারলাইনের বিমানটি খার্তুমে ল্যাণ্ড করল, তখন ইয়াহ্‌য়া হুসাইন বিমান থেকে নামলেন। এরপর বিমানে আর ফিরে এলেন না।

এয়ারলাইনে ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের আরেকজন সঙ্গী চাকুরী করত। সে তার সাথেই পাটলট হিসেবে কাজ করত এবং তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা ইয়াহইয়ার মতই ছিল এবং সে ইখ্‌ওয়ানের একজন কর্মঠ কর্মীও বটে। নাম হচ্ছে জিয়া। সে আমাদের এ ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জিয়া জানত যে, ইয়াহ্‌য়া হুসাইন ডাক্তারকে নিজের গ্রুপে শামিল করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশরা জিয়াকে গ্রেপ্তার করে যখন তাকে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেয়, তখন তার মুখ থেকে এ ডাক্তারের নামও বের হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ ডাক্তার নিজেকে রাজধানী কায়রোর লাযোগ্‌লী পার্কের গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে বন্দী অবস্থায় আবিষ্কার করলো। এখানে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কক্ষে বন্ধ করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ধরনের? ডাক্তার যেহেতু ইখ্‌ওয়ান সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না, এ জন্য তার মুখ থেকে কোন উত্তর বের হল না। ফলে তাকে ভয়াবহ ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হল। অবশেষে তাকে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয় থেকে আবু যাবাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। যেখানে

তাকে হান্টার বর্ষনের শাস্তি সহ বিভিন্ন আযাব ভোগ করতে হয়। এতক্ষণে নিশ্চয় আপনারা লাঠি বর্ষণ এবং হান্টারের আযাবের পার্থক্য বুঝতে পারছেন।

অন্যান্য লোকদের মত ডাক্তারকেও আবু যাবালের জাহান্নাম থেকে নিজের জান বাঁচানো জরুরী হয়ে পড়ল। জান বাঁচানোর একটাই পথ ছিল, সেটা হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যামিথ্যে এমন একটা কাহিনী বানাতে হবে, যা শুনে এখানকার নিপীড়নকারী হায়েনারা এইটুকু অবকাশ পায়, যাতে নির্যাতিত লোকটা কোন রকমভাবে দম নিতে পারে।

তাই, ডাক্তার দাবী করল যে, সে ইখ্ওয়ানের রোকন এবং সে ইখ্ওয়ানকে বোমা বানিয়ে দিত। যখন তার কাছে বোমা বানানোর পদ্ধতি জানতে চাওয়া হল, তখন সে বলল ঃ

"একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ইথার এবং কিছু কেরোসিন নিয়ে তার ভিতর আরেকটি পদার্থ ক্লোরোফর্ম মেশাতে হবে। এ তিনটা উপাদান মিলে বোমা তৈরী করা হয়।

ইখ্ওয়ানী সন্ত্রাসবাদ একটি মনগড়া কাহিনী

ডাক্তার যখন এ বিবৃতি দিল, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে ওঠল, একজন ইখ্ওয়ানী সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিশরের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বড় হেডলাইনে এ "স্বীকারোক্তি"র সংবাদ বের হল। যারা পটকা ও গোলা বানায় তারা তো এ সংবাদ পড়ে হেসেই খুন। দৈনিক "আল-জামহুরিয়্যাহ" ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার বড় হেডলাইন ছিল ঃ "ইখ্ওয়ানের গুপ্ত শাখার রহস্য উদ্ঘাটন।"

"(ক্রাইম রিপোর্ট) বিশ্বস্ত তথ্য সূত্রে জানা গেছে, জনৈক ইখ্ওয়ানী সন্ত্রাসবাদী ইখ্ওয়ানের গুপ্ত শাখার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছে। সে বলেছে, "সাইয়েদ কুতুব এ শাখার প্রধান। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি তাঁকে সহযোগিতা করছিল। এ পাঁচ সদস্য কমিটিতে হাসান আল হুদায়বীর ছেলে ইসমাইল আল-হুদায়বী এবং একজন মহিলা সদস্য রয়েছে যাকে "হাযেন" (যায়নাব আল-গাযালী) বলা হয়।"

সে আরো বলেছে ঃ

"ইখ্ওয়ানের অধিকাংশ সদস্য হাযেনকে চেনে না।"

এ সন্ত্রাসী লোকটি সরকারকে উৎখাতের ব্যাপারে ইখ্ওয়ানের অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

অভিযুক্ত আসামী যুবকদেরকে বিপথগামী করার জন্য ইখ্ওয়ান যে কৌশল অবলম্বন করে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে এবং সে এটাও বলেছে যে, তাদের গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নতুন লোকদেরকে ছলে-বলে-কৌশলে দলভুক্ত করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামী একজন তরুণ ডাক্তার-যে ইখ্ওয়ানী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতারণার শিকার হয়েছে। সে-ই এ সব স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রদান করেছে। সে আরো বলেছে ঃ

"ইখ্ওয়ান সন্ত্রাসবাদীদের পরিকল্পনা ছিল পাওয়ার স্টেশন বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া, যেন পুরো দেশ অন্ধকারে ডুবে যায়।

সে এটাও স্বীকার করেছে যে, ইখ্ওয়ানরা যুবকদেরকে বিপথগামী করার জন্য এবং নিজেদের দলে তাদেরকে ভিড়ানোর জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে।"

সে স্পষ্টভাবে বলেছে ঃ

"যে কাজ সে নিজে করার দায়িত্ব নিয়েছিল, কিছু সময় পার হওয়ার পর যখন সে ভাববার সুযোগ পেল, সে বিপজ্জনক ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করল। কিন্তু এ জঞ্জাল থেকে বের হওয়ার সে কোন পথ খুঁজে পেল না। ১৯৫৯ সন থেকে এ যাবৎ ইখ্ওয়ান সরকারের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে ডাক্তার তা এক এক করে বর্ণনা করে।"

এই সংবাদ মিশরের পত্র-পত্রিকাতে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডলাইন দিয়ে ছাপানো হয়।

এখন আমার মত হল, পত্রিকার যে সম্পাদক সাহেব উপরোল্লিখিত ডাক্তারের "স্বীকারোক্তি"-এর উপর ভিত্তি করে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তিনি আসলে মিশরীয় জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বর্তমানে নাগরিক অধিকারের যুগে এই সাংবাদিকের পুরোপুরি জবাবদিহি করা উচিত। মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত, যাতে কেউ এ ধরনের মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করতে আগামীতে সাহস না করে।

এখন আসুন, ডাক্তার প্রকৃত পক্ষে তদন্তকারীদের সামনে কি বিবৃতি

দিয়েছিল, সে বিষয়ে আপনাদের কাছে আলোকপাত করা যাক। ডাক্তারের বিবৃতির বিবরণঃ "১৯৫৯ সনের গ্রীষ্মকালে আমি রাসূলবার-এর ঠাণ্ডা জায়গাটিতে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমার সাক্ষাত হয় ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের সঙ্গে। তখন ইয়াহ্‌য়া হুসাইন আয়নু শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে পড়াশুনা করতেন। আমিও সেই ইউনিভার্সিটিতেই পড়তাম। আমরা দুজন ওখানে একই স্থানে নামায পড়তাম। আমরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রকে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা দরকার। আমাদের বনভোজন পার্টি শেষ হয়ে গেল। আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। পিকনিক পার্টিতে আমাদের সঙ্গে আরেকজন স্টুডেন্ট ছিলেন। তার নাম হচ্ছে মুস্তফা রশিদী। তিনি কৃষি কলেজে ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের সহপাঠি। প্রায় দেড় বছর পর ঘটনাক্রমে আতাবাতে মুস্তফা রশিদীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমি তার কাছে ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ

"ইয়াহ্‌য়া হুসাইন কৃষি কলেজের পড়াশুনা শেষ করে বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন। শীঘ্রই তিনি পাইলট হয়ে যাবেন। আমি মুস্তফার কাছে ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের ফোন নাম্বার চাইলাম। আমার একটি স্টেথস্কোপ (রোগ নির্ধারণ যন্ত্র)-এর প্রয়োজন ছিল। ওটা মিশরে পাওয়া যায় না। ইয়াহ্‌য়া হুসাইনের মাধ্যমে সেটা আনাতে চাচ্ছিলাম। মুস্তফা ইয়াহ্‌য়ার ফোন নাম্বার দিলেন। আমি সেই নাম্বারে ইয়াহ্‌য়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। গ্রীষ্মের সেই পিকনিকের পর আমাদের এটাই প্রথম যোগাযোগ। তার সঙ্গে এ ছাড়া আর কোন সাক্ষাত হয়নি। মাছরুল জাদীদায় আমরা রোক্স সিনেমা হলের কাছে দেখা করলাম। তখন ছিল ঈদুল ফিতরের রাত। রোক্স থেকে আব্বাসিয়া পর্যন্ত আমরা কথা বলতে বলতে মোটরগাড়ীতে চলছিলাম। ইয়াহ্‌য়া কথা কথায় বলে ফেললেন, মানুষ কিভাবে সত্যিকারের মুসলমান হতে পারে! তিনি বললেন, এটা জানতে হলে আমাদেরকে কুরআনুল কারীম গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে পড়তে হবে এবং তার মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন কিতাবের কথা তিনি বললেন না। তবে তিনি বললেন, "আমি আপনাকে আরো কয়েকটা কিতাব সম্পর্কে আগামীতে বলব, যেগুলো পড়লে আপনার ইসলামী চিন্তাধারা পরিপক্ক হবে। ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং সৎ আমল করার

প্রতি আগ্রহ বাড়বে।"

আমি বললাম, "আমার একটি স্টেথস্কোপ প্রয়োজন। আপনি কি এনে দিতে পারবেন?"

ইয়াহ্য়া বললেন ঃ

"এটা তো কোন ব্যাপারই না। আমি ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য সেটা নিয়ে আসব, তবে একটু দেরী হতে পারে। কারণ আমার কাছে বর্তমানে ফরেন কারেন্সী নেই।"

তিনি আমাকে ফোনে রীতিমত যোগাযোগ রাখার জন্য তাগিদ করলেন। এরপর তার সঙ্গে কয়েকবার আমার ফোনে আলাপ হয় এবং সাক্ষাতও ঘটে।

একদিন শুক্রবার আমি তার কাছে গেলাম। জুমআর নামায পড়ে আমরা দুজন একটা ফ্লাটে গেলাম। ইয়াহ্য়ার ভাষ্য অনুযায়ী, ফ্লাটটি হচ্ছে তার বন্ধু মুহাম্মাদ আল গান্নামের। তখন মুহাম্মাদ আলগান্নাম ঘরে ছিলেন। সেখানে আরেকজন লোক ছিলেন। তার নাম আহমাদ রায়েফ। ডাক্তার মুহাম্মাদ আমীন যিনি কেমিষ্ট্রীতে P. H. D. করেছেন এবং বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানী সীড-এর পাবলিসিটি ইনচার্জ, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আমি ডাক্তার মুহাম্মাদ আমীন সাহেবকে ইতোপূর্বে কোম্পানীর দফতরে দেখেছিলাম। সেখানে আমি কোম্পানীর পাবলিসিটির উদ্দেশ্যে যেতাম।

গান্নামের ফ্লাটে তার সঙ্গে এটা দ্বিতীয় সাক্ষাত। তিনি আমাকে তার ঠিকানাও দিয়েছিলেন। মহল্লার নাম মনে নেই। আছ ছাব্তিয়াহ স্কুলের সামনে তার ফ্লাট। নাম্বার-৫, দ্বিতীয় তলা।

আমি আরেকদিন ইয়াহ্য়ার কাছে গেলাম। তিনি আমার সাথে ধর্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার আলাউদ্দীনকে চিনি কিনা! আমি বললাম, মনে পড়ছে না। ইয়াহ্য়া বললেন ঃ

"ডাক্তার আলাউদ্দীনের আপন ভাই জিয়া আমার বন্ধু। জিয়া খুবই ভাল মানুষ। তিনি আল্লাহর বিধান হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তার তাফসীর সম্পর্কে পড়াশোনা অনেক উঁচু মানের।

একদিন তার সঙ্গে আপনাকে দেখা করিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ।"

আরেকদিনের কথা। ইয়াহ্য়া আমাকে বললেন ঃ

"তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনকে সামনে রেখে কুরআন শরীফ পড়ার

ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

আমি বললাম ঃ

"কোন অসুবিধা নেই। করা যেতে পারে।"

তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন "মাকতাবাতুল ওয়াহ্বা" থেকে তাফসীরখানা কিনে নিতে এবং এটা যেন আমি পড়ি এবং খুব মনোযোগ সহকারে ব্যাখ্যাগুলো বুঝার চেষ্টা করি। তিনি এটাও বললেন ঃ

"ধর্মীয় নলেজ আরো বাড়ানোর জন্য পরবর্তী কিতাব সম্পর্কে পরে জানিয়ে দেব, ইনশাআল্লাহ।

এরপর ইয়াহ্য়া হুসাইন প্রস্তাব দিলেন, "আমরা দু'জনে মিলে মোতালাআ (ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন) করব এবং হাসপাতালে এমন দ্বীনদার লোকদের তালাশ করব, যারা আমাদের সঙ্গে মিলে দ্বীনের কাজকে আগে বাড়াবে। সে সব লোক এমন হতে হবে, যাদের ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে যে, তারা দ্বীনি কিতাবগুলো অত্যন্ত শ্রম দিয়ে ও মনোযোগ সহকারে পড়বে। আমি ইয়াহ্য়ার বলার পর অনেক খুঁজে এক লোককে পেলাম। তার নাম ডাক্তার মাজদী। ইয়াহ্য়াকে সে ব্যাপারে অবগত করলাম। ইয়াহ্য়া বললেন ঃ

"তিনি (মাজদী সাহেব) কি দৃঢ় মন নিয়ে পড়তে পারবেন?"

আমি বললাম ঃ

"হ্যাঁ, ধর্মীয় ব্যাপারে তার অগাধ জ্ঞান এবং এর প্রতি আগ্রহও যথেষ্ট।"

ইয়াহ্য়া বললেন ঃ

"তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার দিকে মনোযোগ দিন এবং তাকে এ কাজে লাগিয়ে দিন।"

একদিন ইয়াহইয়া আমার গৃহে আসলেন। আমাকে বললেন ঃ

"কোন এক লোক যার নাম হচ্ছে আলী। তিনি শুবরায় থমসন রোডে থাকেন। দ্বীনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ এবং অনেক পরহেজগার লোক। তিনি আপনার সাথে পরিচিত হতে চান। এতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

আমি বললাম ঃ

"আমার কোন আপত্তি নেই।"

এরপর তিনি বললেন ঃ

"আলী এ সময় তার বাসায়ই আছেন। তিনি অসুস্থ্য। আপনি কি তার

সেবাশুশ্রূষার জন্য যেতে পারবেন?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে চলুন।"

এ বলেই ইয়াহ্ইয়া এবং আমি তার বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম।

আমরা তার ঘরে পৌঁছলে তার স্ত্রী বললেন ঃ

"আপনারা ড্রইংরুমে বসুন। আমার স্বামী ডাক্তারের কাছে গেছেন। কিছুক্ষনের মধ্যে ফিরে আসবেন।"

আমরা প্রায় একঘন্টা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। ইয়াহ্ইয়া আলীর জন্য সেখানে একটি ব্যাগ রেখে গেলেন। তাতে গরম কোট ছিল। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম। কিছুদিন পর আবার ইয়াহ্ইয়ার সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে বললেন ঃ

"আপনার কি মত, আপনি একনিষ্ঠভাবে আমাদের দলে যোগ দিলে কেমন হয়! আমি আছি, জিয়া আছে, আলী আছে–যার ব্যাপারে আপনাকে বলেছি। আমাদের সাথে ইসমাইল হুদায়বীও রয়েছেন। দ্বীনী বিষয়ে গবেষণা, অধ্যয়ন ছাড়াও অন্য কিছু ব্যাপারে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে কেমন হয়?"

আমি বললাম ঃ

"অন্য কিছু ব্যাপার বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন?"

ইয়াহ্ইয়া উত্তর দিলেন ঃ

"আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা, মজবুত ও সুদৃঢ় করার কাজ।"

"সেটা কিভাবে?"

"আমরা বল প্রয়োগ করেও বর্তমান আইনকে পরিবর্তন করতে পারি।"

ইতোমধ্যে জিয়াও এসে গেলেন। ইয়াহ্ইয়ার হাতে ছোট্ট একটা বই ছিল। সেটা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন এবং তার কথাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করতে লাগলেন। বইটির বিষয়বস্তু হল ইসলামী বিপ্লব কিভাবে ঘটানো সম্ভব।

আমি ইয়াহ্ইয়াকে বললাম ঃ

"আপনি যে কাজের দিকে আহ্বান করছেন, তাতে তো আমরা কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হব। আমরা জেলহাজত ও নানা রকম নির্যাতনের শিকার হব।"

ইয়াহইয়া বললেন ঃ

"আপনার ইয়াকীন হওয়া উচিত যে, আপনার ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে সোপর্দ করে দেয়া।"

আমি বললাম ঃ

"আপনার কথাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হচ্ছে।"

ইয়াহ্‌য়া বললেন ঃ

"আপনার ঈমান এখনো দুর্বল। সেটা মজবুত করতে হবে, যাতে আল্লাহ পাকের এ আয়াতের মর্মার্থ বুঝে আসে ঃ "ইন্নাল্লা-হাশ্‌তারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুছাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্নালাহুমুল জান্নাহ।" (আল্লাহ তাআলা বেহেশ্‌তের বিনিময়ে ঈমানদারদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।) যদি আপনি এ আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদের কষ্ট-মুসিবত সহ্য করার শক্তি এসে যাবে।"

আমি তাকে বললাম ঃ

"যদি আমি এতখানি করতে না পারি?"

তিনি বললেন ঃ

"তাহলে আপনি ডাক্তার হিসেবে আপনার ঈমানী দায়িত্ব পালন করবেন। যখন কোন আল্লাহর সৈনিক কোন আক্রমণে আহত হয়, তার চিকিৎসা করবেন।"

আমি ইয়াহ্‌য়াকে বললাম ঃ

"এটা করলেও তো আমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আমাকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। আর এগুলো সহ্য করার মত সাহস আমার নেই।"

ইয়াহ্‌য়া খামোশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলেন ঃ

"আচ্ছা এটুকু কি করতে পারেন যে, আপনি আপনার সঙ্গী ডাক্তারদের বলে আমাদের জন্য একজন গ্রামের ডাক্তার ঠিক করে দেবেন?"

আমি বললাম ঃ

"হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে।"

এক সপ্তাহ পর ইয়াহ্‌য়া আবার আমার কাছে এলেন এবং আমাকে আলীর কাছে নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। আলীর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ

"ইয়াহ্‌য়া ভাই অবশ্যই আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামের কাজের ধারা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন।"

"জি।"

তিনি বললেন ঃ

"যদি আপনি ইসলামকে সমুন্নত করতে চান এবং আল্লাহর দ্বীনকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে অবশ্যই ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে হবে। আর মনে করবেন, জিহাদ ছাড়া আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিকল্প কোন পথ নেই"

আমি প্রত্যত্তুরে বললাম ঃ

"জিহাদ মানুষকে জেল, নির্যাতন এবং এক কঠিন পরীক্ষার দিকে ঠেলে দেয়। এটা ছাড়াও আমরা ইসলামের বিধানের উপর চলতে পারি।"

তিনি বললেন ঃ

"আমরা ইসলামের বিধানের উপর কিভাবে চলতে পারি! আমাদের ব্যাংকে সুদ চলছে। ফলে পুরো জাতি সুদে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। পথ-ঘাট এবং মার্কেট বা বিপনীগুলোত চলছে উলঙ্গ, বেপর্দা, অর্ধনগ্ন মহিলাদের সয়লাব যারা পুরো জাতিকে বেহায়াপনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম ঃ

"আপনার ধারণা ঠিক না। আপনি এবং আমি মিলেই ব্যাংকগুলোতে পুঁজি সরবরাহ করছি। আর যে উলঙ্গ মহিলাদের কথা বলছেন তারা তো আপনার ও আমারই বোন। আমরা নিজেদের পরিবারকে সংশোধন করতে পারি।"

তিনি বললেন ঃ

"আপনার কথা ঠিক না। যতক্ষন পর্যন্ত উপরে সংশোধন না হবে, সমাজ ও পরিবারে সংশোধন ও সংস্কার আনা সম্ভব নয়। আমাদেরকে প্রথমে উপর অর্থাৎ সরকার বা ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারই হচ্ছে সব খারাপের মূল। সেই মূলকে সংশোধন করতে হবে। খারাপের মূলোৎপাটন করে ভালকে সেখানে বসাতে হবে। তাহলেই সার্বিক কল্যাণ ও সংস্কার, সংশোধনের আশা করা যায়।"

তিনি আরো বললেন ঃ

"কোন সামরিক বিপ্লব দ্বারা এ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য

একমাত্র পথ হচ্ছে আকাশ ও রেল পথ অচল করে দেয়া। এতে সরকার হটতে বাধ্য হবে। এ কৌশল অবলম্বনে মানুষের জানেরও ক্ষতি হবে না। এরপর সব জায়গায় তো আমাদের বলিষ্ঠ লোক রয়েছে। তারা সুযোগ বুঝে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আপনার কাজ শুধু এইটুকু যে, আপনি আমাদেরকে কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য অর্থাৎ ইথার, ক্লোরোফর্ম এবং কেরোসিন-এর কয়েকটি বোতল সরবরাহ করবেন। এর চেয়ে বেশী আমাদেরকে আপনার সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। কোন্ জিনিস কতটুকু পরিমাণ লাগবে, এটা আপনি আমাদের এক সঙ্গী ডাক্তার আযমীর কাছে কিংবা আমার কাছে জেনে নিতে পারবেন।"

প্রয়োজনীয় নোট ঃ ইয়াহ্য়া হুসাইন আমাকে বলেছিলেন ঃ

"হাসপাতালে আযমী নামে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি এসব বিষয়ে সবকিছু জানেন। আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আলাপ করবেন।"

ইয়াহ্য়ার কথা অনুযায়ী আমি ডাক্তার আযমীর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাকে বললাম ঃ

"ইয়াহ্য়া হুসাইন আপনাকে সালাম দিয়েছেন।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠলেন ঃ

"আমি ইয়াহ্য়া হুসাইন নামের কোন লোককে চিনি না।"

যখন আমি তাকে বললাম যে, তিনি হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি বিদেশ থেকে আপনার জন্য একটি স্টেথস্কোপ আনার ওয়াদা করে রেখেছেন।

এবার তিনি বললেন ঃ

"ও ... আমি তো তাকে চিনি। তাকেও আমার সালাম বলবেন।"

এরপর ডাক্তার আযমী আমাকে বললেন ঃ

"আপনার উছরায় (গ্রুপে) আপনি ও মাজদী থাকবেন। তার সাথে মিলে আপনি ইসলাম ও বিপ্লব সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন।"

কিন্তু আমি প্রত্যত্তরে বললাম ঃ

"মাজদী সবেমাত্র হাসপাতালে চাকুরীতে ঢুকেছেন। তাকে লম্বা সময় ডিউটি দিতে হচ্ছে। তার মাও অসুস্থ্য। তাকে একাই মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে হচ্ছে।"

এ কথার পর আযমী প্রস্তাব দিলেন ঃ

"তাহলে আপনার ও আমার মধ্যেই যোগাযোগ থাকা উচিত।

মাজদীর সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। আর কিছু না হলেও কমপক্ষে এতটুকু করুন যে, তাকে সাধারণ কিছু প্রাথমিক নলেজ দিন। আপাতত এটুকু তার জন্য যথেষ্ট। আমরা ধীরে ধীরে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং পূর্ণ আস্থা অর্জনের পর তাকে পরিপূর্ণ নলেজ দেব।"

এ কথা শুনে আমি বললাম ঃ

"তাহলে কি আমাদের উসরা (দল) আপনি, আমিও একটা দূর মাধ্যম মাজদীকে নিয়ে তৈরী?"

"জি।"

আমি প্রশ্ন করলাম ঃ

"আমাদের এ সংগঠন সম্পর্কে আগামীতে মাজদী কিভাবে জানবে?"

"ইয়াহ্য়ার মাধ্যমে।"

আমি ইয়াহ্য়া হুসাইনের কাছে চার্জেব্ল্ ব্যাটারী চাইলাম, যেটা বিদ্যুত দ্বারা চার্জ করা যায়। মাজদী যখন জানতে পেলেন, ইয়াহ্য়া আমার জন্য ব্যাটারী সরবরাহ করবেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন ইয়াহ্য়াকে আরেকটা ব্যাটারী আনতে বলি। যখন ইয়াহ্য়া ব্যাটারী নিয়ে এলেন, তখন মাজদী আমাকে বললেন, আমাদেরকে ইয়াহ্য়ার কাছে গিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এবং আমরা মিলে মিশে মুতালাআ (অধ্যয়ন, গবেষণা) করব।

কাজেই আমরা ইয়াহ্য়ার ঘরে গেলাম। সেখানে তিনি আমাকে মাজদীর সামনে ইসলামী কিতাব পড়ার পদ্ধতি এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি, যাতে বেশী বেশী কিতাব পড়ার সুযোগ হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাকে অবহিত করতে থাকবেন।

মাজদী আমাকে বললেন ঃ

"আমি এবং ফারূক ছুটি কাটাচ্ছি। আমরা বালিতাম যাব, ওখানে কিছুদিন বিনোদনের উদ্দেশ্যে।"

আমি বললাম ঃ

"আমিও ছুটি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।"

আমরা এটাই সিদ্ধান্ত নিলাম। পরের দিনই আমরা বালিতামের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। তিনদিন বেড়ানোর পর ফিরে এলাম। মাজদী পথে তার গ্রামে নেমে গেলেন।

আমি, ফারূক ও ইয়াহ্য়া কায়রো চলে এলাম।

গাড়ীতে বসে ইয়াহ্য়া আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমরা যেন সাক্ষাতের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিই। যেন সংগঠন থেকে যখন যে নির্দেশ জারি হয়, সে সম্পর্কে সব সময় আমরা জানতে পারি।

আমি তাকে বললাম ঃ

"আমরা কোন্ জায়গায় মিলিত হব।

আমি বিবাহিত। আপনারা অবিবাহিত। আমার ওখানে সব সময় মিটিং করা সম্ভব নয়। মনে হয়, মসজিদে সায়্যিদা যায়নাবকে এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা যেতে পারে। আমরা প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব সেখানে একত্র হতে পারি।"

কিন্তু আমাদের সেই নির্ধারিত বৈঠক ঠিকমত চলেনি। কারণ, ইয়াহ্য়া বেশীর ভাগ এয়ারলাইনের ডিউটিতে বিদেশ সফরে থাকতেন। এদিকে হাসপাতালেও আমাদের ডিউটি পরিবর্তন হতে থাকত। এজন্যই আমাদের বৈঠকের প্রোগ্রামটা এক রকম ব্যর্থ হল।

একদিন ইয়াহ্য়া রাত ৯টায় আমার কাছে এলেন। তার সঙ্গে জিয়া তোপচীও ছিলেন। আমাকে বললেন ঃ

"আমরা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা হালওয়ান থেকে কায়রো পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাব।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

"এটা কি ব্যায়ামের জন্য করা হচ্ছে?"

ইয়াহ্য়া বললেন ঃ

"হাইকমাণ্ডারের কাছ থেকে এ নির্দেশ এসেছে।"

"কোন্ হাইকমাণ্ড?"

তিনি বললেন ঃ

"সায়্যিদ কুতুব হচ্ছেন সভাপতি। তার সঙ্গে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটা কমিটি রয়েছে। এ কমিটিতে কে কে রয়েছেন, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। হয়তো বা আগামীতে আমরা জেনে যাব। এ পায়ে হাঁটা মার্চের পর

আরেকটা মার্চ হবে কায়রো থেকে বানহারের দিকে। সেই মার্চও পদব্রজে হবে।"

ইয়াহ্য়া আরো বললেন ঃ

"তিনি এবং জিয়া হাযেন যায়নাব আল-গাযালীর বাড়ীতে অবস্থান নিবেন।"

যায়নাব আল-গাযালী মুসলিম নারী সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। আমার স্ত্রীও সে সংগঠনের সদস্যা। আলীর স্ত্রী এবং সাইয়েদ কুতুবের ভগ্নিও সে সংগঠনের সদস্যা। এ সকল মহিলা বিভিন্ন উসরার (গ্রুপের) সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন। যদি কোন উসরা ধরা পড়ে যায়, তাহলে এ সকল মহিলা অন্য উসরাকে সে ব্যাপারে অবহিত করবেন। এ দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছে।"

একদিন আমি ইয়াহ্য়ার সঙ্গে একটা ঘরে গেলাম। ইয়াহইয়া বললেন ঃ

"এটা মাহমূদ আলগান্নামের ঘর।"

ওখানে জিয়া, মুহাম্মাদ আলগান্নাম এবং আরেকজন লোক উপস্থিত ছিলেন–যার ব্যাপারে বলা হল ইনি জাপানী পদ্ধতির জুডু, কারাটে ইত্যাদিতে অত্যন্ত পারদর্শী এবং তিনি জুডু কারাতের প্রশিক্ষণ দেন। এ সব আর্টে খঞ্জর ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং কিভাবে খঞ্জরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারেও ট্রেনিং দেয়া হয়। কি ভাবে কোন আঘাত ছাড়াই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করা যায় ইত্যাদি শেখানো হয়।

ইয়াহ্য়া আমাকে বললেন ঃ

"এ ধরনের আর্ট আপনার শরীরের জন্য মানানসই নয়।"

পনের দিন আগের কথা। রাত এগারটায় ইয়াহ্য়া আমার কাছে এলেন এবং আমাকে বললেন, "আপনার স্ত্রী নীচে ট্যাক্সীতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আপনাকে যা বলব, তার ওপর আমল করুন। আপনি ৮৯৬৪৬০ নাম্বারে ফোন করুন এবং ফারূককে ডাকুন। তিনি যখন এসে ফোন রিসিভ করবেন, তখন তাকে বলুন ঃ "আমি ওবায়েদ বলছি। লোকগুলো ধরা পড়ে গেছে। আপনি আপনার কাজ করে ফেলুন।"

ফারূক যদি কোন উত্তর না দেন, তাহলে তাকে আর কিছু বলবেন না।"

আমি তাই করলাম। পরের দিন সকালে আমি উপরোল্লিখিত নাম্বারে ফোন করে ফারূককে পেলাম না। আরেকজন লোক ফোন রিসিভ করলেন।

তিনি বললেন ঃ "ফারূক পোর্ট সাঈদে গেছেন।"

আমি তার ফেরার টাইম জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ

"ফারূক কখন আসবেন এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই।"

আরেক লোক ফোন হাতে নিয়ে আমাকে বললেন ঃ

"আমি ফারূকের ভগ্নিপতি। আপনি যদি ফারূকের ঠিকানা জানেন তাহলে তাকে এ খবরটা পৌঁছিয়ে দিন যে, তার মায়ের অবস্থা খুবই গুরুতর।"

আমি তাকে বললাম ঃ

"আমি ফারূকের ঠিকানা জানি না।

গত বুধবারের কথা। আমার কাছে হাসপাতালে জিয়া তোপচী এলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"ইয়াহ্য়া ৮৯৬৪৬০ নাম্বারে ফোন করেছিলেন। ওখানকার লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

"যদি ফারূক আসেন, তাহলে তিনি যেন আমাকে ৬৫০৫০ নাম্বারে ফোন করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন অফিসার ইয়াহ্য়ার ঘরে এলো তল্লাশী নেওয়ার জন্য।

ইয়াহ্য়া তখন সেখানে ছিলেন না। ইয়াহ্য়ার শ্যালক ছিলেন। তিনি তখন জিয়া তোপচীর নিকট ছিলেন। তার কাছে ইয়াহইয়ার কিছু ডলার রাখা ছিল। তিনি তার কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে নিলেন। এরপর ইয়াহইয়া বললেন ঃ

"আমি প্রথম খার্তুম যাব, এরপর সউদী আরব।"

গত সোমবার আমি মাজদীর সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বললাম ঃ

"ইয়াহ্য়ার দলবল বিপ্লব করতে চেয়েছিল। কিন্তু সবাই ধরা পড়েছে। আমিও তাদের দলের একজন। আম্যকেও তারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাদের বিপ্লবী দলে শামিল হতে। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছি। এরপর আমাকে বলা হল, যদি বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে কেউ আহত হয়, আমি যেন তার চিকিৎসা করি। এটাও আমি মানিনি; নির্যাতন ও শাস্তির ভয়ে।

বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে বোতল বোমা তৈরী করার উপাদান ও টেকনিক আমি আযমীর কাছ থেকে শিখেছি। আযমী আমাকে বলেছিল ঃ

"এক তৃতীয়াংশ ইথার, এক তৃতীয়াংশ ক্লোরোফর্ম এবং এক তৃতীয়াংশ কেরোসিন ছোট্ট ছোট্ট লাল বোতলে ভরে নিলে বোমা তৈরী হয়ে যাবে। আযমী এটা আলীর কাছ থেকে শিখেছে।

আমি ইয়াহ্য়ার মুখ থেকে কয়েকটা নাম শুনেছি। যেমন, হাযেন, যয়নব আল-গাযালী। ইনি হচ্ছেন ইখওয়ানের মহিলা শাখার প্রধান। তার ভাতিজা হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সাআদ। যায়নাব আল-গাযালী অনেক চেষ্টা চালিয়ে তার ভাতিজাকে আল্লাহর পথে নিজের জান কোরবান করার জন্য অঙ্গিকার করিয়ে নিতে সফল হন। আহমাদ রায়েফ-এর নামও শুনেছি যাকে এক দুবার দেখেছিও। ইয়াহ্য়া বলেছিলেন যে, তিনিও (আহমাদ রায়েফ) পাঁচ কমিটির একজন। ইসমাইল আল-হুদায়বী এবং হাযেন যয়নবও সেই কমিটির মেম্বার। হাযেন যায়নাব আল-গাযালীর চিন্তাধারা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। আমি শুধু এটুকু জানি যে, ইয়াহ্য়া যায়নাব আল-গাযালীর কাছে থাকতেন।

স্বাক্ষর ঃ

ডাক্তার ...

ফ. আ.

২ রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন

ডাক্তার সাহেবের বিবৃতি আনুপুঙ্খ আমি বর্ণনা করলাম। এ বিবৃতির ওপর আমি কোন ধরনের মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করি না। তবে এটা অবশ্যই বলব যে, এ বিবৃতিটা পাওয়ার জন্য ইন্টেলিজেন্স-এর পাণ্ডারা ডাক্তারের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তারা তার কাছ থেকে এমন অনেক কথা স্বীকার করিয়ে নেয় যা আমলে ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মোটকথা, পূর্ণ বিবৃতিটি আমি পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম। তাদের কাছে আমার আবেদন এই, তারা যেন বিবৃতিটি বার বার পড়েন এবং তা থেকে যে ধরনের ফলাফল ইচ্ছা বিশ্লেষণ করে বের করতে পারেন। তবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে এ মনগড়া বিবৃতি, যা ডাক্তার সাহেব প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজে বানিয়েছেন এবং তার সাথে রয়েছে গোয়েন্দাদের জোরপূর্বক স্বীকৃতি, এরই

উপর ভিত্তি করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে সুপ্রীমকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য অমানবিক ও বর্বর ফায়সালা জারি হয়েছে। এই রাবিশ, কাল্পনিক ও হাস্যকর কাহিনীর ভিতরে যে সব লোকের কোন না কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আপনি কি জানেন, তাদের সঙ্গে কি রকম নির্দয় এবং নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে? তাহলে শুনুন ঃ

এ কাহিনীতে আলোচিত এক লোককে (সাইয়েদ কুতুব রহঃ) মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

দু'জনের মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাদের একজন হচ্ছে এ বইয়ের লেখক অধম আহমাদ রায়েফ।

ইসমাইল হুদায়বীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

জিয়া তোপচীকে পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

হাযেন যায়নাব আল-গাযালীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আমিনা কুতুব, যিনি কুমারী এবং অবিবাহিত–তাকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

সাইয়েদ কুতুব (রহঃ)এর ভাগ্নে সাইয়েদ রাফআতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু জেলের অভ্যন্তরেই তাকে কিছু দিনের ভিতর শহীদ করে ফেলা হয়।

ডাক্তার মাজদীকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আর বাকী লোকগুলো সাত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে পঁচতে থাকে।

আমি আবারো আপনাদের কাছে আরজ করব, আপনারা ডাক্তারের বানানো কাহিনীটা পড়ুন এবং এরপর সেই শাস্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যা নিরীহ লোকদের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট থেকে জারি হয়েছে। এ কাহিনী আর আদালত কর্তৃক শাস্তির মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য আছে বলুন।

একটি প্রাসঙ্গিক কথা

যে পত্রিকাটিতে (আল-জামহুরিয়্যাহ) ডাক্তার সাহেবের কল্পিত স্বীকারোক্তিটি প্রকাশিত হয়, তারই অপর পৃষ্ঠায় আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়, যার হেডলাইন হচ্ছে ঃ

শায়খুল আজহার (আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) হাসান মামুনের ফতোয়া–"ঘৃন্য চক্রান্তের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।"

হেডলাইনের নীচে বিশদভাবে সংবাদটি ছাপা হয়েছে ঃ

আল আজহার-এর ভাইস চ্যান্সেলর শেখ হাসান মামুন কাল একটি বিবৃতি জারি করেছেন। তাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

"ইসলামের শত্রুরা ইসলামের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা সরল প্রকৃতির লোকজনকে নিজেদের জালে আবদ্ধ করছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাস, লড়াই এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সেই ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন, যেন ইসলামের ইজ্জত সম্মান রক্ষা পায়। এ সব লোক মূলত সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের দালাল এবং তাদের হাতের ক্রীড়নক।"

ভাইস চ্যান্সেলর আরো বলেন ঃ

"মুসলমান ভাইয়েরা! আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশ, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত। এটি সব সময় কুরআন ও সুন্নাহর তালিম ও শিক্ষাদানে সচেষ্ট রয়েছে। যে কোন সমস্যায় এটি কুরআন ও সুন্নাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখান থেকেই হেদায়েত ও আলো লাভ করে।

আল্লাহপাক আল-আজহারকে মহাসম্মান দান করেছেন। তার ওপর রয়েছে বিশ্বের সমগ্র মুসলমানের গভীর আস্থা।

চিন্তা, আকিদা ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মুসলমানগণ সব সময় আল-আজহারকে 'আমীন' ও বিশ্বস্ত ভেবে আসছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং যুগের নতুন নতুন যে কোন জটিল সমস্যার ব্যাপারে মুসলিম সমাজ তাকে মুন্সেফ বা প্রধান সমাধাকারী হিসেবে মেনে আসছে। আল আজহার তার দ্বীনি ও ধর্মীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে আসছে।

সে তার দায়িত্ব একমুহূর্তের জন্য ভুলেনি। তার জন্মলগ্ন থেকেই সে তার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। দ্বীনের তাগাদা পূরণের ক্ষেত্রে সে সব সময় সচেষ্ট।

সম্মানিত ভাইয়েরা! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব ভাল করে জানেন, মিশরের ওপর এ মুহূর্তে কোন্ ধরনের দায়িত্ব বর্তায়! মিশরের বর্তমান মহান

নেতা (জামাল আব্দুন নাসের)কে সেই আল্লাহই নির্বাচন করেছেন এ জাতির হাল ধরার জন্য। তাঁকে এক গুরুভার দান করেছেন।

তাঁকে আল্লাহপাক ভালবাসেন বলেই তিনি মিশরবাসীর কাছে ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক ও সন্ত্রাসবাদীদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন–যেন মিশর তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে এবং মহান আরব জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে এখানে ইসলামের মানবতাবাদ কায়েম করা যায়। মূলত আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া মানেই হল ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

এ সব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও ফেতনাবাজ সংগঠনের ধারক-বাহকরা চরম দুঃসাহস দেখিয়ে ইসলামের নামে যুবকদের বিপথগামী করছে। তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করছে। তারা বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম থেকে তাদেরকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আল-আজহারের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সে সব যুবকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে তাদের চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা; তাদেরকে ইসলামের খাঁটি ও নির্ভেজাল দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। সেই পথের সন্ধান দেয়া যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত হয়েছে।

ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা নবী কারীম (সাঃ) হযরত জিবরাইল (আঃ)এর প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত জিবরাইল (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ! ইসলামের পরিচয় আমাকে বলে দিন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে হজ্জ করবে।"

জিবরাইল (আঃ) বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামতের দিবস এবং

তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।"

জিবরাইল (আঃ) শুনে বললেন, "আপনি যথাযথ বলেছেন।"

এরপর জিবরাইল (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাকে 'ইহসান'-এর পরিচয় বলে দিন?"

হযরত (সাঃ) বললেন, "ইহসান এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে সরাসরি দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে ধারণা রাখ।"

এটাই হচ্ছে আসল ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। অথচ এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারী দলটি (ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন) ইসলামের মধ্যে আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে যে, মুসলমানদের তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত জরুরী।"

সন্ত্রাসী দলটি যুগের চাহিদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এরা আসলে ইসলামের নাম দিয়ে সমাজের মধ্যে কুসংস্কার ছড়াচ্ছে। তারা ইসলামের লেবেল ব্যবহার করে তার মধ্যে পবিত্রতার রং লাগিয়ে নতুন প্রজন্মকে প্রলুব্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা যুবকদেরকে সরকার উৎখাত করে গদি দখল করার প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের সমর্থক বানিয়ে নিচ্ছে।

এ সন্ত্রাসী দলটি মূলত ধর্মের নামে ব্যবসা করছে। ইসলাম মুসলমানদের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিখায়; মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষা করার নির্দেশ দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে মুসলমান এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তখন তার রক্তপাত ঘটানো অন্য মুসলমানের উপর হারাম হয়ে যায়। তবে শুধু তিন অবস্থায় রক্তপাত করা বৈধ, ১. যদি বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করে; ২. যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং ৩. যদি দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরিত ও মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দল ত্যাগ করে।"

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষনে বলেছেন ঃ

"লোকেরা! আজ কোন্ দিন?"

সাহাবীগণ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" উত্তর শুনে

তিনি চুপ থাকলেন। এরপর তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়?

সাহাবীগণ বললেন, জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেন, তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মানও পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সতর্ক হও!!

উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি আমার বাণী পৌছে দেবে, তার চেয়ে যার কাছে সেটা পৌছানো হবে সে বেশি সংরক্ষনকারী হতে পারে।

এরপর তিনি বললেন, আমি কি (আমার বক্তব্য) পৌছে দিয়েছি? আমি কি পৌছে দিয়েছি?

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, জি, অবশ্যই আপনি পৌছে দিয়েছেন।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে আরেকটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

যদি একজন লোককে হত্যার ব্যাপারে এত কঠোর সতর্কবাণী ঘোষিত হয়ে থাকে, তাহলে অগণিত নিরীহ নিরপরাধ জনগণের রক্তের সাথে হোলি খেলা এবং শান্তিপ্রিয় লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা কত জঘন্য গোনাহ হতে পারে! যদি একজন মুসলমানের মাল অন্য মুসলমানের উপর হারাম ও অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে দেশের সম্পদ নষ্ট করা, জাতীয়স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা কত বড় অন্যায় হতে পারে!

আমার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগছে, যারা ইসলামের ধারকবাহক হওয়ার দাবী করছে এবং ইসলামের জন্য নিজেদেরকে নিবেদিত প্রাণ জ্ঞান করে

থাকে, তারা কিভাবে ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং মুসলমানদের রক্তপাত করার জন্য তাদের দুশমনদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে? এ সব ধর্ম ব্যবসায়ীর দাবী কত অসার! তাদের চক্রান্ত কত ঘৃন্য!

তারা কি আল্লাহ পাকের এই বাণী শুনেনি যাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

"ওয়া মাঁঈ ইয়াতাওয়াল্লাহুম মিনকুম ফা-ইন্নাহু মিন্‌হুম।"

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল-কুরআন)

আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

"লা-তাজিদু ক্বাওমাঁঈ ইয়ুমিনূ-না বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি য়ুওয়া-দ্দূনা মান্‌হা-দ্দাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়ালাও কা-নূ আ-বা–আহুম আও আবনা–আহুম আও ইখ্‌ওয়া–নাহুম আও আশীরাতাহুম।"

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না; যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।" (সূরা মুজাদালা, আয়াত ঃ ২২)

মুসলিম ভাইয়েরা! সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের দেশ দখল এবং আমাদের উপর তাদের মর্জি মোতাবেক হুকুম চালাতে এবং আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, এখন আর মিশরবাসীকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুটি কয়েক লোক কিনে নিয়ে আপনাদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছে, যেন আপনাদের সফলতা ও অগ্রগতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অতএব দেশবাসীর কাছে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যেন এসব ষড়যন্ত্রকারীর ঘৃন্যচাল ও ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকেন।

আপনাদের মহান সাম্যবাদী ও প্রগতিশীল বিপ্লব যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। এমন হলে আপনারা আবার পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পড়বেন। আপনাদের স্বাধীনতা খর্ব হবে।

আজহার শরীফ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট যত কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রচার মাধ্যম রয়েছে, এগুলো আপনাদেরকে সেই খাঁটি ও নির্ভেজাল দ্বীন শিক্ষাদান করে, যা খোদ আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, যা সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের

সংমিশ্রন থেকে পবিত্র, যা সঠিক ও বাতিলপন্থীদের বক্রতা থেকে মুক্ত। আমরা আপনাদেরকে সেই কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করতে চাই, যে ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং সেই অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চাই, যার অকল্যাণ সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। অতএব আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আলআজহার যে পথ অনুসরণ করছে, সেই পথেই পরিচালিত হোন। তবেই আপনারা সত্যিকারের হেদায়েত পাবেন।"

শায়খুল আজহারের বিবৃতির পর্যালোচনা

বাস্তব কথা হল, কয়েক পৃষ্ঠায় শায়খুল আজহারের (জামেয়া আজহারের ভাইস চ্যান্সেলর) বিবৃতির পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এজন্য একটি মোটা পরিসরের বই লেখার প্রয়োজন। যেন মুসলমান ভাইয়েরা বুঝতে পারেন, গত কয়েক বছর ধরে জামেয়া আজহার কত মারাত্মকভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের শিকার হয়েছে এবং তার ভাবমূর্তি কত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমীরুশ শুআরা (কবিগুরু) হযরত শাওকী বেগ (রহঃ) ও আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুহ্ (রহঃ)এর আত্মার প্রতি আল্লাহর রহম ও মাগফেরাত কামনা করে আমি আরজ করছি যে, শায়খুল আজহার হাসান মামুন (যার বরাত দিয়ে উপরের ফতোয়াটি জারি হয়েছে) সাহেবের উচিত ছিল নিজের বয়স ও পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলা। ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর মত একজন ব্যক্তিত্ব কিভাবে মূর্খ ও জাহেল লোকদের মত অধার্মিক ও নাস্তিক সরকারের হাতের পুতুল বনে গেলেন। তাঁকে ভেবে চিন্তে কথা বলা উচিত ছিল। তাকে বুদ্ধি-বিবেচনা করে বিবৃতি দেয়ার দরকার ছিল। আজ যারা দেশের নিরীহ, নিরপরাধ তৌহিদী জনতা, উলামায়ে দ্বীন ও ইসলামে অনুপ্রাণিত যুবকদেরকে জেলহাজতে ভরে তাদের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালাচ্ছে, যারা তাদের মান-সম্মানের প্রতি অন্যায় হাত প্রসারিত করেছে, তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, সে সব ডাকাত-লুটেরা মোনাফেক মুরতাদ শাসক গোষ্ঠীর কি পরিণতি ঘটে, হাসান মামুন সাহেবকে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করার দরকার ছিল।

শায়খুল আজহার হাসান মামুন নিজের ফতোয়ায় ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ও তল্পীবাহক হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা জনাব হাসান মামুন সাহেবের কাছে সবিনয় জিজ্ঞেস করতে চাই, তিনি ইখ্ওয়ানকে কোন্ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট মনে করেন? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশ সাম্রাজ্যবাদ, নাকি ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের? তিনি তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে কোন দলীল ও তথ্য পেশ করেননি। তিনি নিজেও জানেন, তাঁর কথার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অথচ এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা, বর্তমানে নাসের প্রশাসন মিশরের তৌহিদী জনতার উপর যে নিপীড়ন নির্যাতন চালাচ্ছে, এটা তাদের মুরুব্বী আমেরিকা, রাশিয়া ও ইহুদীদের ইংগিতেই হচ্ছে।

খুবই পরিতাপের ব্যাপার, আজহার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হাসান মামুন সহ আজহারের অন্যান্য শায়খগণ কিভাবে সত্যকে ধামাচাপা দিচ্ছেন। তাঁরা নিজেদেরকে এত নিচু পর্যায়ে কেন নিয়ে গেলেন! কোথায় গেল তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক!

জনাব হাসান মামুন! আপনি জবাব দিন, যখন জামাল নাসেরের নাস্তিক পাইলটরা ইয়েমেনের উপর বিমান আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার আবাল, বৃদ্ধবনিতাকে নির্বিচারে হত্যা করছিল, তখন আপনার ঈমানী চেতনা কোথায় গিয়েছিল? ইয়েমেনের জনগণ তো মুসলমানই ছিল। তারা তো কোন অপরাধ করেনি। তাদের একটাই অপরাধ হতে পারে, তারা নাসেরের নাস্তিক্যবাদকে অপছন্দ করে। তখন আপনার ফতোয়া কোথায় গিয়েছিল। নিরীহ মুসলমানদেরকে হত্যা করা কি মহাপাপ নয়?

আপনি কেন চুপ করে ছিলেন? আপনি যদি বলেন যে, সে ঘটনা সম্পর্কে আপনি অবগত নন, তাহলে আপনার এ কথা কেউ মানবে না। কারণ মিশরের প্রতিটি ব্যক্তি সেই মর্মান্তিক নির্যাতনের ব্যাপারে জানেন। তবে জনগণ চুপ ছিলেন। কোন প্রতিবাদ করেননি। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিলেন, নাসেরের গুণ্ডারা প্রতিবাদী কণ্ঠের টুটি চেপে ধরে। তাদেরকে জুতোর পিটুনি লাগায়। তাদেরকে জেলের অন্ধকার সেলে নিক্ষেপ করে। তাদের আরামকে হারাম করে দেয়। তাদের পুরো পরিবারের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতে থাকে। আরো কত কিছু যে তাদের সঙ্গে করে তার হিসাব নেই।

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, বর্তমানে জামাল নাসেরের প্রশাসন জেল এবং হাজতে মুসলমানদের ওপর কেমন নির্দয় ব্যবহার করে যাচ্ছে।

তাদের ওপর কত জঘন্য নির্যাতন চালাচ্ছে। এখানে যে শুধু ইখ্ওয়ানের কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাই নয়, তাবলীগী জামাত সহ বিভিন্ন গ্রুপের লোকদের ওপরও নির্যাতন চালানো হচ্ছে; যারা রাজনীতি সম্পর্কে মোটেও মাথা ঘামায় না।

মোটকথা, যারা আমাদের পবিত্র মাটিতে সত্যিকারভাবে ইসলামের খেদমত করছে, সবার ওপরই চলছে নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। এমন কি নাবালেগ শিশু ও মহিলাদেরকে পর্যন্ত এ জালেম সরকার রেহাই দিচ্ছে না। আপনি এগুলো জানেন না? আমাদের বিশ্বাস, অবশ্যই জানেন। আপনার কি উচিত ছিল না, নাসেরের এই জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, প্রতিবাদ করা, সত্যের জন্য প্রতিবাদী হওয়া। আপনি অন্যের তুলনায় এ বিষয়টি অবশ্যই বেশী জানেন যে, সত্যের বেলায় খামোশ কণ্ঠের মানুষকে বোবা শয়তান বলা হয়। এ হাদীসটি কি আপনি ভুলে গেছেন?

শায়খুল আজহারের কর্তব্য ছিল, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নিজের সেই বিবৃতিটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা, যা তিনি না ভেবে চিন্তে রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করেছেন, পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোকে দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে খোদাভীতি থাকার দরকার ছিল এবং তাঁকে ইয়াকীন করা দরকার ছিল যে, রিজিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। জীবন ও মরণ তারই হাতে।

শায়খুল আজহারকে খোদ আজহারের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতিই খেয়াল রাখা দরকার ছিল। তারই ওসীলায় তিনি মোটা অংকের বেতন পাচ্ছেন, দামী দামী গাড়ী পেয়েছেন। মানুষ ভক্তি ভরে তার হাত চুম্বন করে। আজহার যদি না হত, তাহলে তিনি এ সম্মান, এ সুযোগ-সুবিধা কোথায় পেতেন?

জামিয়া আজহারের ধ্বংস এবং তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার জন্য এটুকু প্রমাণই কি যথেষ্ট নয় যে, তার প্রধান শায়খুল আজহার নিজের অফিসে চুপ করে বসে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কিংবা সিভিল ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন, তাকে কোন্ ধরনের বিবৃতি দেয়া উচিত এবং কোন্ ধরনের উচিত নয় তা জানার জন্য।

শায়খুল আজহার সাহেব!

আপনার কর্তব্য ছিল, আপনার নির্যাতিত মুসলমান ভাইদের পক্ষ অবলম্বন করা। তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসা। নাসেরের জুলুম ও

নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নির্যাতিতের সমর্থন ও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো এবং বিশ্বের জনমতকে চাঙ্গা করা এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যেন সরকার মজলুম ও অত্যাচারিত লোকদেরকে আদালতে পেশ হওয়ার সুযোগ দেয়। সত্যের সমর্থনে আপনার কণ্ঠ উচ্চকিত করা উচিত ছিল এবং কারো তিরস্কারকে ভয় করা অনুচিত ছিল। যদি আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে সৎসাহস না পেতেন, তাহলে অন্তত পক্ষে আপনাকে খামোশ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু উল্টো আপনি জালেম, তাগুত, মুরতাদ ও মুনাফেক জামাল নাসের সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তাদের অন্যায় আচরণ, নিপীড়ন ও জুলুমবাজিতে আরো বেশী উৎসাহ দেয়ার জন্য আপনার কথা ও কলমকে ব্যবহার করেছেন, যেন তারা নিরীহ নিরপরাধ লোকদের রক্ত দিয়ে নিজেদের হাতকে আরো বেশী রঞ্জিত করে। আপনি আপনার বক্তব্য দ্বারা তাদেরকে আরো উত্তেজিত করেছেন, যেন তারা পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে সত্যের আওয়াজকে দাবিয়ে ফেলে।

জনাব হাসান মামুন! আপনি যে পথ ধরেছেন সেটা ইসলাম নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপথগামিতা, বাতিল ও মিথ্যা প্রেম বৈ কিছুই নয়। আপনি যে খাঁটি ইসলামের দাবীদার, আপনি আপনার কথা ও কর্ম দ্বারা বরং সেই খাঁটি ইসলামকে কলংকিতই করেছেন।

নিঃসন্দেহে আপনি অবগত রয়েছেন, বর্তমানে মিডিয়া, সংবাদপত্র ও চিন্তাজগত কম্যুনিস্ট ও নাস্তিকরা একচেটিয়া দখল করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মিশরের প্রতিটি বস্তুর ওপর তাদের পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিশেষ করে যখন ইখ্ওয়ান সহ ইসলাম-পছন্দ লোকদের দিয়ে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলো ভরে রাখা হয়েছে, তখন তো তাদের চরম উত্থানই বলা যায়।

আর ইখ্ওয়ানের বিরুদ্ধে আপনার বিবৃতি সরকারী পত্রিকায় যেদিন বের হয়, ঠিক সেদিন ঐ পত্রিকার চতুর্থ পাতায় এ খবরটি ছাপানো হয় ঃ

"দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সে দেশের বিশিষ্ট জননেতা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ইজাল হায়মানকে গ্রেপ্তার করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। তিনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যার ওপর দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন আইন প্রয়োগ করা হল। এ আইন অনুসারে সরকার যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই ১৮০দিনের জন্য হাজতে রাখতে পারে।"

শায়খুল আজহারের নলেজে আসা উচিত, ইজাল হায়মানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি কমিউনিস্ট। এ থেকে অনুমান করা যায়, একজন কমিউনিস্টকে ১৮ দিনের জন্য নজরবন্দ করে রাখায় মিশরের সরকারী পত্রিকাগুলো অস্থির হয়ে ওঠেছে। এ থেকে বুঝা যায়, আজ বিশ্বের কম্যুনিস্টদের মধ্যে কত গভীর সম্পর্ক বিরাজমান। তারা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা ও সমর্থনে কত অগ্রসর।

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার খবরটি নিয়ে বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা করতে চাই না। তবে এটুকু বলতে চাই, ঐ সংবাদটি পত্র-পত্রিকায় সে দিন ছেপেছে, যেদিন ইখ্ওয়ানের বিরুদ্ধে আপনার বিবৃতি ছেপেছে।

অথচ এক কমিউনিস্ট অন্য কমিউনিস্টের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য যেমন এগিয়ে আসে, আপনাকেও ঠিক তেমনি বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে আপনার মুসলিম ভাইদের সমর্থনে এগিয়ে আসা উচিত ছিল। সেই মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে অপদার্থ ও বেকুব, যে বাতিল শক্তির দালালী করে নিজের আখেরাতকে বিনষ্ট করে।

১৯৬৫ সন থেকে মিশরের মোনাফেক, কপট ও ইসলামের প্রচণ্ড শত্রু সরকার তার বাইরের মুরুব্বীদের আস্কারায় ইসলাম ও ইসলাম-পছন্দ লোকদেরকে নির্মূল করার জন্য যে জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, শায়খুল আজহারের করনীয় ছিল সেই মুরতাদী গোসলখানায় নিজেকে উলঙ্গ না করা। ফাসেক, পাপাচারী সরকারের দালালী করা থেকে তাঁর বিরত থাকা উচিত ছিল। এ জন্য যদি তাঁর প্রাণ বিসর্জনও দিতে হত, তিনি দিতেন। এর চেয়ে বড় মর্যাদা তাঁর জন্য আর কি হত। তিনি ইসলামের মহান ব্যক্তিদের মত ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকতেন। তাঁর জন্য সেই তাকওয়া ও পরহেযগারীর পথই অবলম্বন করা উচিত ছিল।

ফেতনার যুগের আরেকটি দিক

ডাক্তার সাহেবের কাহিনী বর্ণনা করছিলাম। কথা থেকে কথা বের হয়েছে। আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়েছে, পাঠক ভাইয়েরা হয়ত বিরক্তি বোধ করছেন। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ডাক্তার সাহেবের কাহিনীর মত আমাদের কাছে আরেকটি কাহিনী আছে। যার নায়ক হচ্ছেন আমাদের আরেক বন্ধু। তিনিও

আমাদের জেলখানার সঙ্গী। এ কাহিনীও কম মর্মপীড়াদায়ক না। সে বন্ধুর নাম হচ্ছে আমের।

যখন আমার সঙ্গী ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, আমি সে মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখছিলাম কেমনভাবে চাবুক ও ডাণ্ডা তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল, হিংস্র কুকুরগুলো শরীরের গোশ্ত কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছিল। আজ তক তার শরীরে সেই নির্যানের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে।

চরম নির্যাতনে তার গোঙ্গানী ও হৃদয়বিদারক আর্তচিৎকারের সাথে সাথে কুকুরের খেও খেও শব্দ এবং ডাণ্ডার শপাং শপাং আওয়াজ পরিবেশকে আরো নির্মম করে তুলছে। জল্লাদদের অট্টহাসি সেই নির্মমতা আরো বাড়াচ্ছে। এই অবস্থা চলতে চলতে অবশেষে ডাক্তার জুলুম সইতে না পেরে সে সবকথা স্বীকার করে নিজের জান বাঁচালেন, যা তিনি আসলে আদৌ করেননি।

তবে আমাদের অপর সঙ্গী আমেরের ওপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চলেছে, তা আমার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তিনি নিজে সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার কাছে জানতে পারলাম, তার গ্রেপ্তারীর মূল কারণ ইখ্ওয়ানের রোকন (সদস্য) আলি আসমাভী পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে বলে ফেললেন যে, আমেরও ইখ্ওয়ানের গুপ্ত সংগঠনের সদস্য। এ স্বীকারোক্তিই তার গ্রেপ্তারীর কারণ।

আলী আসমাভীর ব্যাপারে জানা গেছে, তিনি ইখ্ওয়ান বিষয়ে সরকারের পক্ষে রাজসাক্ষী হয়েছেন। তিনি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগের যে একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে সে ব্যাপারটাও ফাঁস করে দিয়েছেন।

তিনি হচ্ছেন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং পাঁচ সদস্যের কমিটির অন্যতম সদস্য। তার কাছ থেকে আমরা আদৌ এ ধরনের কিছু আশা করিনি। দোয়া করি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

(আলী আসমাভী সম্পর্কে এ বইয়ের লেখক আহমাদ রায়েফ যে মন্তব্য করেছেন, তা আসলে ঠিক নয়। আসলে আহমাদ রায়েফ বইটি কারাগারে বসে লিখেছেন। তিনি আসমাভীর ব্যাপারে আসল ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সে রকম সুযোগও তার ছিল না। আলী আসমাভী (রহঃ) ইখ্ওয়ানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রোকন ছিলেন। কারাগারে এনে তাঁর ওপর এমন

অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় যে, তিনি পাগল হয়ে যান। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ঐ অবস্থায় তদন্তকারী সরকারী গোয়েন্দা তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়ে নেয়। আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার সে স্বীকৃতির কোন মূল্য নেই এবং সেটা গ্রহণযোগ্যও নয়। কারণ তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।)

আমেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলে তিনি ইখ্ওয়ানের যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা জানতেন সব বলে দেন এবং তিনি ইখ্ওয়ানের সদস্য হিসেবে যা যা করতেন সব কিছু স্বীকার করে নেন। তার খেয়াল ছিল, এ স্বীকারোক্তির পর তাকে ন্যূনতম পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। কারণ, অপরাধ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান এ রকমই ছিল। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তারীর একমাস পর হঠাৎ মুক্তি দেয়া হয়। এ মুক্তির রহস্যও জেনে ফেললাম। তার এক ভাই গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরি করেন। শাম্স বাদরানের সঙ্গে রয়েছে তার সে ভাইয়ের গভীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক তার কাজে লেগে গেল। আমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন উত্তম কার্যনির্বাহক। এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের কামরার আরেকজন বন্দী হচ্ছেন, পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের লোক। ১৯৫৪ সালে যখন ইখ্ওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন এ যুবক এর সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সনে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং সামরিক আদালতে পেশ করা হয়। সামরিক আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। কিন্তু সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়নি। দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সবধরনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তার মাথায় একটা ধ্যানই চেপে বসল, কিভাবে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায়। সেটা বৈধ উপায়ে হোক কিংবা অবৈধ উপায়ে, যেভাবেই হোক। তার অভিনয় সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও তিনি অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। কিন্তু যেমনটি তিনি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। কেননা, তার মধ্যে অভিনয় করার স্বাভাবিক যোগ্যতা মোটেও ছিল না। কোন কোন সময় যদিও তিনি নাটক, ড্রামাতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু তার অভিনয় দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ের ছিল। আর তাও এক-দু মিনিটের বেশী

অভিনয় করার সুযোগ পেতেন না। যাহোক, জেল থেকে বের হওয়ার পর প্রায় দশ বছর তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করেন। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হল না। আরবী প্রবাদ অনুযায়ী, তিনি সমুদ্রে চাষাবাদ করলেন। এ সময় তিনি ধর্ম কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। তার কাছে দ্বীনের কোন গুরুত্বই থাকেনি। তবে কোন কোন সময় শুধু জুমার নামায আদায় করতেন, ব্যস্ এ টুকুই। রাজনীতির ব্যাপারে তো মোটেও মাথা ঘামান না।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস দেখুন, এত কিছু সত্ত্বেও একদিন সে যুবক নিজেকে জেলের নির্যাতন ক্যাম্পে নাসেরের জল্লাদদের সামনে দেখতে পেলেন।

জল্লাদরা তার ওপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। তিনি তাদের কাছে হাত জোড় করে, কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "ভাইয়েরা! আপনারা আমাকে কেন মারছেন? আমার তো ধর্ম কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। রাজনীতির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না। তারা মেরে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। এ ধরনের দুরবস্থা, এ ধরনের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি তিনি একা হচ্ছিলেন না। যাদেরকে তাদের ভাগ্য জেলখানায় টেনে নিয়ে এসেছে, সবার সে একই অবস্থা। তারা সন্তুষ্টচিত্তে কিংবা অসন্তুষ্ট চিত্তে জীবনের অন্য দিক দেখছিল। সে দিকটি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়াবহ, কষ্টদায়ক ও হিংস্রতা ও বর্বরতায় ভরপুর। জেনারেল হামযা বাসিওয়ানী ও তার মত অন্যান্য বদমাশ জল্লাদ প্রকৃতির সেনা অফিসারদের আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন-যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দোযখের মত লাগে। যারা ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং ইসলাম-প্রেমিক, তারা ঐ সব হায়েনার নির্যাতনের শিকার হওয়ার ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক ও বোধগম্য মনে হয়। কিন্তু যে সব লোক স্বতন্ত্র এবং যাদের কোন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক নেই কিংবা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেও না, এ ধরনের লোকেরাও তাদের জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

আমাদের সেলে যারা থাকেন তারা বিভিন্ন মেজাজের এবং নানান প্রকৃতির। একজনের স্বভাবের সঙ্গে আরেকজনের কোন রকম মিল নেই। এ সত্ত্বেও জেল কুঠুরীর এই ক্ষুদ্রজগতের মধ্যে, যেখানে সব সময় জল্লাদরা খড়গহস্ত, চাবুক ও ডাণ্ডা নিয়ে শাস্তি দেয়ার নানা আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত থাকে,

যেখানে সব সময় শাস্তি ও বর্বরতার অন্ধকার প্রলয় চলতে থাকে, সেখানে আমরা এ কয়জন মিলে মিশে থাকছি। সুযোগ বুঝে আমরা একজন আরেকজনের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করে যাচ্ছি। যদিও আমাদের শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও রুচির ক্ষেত্রে একজন আরেকজন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

যেমন, আমাদের আলোচনার প্রথম মানুষটির কাছে সব চেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে আল্লাহর স্মরণে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা। কুরআনের যে অংশ তিনি হেফজ করেছিলেন সেটা নামাযের মধ্যে পড়তেন। খুবই বিনয়াবনত হয়ে ও ধ্যানের সাথে পড়তেন। আল্লাহর মহব্বতে চোখ দিয়ে পানি ঝড়ত।

আমার সময়টাও তার সঙ্গে নামায ও তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম।

আমাদের দ্বিতীয় সঙ্গী নিজের ভালবাসা ও প্রেমের মধ্যে ডুবে থাকতেন। তিনি সুযোগ পেলেই তার প্রিয়া, তার প্রেমিকার বিভিন্ন কাহিনী আমাদেরকে শুনিয়ে মনের ব্যথা অনেকটা হালকা করতেন।

আমাদের তৃতীয় বন্ধু হচ্ছেন সেই গরীব, দুঃখী অভিনেতা। তিনি অনেক কাহিনী বলতেন। অভিজাত, বিত্তশালী ও ধনী লোকদের সাথে তার হৃদ্যতা ও ভালো সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক মনগড়া কাহিনী তিনি আমাদেরকে শুনাতেন।

আর চতুর্থজন হচ্ছি আমি এই অধম যে মিশরের মুসলমানদের ওপর নেমে আসা মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে সব সময় ভারাক্রান্ত ও অস্থির থাকে। আমার মস্তিষ্ক, আমার মানস সব সময়, কি হচ্ছে? কি হবে? এবং কেন হচ্ছে–এ সব নিয়েই বিভোর থাকে। আমি বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুবই শংকিত। মিশরের মুসলমান এবং এখানে ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত।

দশম অধ্যায়

রুশ পদ্ধতিতে তদন্ত

প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি তদন্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা সবাই কুঠুরীর পাকা মেঝেতে ঘুমাতাম। আমাদের কাছে অনেক ধেড়ে মোটা তাজা ইঁদুর নির্দ্বিধায় চলে আসত। আমরা অবশ্য মোটেও ভয় পেতাম না। তবে কোন কোন সময় এগুলো আমাদের শরীরে আচমকা কামড় বসিয়ে দিত। আমাদের একজন নতুন সঙ্গী-যাকে কিছুদিন হল আমাদের কুঠুরীতে ঠেসে দেয়া হয়েছে, ইঁদুরকে এমন ভয় করতেন, যেমন ভয় করতেন জল্লাদদের হান্টারকে। তিনি রাতে যখনই ইঁদুরের শব্দ পেতেন, ভয়ে ওঠে বসতেন এবং আমাদেরকে জাগিয়ে দোহাই দিয়ে বলতেন, যেন আমরাও তার সঙ্গে জেগে থাকি এবং সবাই মিলে তাকে ইঁদুর থেকে বাঁচাই। ইঁদুরের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার কোন উপায় খুঁজে পেতাম না। তবে যে সব গর্ত দিয়ে ইঁদুর ভিতরে ঢুকতো, সেগুলো আমাদের ছেঁড়াফাটা কাপড় দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ইঁদুরগুলো এত দুর্দান্ত ছিল যে, সব কাপড় কুচি কুচি করে কেটে আবার কুঠুরীর ভিতরে চলে আসত এবং যথারীতি ওদের তাণ্ডব চালাত।

খাবার বন্টন

আমাদের সেলের ভিতর একটা ছোট্ট টুকরী রাখা আছে। জেলাররা নিজেদের মর্জিমাফিক সামান্য কিছু খাবার এখানে রেখে যেত। নাস্তার সময়

শুকনো রুটি এবং চা, আবার কখনো বিদেশী পনির, কালো মধু ও বুটের ভর্তা পাওয়া যেত। তবে নাস্তার জন্য এগুলো প্রতিদিন একসাথে পাওয়া যেত না। এক একদিন এগুলোর কোন এক-আধটুকু পাওয়া যেত। অবশ্য দুধ ছাড়া চা সব সময় পাওয়া যেত। এখন এ সব কিভাবে ভাগ করে দেয়া হত তা একটু শুনুন।

যে দিন আমাদেরকে তা'মিয়া (মিশরের জাতীয় খাদ্য) দেয়া হত, সেদিন আমাদের চারজনকে মাত্র রুটির এক টুকরো দেয়া হত। আর যেদিন পনির দেয়া হত, তখন মাত্র রুটির এক টুকরার চতুর্থাংশ আমাদের সবার ভাগে পড়ত। বলাবাহুল্য, এ পরিমাণ খাবার একটা ছোট্ট বালকের নাস্তার জন্যও যথেষ্ট নয়। আমি আগে বলেছিলাম, আমাদেরকে নাস্তায় কালো মধুও দেয়া হত; কিন্তু তার অবস্থা এই, আমাদের চারজনকে মাত্র এক চামচ মধু দেয়া হত। এর সাথে এক চামচ চা ঢেলে দেয়া হত। দুপুর বেলায় আমাদেরকে রুটি দেয়া হত। দরজার নীচ দিয়ে ফাঁকা অংশ দিয়ে ঘরের ভেতর নিক্ষেপ করা হত। দু বেলার জন্য আমাদের চারজনকে মাত্র দেড়টা রুটি দেয়া হত। রুটি ভিজিয়ে খাওয়ার জন্য ছোট্ট একটা পেয়ালায় সামান্য একটু তরকারীও দেয়া হত। এক একদিন এক এক ধরনের তরকারী। কি ধরনের তরকারী তা চেনা মুশকিল ছিল। তবে ঝোলের মধ্যে কোন কোন সময় সামান্য বরবটি কিংবা সীম দেখা যেত। স্বাভাবিকভাবে এটাকে তরকারী বলা মুশকিল। স্বাদহীন। কিন্তু আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় এগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। পানির ব্যাপারটাও ছিল খুব করুণ। বিকালে খাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পর জেলখানার একজন সেপাই আমাদের কাছে এসে সেলের দরজা খুলত। আমরা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়তাম তাকে সম্মান দেখানোর জন্য। এটা আমাদের জন্য নির্দেশ ছিল। সেপাই আমাদের চারজনের জন্য একটা মগের এক চতুর্থাংশ পানি দিয়ে চলে যেত। গরমের মধ্যে পানির সমস্যাই ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক। তবু সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেকে পরিস্থিতির মধ্যে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলাম। এ ছাড়া তো কোন উপায়ও ছিল না।

কখনো কখনো আমাদের জন্য যতকিঞ্চিত ফলও আসত। প্রতিদিন সকালে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারার জন্য বাথরুমে যেতাম। বাথরুম হচ্ছে নীচতলায়।

নীচে নেমে বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের জন্য ছিল মারাত্মক

পরীক্ষার বস্তু। তার ভয়াবহতা এত মারাত্মক ছিল যে, পুরো রাত আমরা এ চিন্তায়ই অস্থির থাকতাম, ভোর বেলায় বাথরুমে যাওয়ার পরীক্ষা কিভাবে পার হব। যখন সকালে আমাদেরকে নীচে নিয়ে যাওয়ার জন্য গার্ড আসত, আমাদের ভিতরে ধড়ফড় শুরু হয়ে যেত। মুখ দিয়ে দোয়া বের হয়ে যেত, "হে আল্লাহ! সময়টা যেন সহজে পার হওয়া যায়।"

রাত-দিন আমাদের ওপর যত নির্যাতন চালানো হত, তার চেয়ে বেশী নির্যাতন করা হত সকাল বেলার টয়লেটে যাওয়ার মুহূর্তে।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমরা সব সময় ছটফট করতাম। যখন আমরা টয়লেটে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকের চরম ইচ্ছা হত যেন, ঝটপট করে কাজ শেষ হয়ে যায়।

মোটকথা, পলক পরার আগেই মল ত্যাগ শেষ করতে হবে। তা না হলে নিস্তার নেই। যে তাড়াহুড়ো না করবে, সে জন্য সেই দায়ী হবে, তার ভাগ্যে নেমে আসবে ভীষণ অমানবিক নির্যাতন।

পানি খাওয়ার বিষয়টিও ছিল অত্যন্ত জটিল। সে বন্দীই ভাগ্যবান, যে হাতের তালু দিয়ে অর্থাৎ আজলা ভরে পানি খাওয়ার সুযোগ পেত। সেটা পরিমাণে কমই হোক না কেন। এতে করে পুরো দিনের তৃষ্ণা মেটানোর সমস্যা অনেকটা লাঘব হত। অনেক কয়েদী রোযা রাখতেন। আবার অনেকে গার্ডদের চোখ বাঁচিয়ে বিদ্যুতগতিতে কলের কাছে পৌঁছে যেত এবং মুখ লাগিয়ে পানি খেতে থাকত। সে অবস্থায় তাদেরকে কলের মুখটা খুব শক্তভাবে ধরে রাখতে হত। তারা এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করত না, উটের মত পানি খেতে গিয়ে তাদের ওপর দিয়ে কোন্ তুফান বয়ে যাচ্ছে। কারণ, ততক্ষণে গার্ডদের এসব হতভাগা কয়েদীর প্রতি নজর পড়ে যেত এবং তাদেরকে এমনভাবে মারতে শুরু করত যে, তারা মরনের কাছাকাছি চলে যেত। অনেক বন্দীকেই এমন চালাকি করে পানি খাওয়ার কারণে বমি করে সে সব পানি আবার ফেলে দিতে গার্ডরা বাধ্য করত। সে বেচারারা জীবনের খাতিরে গার্ডদের নির্দেশ মানত। কারণ, তা না হলে মরণ অনিবার্য। যখন তারা বেহাল হয়ে সেলে ফিরে আসত, তখন দেখা যেত পানি খেতে গিয়ে হয়ত কারো মাথা ফেটে গেছে, কিংবা দাঁত ভেঙ্গে গেছে। সবাই কোন না কোন আঘাত অবশ্যই পেত।

জেল কর্তারা বন্দীদের গোসলের জন্য একটা দিন নির্ধারিত করে রেখেছিল। যদিও সে দিনটাকে "ইয়াওমে গোসল" (গোসল দিবস) বলা হত, কিন্তু আমরা বন্দীরা তাকে "কালো দিবস" বলতাম। সে দিন আমাদের ওপর চলত ভীষন অমানবিক নির্যাতন। অনেকে মারাত্মক আহত হত, বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হত। বেশীর ভাগ কয়েদী মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে যেত। এখানকার আইন হচ্ছে, প্রত্যেক কয়েদী ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যে গোসল সারবে। যারা এ সময়টুকুর মধ্যে গোসল করতে না পারবে তাদের নিস্তার নেই।

সামরিক জেলখানায় শুরুতে আমরা কাপড় সহ গোসলখানায় যেতাম। গোসলখানায় গিয়ে কাপড় খুলতাম। কাপড় পুরো খুলতেও সারতে পারতাম না যে, আমাদের ওপর বেধড়ক ডাণ্ডা বর্ষন শুরু হয়ে যেত। আমরা মার সহ্য করতে না পেরে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসতাম। আমরা পানি দিয়ে কি গোসল করব! আমাদের রক্ত দিয়েই আমাদের গোসল হয়ে যেত। আমরা গোসল থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম। কিন্তু জেলখানার হায়েনারা আমাদেরকে মারাত্মকভাবে পিটাত। লাঠি দিয়ে, বুট দিয়ে লাথি মেরে, যে যে ভাবে ইচ্ছে, নির্যাতন চালাত্। আমাদেরকে গোসল করতে বাধ্য করত। আমাদেরকে উলঙ্গ হতে বাধ্য করত। সেপাইরা এ দিনটাতে আমাদের ওপর নির্যাতনের উৎসব পালন করত।

গোসলখানার অবস্থাও ছিল খুব করুণ। অধিকাংশ সময় সেখানে পানি থাকে না। এ অবস্থায় আমরা জেলখানার আঙ্গিনার কূপ থেকে পানি ওঠাতাম এবং যে পটে প্রস্রাব করতাম, সেটা ভরে নিতাম। কাজটা কঠিনও ছিল এবং বিপজ্জনকও বটে। যে সকালে আমাদের গোসল করতে হত, তার আগের পুরো রাত আমরা পরিকল্পনা করতে করতে কাটিয়ে দিতাম যে, সকালে আমরা কোন্ বিপদের সম্মুখীন হব এবং সেটা কিভাবে মোকাবেলা করব এবং দিনটা কিভাবে পার করলে আমাদের ক্ষতি কম হবে এবং কষ্ট কম পাব।

যেমন, আমাদের পরিকল্পনাগুলো এমন হত, অমুক বিদ্যুতগতিতে কূপের কাছে যাবে এবং রবারওয়ালা পাত্রটা ভরে আনবে, অমুক তার কাছ থেকে পানির পাত্রটা নিয়ে নেবে এবং যে গোসলখানায় কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে দিয়ে দিবে। সে লোক চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে গোসল সেরে বিদ্যুতগতিতে নিজের সঙ্গীর জন্য পানি আনবে।"

রাতের দীর্ঘ সময় আমরা পরিকল্পনার মধ্যে কাটিয়ে দিতাম এবং প্রত্যেকের ডিউটি ঠিক করা ছিল, যাতে সময় মত কোন ধরনের ভুলভ্রান্তি না হয়।

অধিকাংশ বন্দীরই অল্প সময়ের ভিতর পায়খানা-প্রস্রাব সারার মত অভিজ্ঞতা ছিল না। এর জন্য ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন ছিল। আমরা কিছুদিনের মধ্যে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিই। আমাদের কোন সঙ্গী যখন টয়লেট থেকে ঘরে ফিরে আসত, তখন তার কাছে আমরা সবাই জিজ্ঞেস করতাম, সে তার প্রয়োজন সারতে পেরেছে কি না?

আমরা সে দিন নিজেদেরকে খুব ভাগ্যবান মনে করতাম, যেদিন আমরা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন সারতে পারতাম। যখন কোন সঙ্গী টয়লেট সারতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে কুঠুরীতে ফিরে আসত, তার মুখখানা মলিন হয়ে যেত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের এমন অবস্থারই মুখোমুখি হতে হত। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতাম এবং পরের দিনের সূর্য উঠা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতাম। কিন্তু পরদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরা যে তার জন্য কত কঠিন তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

কুঠুরীর বাইরে কোন ধরনের কথাবার্তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। যদি সেপাইরা কোন বন্দীকে তার সঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখত, তখন তার আর রেহাই ছিল না। তাকে অন্তত একশ ডাণ্ডার আঘাত খেতে হত। ডাণ্ডা মারতে গিয়ে সেপাই জোশে ডাণ্ডার বারি গুনে দেখত না। সে জন্য অধিকাংশ সময় দেখা যেত, সে পাঁচ শ'রও বেশী ডাণ্ডার বারি দিয়েছে। আর সে কারণেই কুঠুরীর বাইরে যখন দু কয়েদী আপসে মিলত, তখন তারা ইশারা-ইংগিতে সালাম-দোয়া করত। সেটার নিয়ম ছিল এ রকম, প্রত্যেকেই তার চোখের ভ্রূ উপর নিচে কুঞ্চিত করত, সালাম দেওয়ার জন্য ভ্রূ ওপর এবং উত্তর দেওয়ার জন্য ভ্রূ নীচে কুঞ্চিত করা হত। এ বিরল পদ্ধতিতে সালাম দেয়া-নেয়ার পর যখন কয়েদীরা কুঠুরীতে ফিরত, তখন হাসতে হাসতে তারা গড়িয়ে পড়ত।

এখানে হাসির কি অর্থ হতে পারে! আসলে, এ হাসি হচ্ছে নাসেরের জেলারদের মানবাধিকার লংঘনের প্রতি ধিক্কারস্বরূপ।

আশ্চর্য বিষয়!

মনে হচ্ছে, মিশরের এমন দিনগুলোতে জেলখানার ভিতরের জগতই

হচ্ছে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ। কুঠুরী হতে বের হওয়া মানে আযাবকে আমন্ত্রণ জানানো। শাস্তি দেয়ার জন্যই সেল থেকে বের করা হয়। এ শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে অনেক লোক নিজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে। কারোর চোখদুটো গালিয়ে দেয়া হয়েছে। কারোর পায়ের আঙ্গুল করাত দিয়ে কেটে দেয়া হয়েছে। আবার অনেকের হাত দুটো হাতুরি দিয়ে পিটিয়ে ছেঁচে দেয়া হয়েছে। এ সব জেল সেপাই আর বন্য জন্তুর মধ্যে কি পার্থক্য আছে! কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কয়েদীরাই শুধু নির্যাতনের শিকার হতাম না, বরং যারা দিন ভর আমাদেরকে পিটাত, নির্যাতন করত, রাত হলে তাদেরকেও মেরামত করা হত। কামরার দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা উঁকি দিয়ে দিনের বেলার জল্লাদদের মার খাওয়ার দৃশ্য দেখতাম। রাত শুরু হওয়া মাত্রই তাদের ওপর ধোলাই শুরু হত এবং ফজর পর্যন্ত তা চলতে থাকত।

ফজরের সময় একজন সেপাইকে পাঠানো হত। সে জেলখানার তিন শটি সেলের ভেতরের বন্দীদেরকে টয়লেটে যাওয়ার ঘোষনা দিত এবং এক ঘন্টার ভিতর রিপোর্ট করত, বন্দীরা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন সেরেছে কিনা–সে বিষয়ে!

সেপাইটি পাগলা কুকুরের মত দৌড়ে এসে আমাদেরকে বেপরোয়াভাবে পিটাতে শুরু করত। উদ্দেশ্য হল যেন নির্ধারিত সময়ের ভিতরই সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

অধিকাংশ সময়ই দেখা যেত, সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, এক ঘন্টার মত এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো লোকের পায়খানা-প্রস্রাব সম্পন্ন করানো মোটেও সম্ভব না। আর মিথ্যে বলারও সুযোগ ছিল না। কারণ, তার কাজের তদারকির জন্যও লোক নির্ধারিত ছিল। ব্যর্থ হওয়াতে সে সেপাইটির নাম অপরাধীদের তালিকাভুক্ত করা হত। এ জন্য তাকে রাতের বেলায় শাস্তি দেয়া হত।

ঠিক তেমনি, যে সেপাই নাস্তা বন্টন করত, তার যিম্মাদারী ছিল পুরো জেলটিতে একঘন্টার মধ্যে নাস্তার কাজ সারাবে। তা না হলে তাকেও অপরাধীদের সাথে শামিল করা হত এবং রাত তার জন্য ভয়াবহ নির্যাতনের বার্তা নিয়ে আসত। এ সব কারণেই জেল সেপাইরা আমরা কয়েদীদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত। কারণ তারা মনে করত, তাদের ওপর বিপদ আসার

জন্য আমরাই দায়ী। এ জন্যই তারা খুব বেপরোয়াভাবে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করত; তারা হয়ে ওঠত ভয়ংকর হিংস্র, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা ঝটপট আমাদের কাজ সেরে নিই।

সামরিক কারাগারে কয়েকজন জল্লাদ আছে, যারা অতি কুখ্যাতি অর্জন করেছে। যেমন, সামবো, রুবি, নুবি ও জগলুল। একজন সেপাই অত্যন্ত বদমেজাজী ও হিংস্র প্রকৃতির ছিল। আমরা তাকে কুখ্যাত ইংরেজ জল্লাদ চার্লস হাতুড়ার নামে নাসেরী হাতুড়া বলতাম। তার হাত দুটো এতই অনুভূতিশূন্য এবং মানবতা বোধশূন্য ছিল যে, যার মুখের ওপর তার হাত গিয়ে পড়ত, সে হতভাগা আর পানি খেতে পারত না। জেলখানার নির্মম পরিবেশে কত বন্দী যে এ লোকটার হাতে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। কত সুস্থ্য-সবল লোক লোলা হয়ে বের হয়েছে।

সামরিক জেলখানায় শাস্তি দেয়ার জন্য স্বল্পবুদ্ধি ও গোঁয়াড় প্রকৃতির সেনাদেরকে নিয়োজিত করা হত। এরা হচ্ছে এমন সব আর্মি সদস্য, যারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে ফেল করেছে। যারা দয়া কি জিনিস চেনে না। তারা শুধু গোয়ার্তুমি ও বর্বরতাই চেনে। এ ধরনের হিংস্র পশুর সাথে আপোষমূলক কথা বলা কিংবা তাদের কাছে অনুকম্পা আশা করা শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভব। তবে কিছু এমন ধরনের সেপাইকেও এখানে ডিউটিতে লাগানো হয়েছে, যারা প্রথম প্রথম সৎ ছিল। গ্রামের সরলতা ও মানবতা তাদের চেহারায় খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই এখানকার ভয়ংকর বর্বর ও নির্যাতনের পরিবেশে থেকে তারাও হিংস্র দানবে পরিণত হয়ে ওঠত।

আহমাদ আবু ওয়াদ্দান ছিল একজন নেককার, সরল ও মানবতাবাদী সেপাই। সে ফজরের নামাযের পর কেঁদে কেঁদে খুবই কায়মনোবাক্যে দোয়া করত ঃ

"হে আল্লাহ! আমার এসব মজলুম, নিরীহ বন্দী ভাইদেরকে আযাব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দাও।"

কিন্তু আমরা একেও দেখেছি, পরবর্তীতে সে কিভাবে হিংস্র হায়েনা হয়ে গেছে। জালেম ও পাষানহৃদয় বনে গেছে। আমার মনে আছে, একদিন সে সেলের দরজা ভেঙ্গে আমাদেরকে পিটিয়েছিল। দরজার কাঠ দিয়ে আমাদেরকে এমন বেদমভাবে পিটিয়েছিল যে, কাঠগুলো ভেঙ্গে টুকরো

টুকরো হয়ে গেছে। তবে সময়ের সাথে সাথে আমরা কিছু সেপাইদের সাথে ভাব জমাতে সক্ষম হই। তাদের ব্যবহারে কিছুটা হলেও নম্র আচরণ প্রকাশ পেত। আমাদের এক সঙ্গী বুদ্ধি খাটিয়ে কৌশলে জগলুলকে অনেকটা হাত করে ফেললেন। আরেকজন নুবির সাথে খাতির জমালেন। তবে সামবু সেপাইটা খুবই শক্তপ্রাণ ও পাষানহৃদয় মনে হল। আমাদের অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান বন্ধুরাও অনেক কৌশল করেও তাকে বশে আনতে পারল না। উল্টো ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হচ্ছে যে, তাকে প্রমোশন দিয়ে সেপাই থেকে হাবিলদার বানিয়ে দেয়া হয়। তখন তো আমাদের অবস্থা আরো চরম হয়ে গেল।

সামরিক জেলখানার দিনগুলো তিক্ততা ও কঠোরতা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে জেল-জীবন হিসাবে "আনন্দমুখর" সময়ই মনে করা যায়। আমরা আমাদের অবকাশের সময়গুলো ইবাদত, ইস্তিগফার ও কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছিলাম। আমাদের যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে সে বিষয়ে আমরা আমাদের সঙ্গীদের সামনে লেকচার দিতাম। নিজেদের অভিজ্ঞতার সারকথা উপস্থাপন করতাম। যেমন সেল নম্বর ২১০-এর কথা ধরুন। এখানে বন্দীদের মধ্যে রয়েছে একজন ডাক্তার। তিনি প্রতিদিন আমাদের সামনে ডাক্তারী বিদ্যা সম্পর্কে লেকচার দিতেন। কোন্ উপসর্গ কেন দেখা দেয় এবং তার চিকিৎসা কিভাবে করতে হবে–এ সবকিছুই তিনি বলতেন। কলেজে তিনি এ বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই তিনি লেকচার দিতেন। আমি বিশদভাবে আলোচনা করতাম। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতাম। আরেক বন্ধু আইন সম্পর্কে বলতেন। আবার কেউ কুরআনের তাফসীর পেশ করতেন। কেউ হাদীস সম্পর্কে বলতেন। আবার কেউ ফিক্‌হ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) সম্পর্কে লেকচার দিতেন। আমার মনে আছে, জেলখানার একটা কুঠুরীতের একজন মুচিও বন্দী ছিলেন। তিনি আমাদেরকে চামড়া কত রকমের হয় এবং কোন্ চামড়া ভাল ও কোন্টা নিম্নমানের এবং তা চেনার উপায় কি–এসব ব্যাপারে আমাদেরকে বলতেন।

জেলখানার কালো রাতগুলো

জেলখানার কালো রাতগুলোর বেশীর ভাগ সময় আমরা দিনের বেলার অবস্থা ও ঘটনা বর্ণনা করে এবং এগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে কাটাতাম।

আমাদের মানসিক অবস্থার এতই বিপর্যয় ঘটেছিল যে, আমার মনে আছে, অনেক সময় আমরা এত বেশী হাসতাম, মনে হত আমাদের পাঁজর ভেঙ্গে পড়বে। আমরা সব কিছু নিয়েই হাসাহাসি করতাম।

তদন্তকারীদের কথা তদন্ত করার মুহূর্তে তাদের বিভিন্ন আচরণ নিয়ে আমরা ব্যঙ্গ করতাম। তারা যে "তদন্ত কোর্ট" প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, সেটা নিয়ে উপহাস করতাম। এরপর আমরা হিসাব করতাম, কে কতদিন জেলে থাকবে। আমাদের এক বন্ধুকে আমরা রেডি করে রেখেছিলাম, যেন সে সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বাইরে যে সামান্য আলো জ্বলছে, সে আলোয় রাস্তার ওপর দৃষ্টি রাখে। সে যেন চলন্ত ট্রাম দেখে এবং আধুনিক মিশরের আবাসিক এলাকা দেখে। দীর্ঘক্ষণ মিটিমিটি আলোয় এভাবে বাইরে উঁকি মারত। কিছু দেখার চেষ্টা করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখে বিষন্নতার ছাপ নিয়ে চোখের কোণ ভিজিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ত।

কি হচ্ছে এ ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। পত্রিকা পড়াও ভাগ্যে জুটছে না। রেডিও শুনতে পাচ্ছি না এবং কোন আপনজনের সাথে সাক্ষাত নেই। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগের কোনই উপায় নেই। কখনো কখনো আমরা ঘটনাক্রমে টয়লেটের কাছে পরে থাকা পুরনো ছেঁড়া-ফাটা পত্রিকার টুকরো উঠিয়ে নিতাম এবং এর অসম্পূর্ণ লেখাগুলো পড়ে মনে কিছুটা তৃপ্তিবোধ করতাম।

কারাগারে বিভিন্ন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ত, যার অধিকাংশই দেখা যেত আসলে অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল সে সব মজলুমকে আত্মপ্রবঞ্চিত করার এক উপকরণ, যাদেরকে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। যাদের থেকে আনন্দ ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমি আমাদের সেলের বন্ধুদের সঙ্গে সে সব সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতাম, তদন্ত করার মুহূর্তে আমরা যেগুলোর মুখোমুখী হতে পারি। সে সময় আমাদেরকে যে সব প্রশ্ন করা হবে সেগুলোসহ এর উত্তর কিভাবে দেব, মগজ খরচ করে এ সব প্রশ্নোত্তরের সমাধান দিতাম।

যদি কোন সেপাই কাগজ হাতে নিয়ে জেলখানায় ঢুকত, তখন সকলের মনেই ভীতি ছড়িয়ে পড়ত। সবার অন্তর দুরুদুরু করত। কারণ, এ কাগজে সে সব লোকের নাম লেখা আছে, যাদেরকে তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে,

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যখন সেপাইটা সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে কাগজে লেখা নামগুলো পড়ত, তখন আমাদের সেই সঙ্গী, যাকে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা জানার জন্য আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম, দরজার ছিদ্র দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে সেই সিপাইয়ের দিকে তাকাত এবং তার ঘোষনা শুনে আমাদেরকে জানাত। আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার পেছনে এসে বসে পড়তাম।

আমাদের সঙ্গী যদি সেপাইকে ডান দিকে ঘুরে যেতে দেখত, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতাম, সে সামনে কোথাও যাচ্ছে এবং আমাদের তলব করা হয়নি। এ যাত্রা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আরেকদিনের কথা। সেদিন আমাদের সঙ্গী ডাক্তার (যার সম্পর্কে বিস্তারিত আগেই আপনারা পড়েছেন) দরজার ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঁকি দেয়ার ডিউটি দিচ্ছিলেন। বাইরে যা কিছু দেখা যাচ্ছিল, সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে বলে যাচ্ছিলেন।

"ও ভাই, সেপাইটা তো আমাদের দিকেই তাকাচ্ছে। বার বার আমাদের ঘরের দিকে দেখছে। এখন সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আজ আমাদের ঘরের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হবে।"

আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। কারণ, সিরিয়াল অনুযায়ী এখন আমাকেই তদন্তের মুখোমুখী হতে হবে। আমি তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেপাই একেবারে কাছে এসে পৌঁছল। সেলের দরজা খুলে গেল। সেপাই আমার নাম ধরে ডাক দিল। আমি জেলখানার নির্দেশ মোতাবেক ক্ষণিকের মধ্যে ঝটপট করে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলাম। ৬নং ষ্টোরের কাছে পৌঁছে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, যেন সেপাইরা বাকী লোকগুলোকে একত্র করে, যাদেরকে তদন্তের জন্য ডাকা হয়েছে। অপেক্ষা করার মুহূর্তে যে সব সেপাই আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তারা আমার দিকে না তাকিয়েই প্রচণ্ড শক্তিতে এক একটি ঘুষি বসিয়ে দিচ্ছে। যখন কাঙ্খিত সংখ্যা পুরো হল, তখন আমাদেরকে হান্টার দিয়ে পেটাতে পেটাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার অফিসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুঃখের বিষয় এ নির্যাতন নতুন না। এটা আমাদের জন্য কোন নতুন বিষয় ছিল না।

তদন্ত অফিসগুলোর দৃশ্য

যে সব অফিস জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহার হয়, সেখান থেকে আর্তচিৎকার, বিলাপ ও গোঙ্গানীর আওয়াজ ভেসে আসছে। হান্টার ও ডাণ্ডা

মারার কানফাটা শব্দ শুনা যাচ্ছে। আমাদেরকে মাটিতে বসিয়ে দেয়া হল। আমাদের মুখ দেয়ালের দিকে। সেজন্যই আমরা আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের পালা আসা পর্যন্ত আমাদেরকে এভাবেই বসার নির্দেশ ছিল। যখনই আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হত আমাদেরকে এভাবেই জমিনের ওপর দেয়ালের দিকে মুখ করে বসিয়ে দেয়া হত। আমরা পুরো দিন, পুরো রাত বসে থাকতাম। এমন কি আমাদের স্নায়ুশক্তি লোপ পেয়ে বসত। এ রকম চরম অবস্থায়ই আমাদেরকে তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজির করা হত।

সামরিক গোয়েন্দা অফিসাররা কঠোরতা ও অমানবিক আচরণের দিক দিয়ে সিভিল গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের চেয়ে কয়েকগুণ আগে বেড়ে ছিল। সে কারণেই দেখা গেছে, মিলিটারী গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিভিল গোয়েন্দাদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী লোককে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

সামরিক গোয়েন্দা অফিসারদের নিয়ম ছিল অভিযুক্তদেরকে প্রথম প্রথম তারা শুধু ভীতি প্রদর্শন করত। যদি ভীতি প্রদর্শনে কাজ না হত, তখন তারা চাবুক ও ডাণ্ডা মারার প্রিয় খেলায় মেতে ওঠত। এত বেশী টর্চারিং করত যে, বেশীর ভাগ বন্দীই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

তদন্তকারী জল্লাদদের নির্যাতনের আরেকটা পদ্ধতি ছিল লোহার রড দিয়ে বন্দীদেরকে গরম স্যাঁকা দেয়া। এ রডগুলো অবিকল কাবাব বানানোর শিকের মত। এগুলো যখন আগুনে পুড়ে দগদগে লাল হয়ে যেত, তখন আল্লাহর প্রেমিকদের শরীরে চেপে ধরে এগুলো ঠাণ্ডা করা হত! বিদ্যুতের শক্ দিয়েও শাস্তি দেয়া হত। প্রতিটি তদন্তকারী অফিসারের সামনে বিদ্যুতের নাঙ্গা তার রাখা আছে। অফিসাররা বন্দীদেরকে নির্দেশ দিত কারেন্টের নাঙ্গা তার হাত দিয়ে ধরতে। যদি তারা ভয়ে তার না ধরত, তাহলে মানুষখেকো ট্রেনিং দেয়া হিংস্র কুকুর তাদের ওপর লেলিয়ে দেয়া হত। কুকুরগুলো তাদেরকে বাধ্য করত বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করতে। শাস্তি দেয়ার জন্য কুকুরও ব্যবহার করা হত। হয়ত এমন একজনও ভাগ্যবান পাওয়া যাবে না, যার শরীরের মাংস কুকুর ছিঁড়ে খায়নি। মজলুম বন্দীদেরকে উলঙ্গ করে প্রথমে নর্দমায় ফেলে দেয়া হত এবং তাকে নর্দমার মলমূত্রের পানি খেতে বাধ্য করা হত। এরপর ঐ উলঙ্গ অবস্থাতেই তাকে হিংস্র কুকুরগুলোর সামনে নিক্ষেপ করা হত!

চাবুক ও ডাণ্ডা মারার জন্য বন্দীকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হত। অর্থাৎ

মাথা নীচে এবং পা ওপরের দিকে। এরপর ডাণ্ডা ও চাবুক পেটানোর বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। চারজন শয়তান প্রকৃতির জল্লাদ এ জঘন্য কাজ করত। আর এসব বর্বর কর্মকাণ্ড ও পাশবিক নির্যাতন তিনজন বড় ইবলীসের ছত্রছায়ায় করা হত। এরা হল ১. জেনারেল ছাআদ জগ্‌লুল, ডাইরেক্টর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স। ২. জেনারেল হামজা বাসিওয়ানী-আই. জি. সামরিক জেলখানাসমূহ। সে হচ্ছে, মিশরের সবচেয়ে বড় জল্লাদ। ৩. শামস্ বাদরান। সে হচ্ছে ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমেরের অফিস সেক্রেটারী।

আমি তদন্তের অপেক্ষায় যেখানে বসে আছি, ওখানে বসে থেকে আড় চোখে অনেক লোককে তদন্তের ভয়াবহ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে দেখছিলাম। তাদের বিবৃতি শুনছিলাম। এক বন্দীকে দেখলাম, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হল। লোকটাকে আমি চিনি না।

তদন্ত অফিসার জিজ্ঞেস করল ঃ

"তোমাকে কি জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে?"

বন্দী প্রত্যুত্তর করল ঃ

"আমি তার কারণ জানি না।"

উত্তর শোনামাত্রই সে বেচারাকে উল্টো করে ঝুঁলিয়ে দেয়া হল এবং নির্দয়ভাবে ডাণ্ডা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করা হল। এরপর আবার তাকে সেনা অফিসারের সামনে হাজির করা হল। আবার একই প্রশ্ন করা হল। সে এবারও সেই একই উত্তর দিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর এভাবে অমানবিক নির্যাতন চালানো হল। যখনই তাকে গ্রেপ্তারীর কারণ জিজ্ঞেস করত, সে বলত, "আমি কিছুই জানি না।" এ উত্তরের সাথে সাথে তাকে পা ওপর দিকে বেঁধে মাথা নীচ দিকে করে ডাণ্ডা ও চাবুক দিয়ে প্রচণ্ড পেটানো হত। সন্ধ্যার দিকে তার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ল যে, হয়ত সে মারাই যাবে। অবশেষে তদন্তকারী অফিসারই তাকে বলল ঃ

"তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারণ তুমি ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন-এর সদস্য এবং ইসলামকে ভালবাস।"

মোটকথা, যে ব্যক্তিই সেনা গোয়েন্দাদের তদন্তের মুখোমুখী হচ্ছে, তার জন্য একান্ত জরুরী কাজ হচ্ছে, শুরুতেই সে যেন স্বীকার করে নেয় যে, সে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমূন-এর গুপ্ত শাখার সদস্য। এইটুকু স্বীকার করে নিলে সে প্রাথমিক শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

বিস্ময়কর দৃশ্য

আমি অপেক্ষা করতে গিয়ে এও দেখলাম, একটা সুন্দর ও দামী কার–ওপরে আর্মি-ফ্লাগ ফিট করা আছে, জেলখানার আঙ্গিনায় ঢুকল। গাড়িটা ঢুকামাত্রই টাওয়ারে সতর্ক পাহারায় দাঁড়ানো সান্ত্রীরা সামরিক অভিবাদন জানাল। গাড়ী থেকে উচ্চপর্যায়ের একজন সেনা অফিসার নামলেন। তিনি হয়ত কোন ব্রিগেডিয়ার হবেন, না হয় কোন মেজর জেনারেল। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন দেখলাম, জেলখানার চীফ ওয়ার্ডেন সাফওয়াত রোবী সেই সেনা অফিসারের কাছে এসে হঠাৎ তার মুখের ওপর প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে দিল। ঘুষি খেয়ে সেনা অফিসার শিশুর মত কাঁদতে লাগল। এরপর তার কাঁধ থেকে সমস্ত সেনা ব্যাজ সাফওয়াত নামিয়ে ফেলল এবং তাকে উল্টো ঝুঁলিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে পায়ের ওপর উপর্যপুরি আঘাত হানতে লাগল। হয়ত পরে তাকে সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, এরপর আমি তাকে আর কখনো দেখিনি।

যায়নাব আল-গাযালীর মর্ম বিদারী চিৎকার

আমি ওখানে হাযেন যায়নাব আল-গাযালীকেও দেখলাম। তাঁর বুকফাটা চিৎকার ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে এখনও ভেসে আসছে। জল্লাদরা এই মহীয়সী মহিলাকেও ক্ষমা করেনি। তাঁকে উল্টো ঝুঁলিয়ে তাঁর পায়ের ওপর মারাত্মকভাবে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিল। আমাদের সেই বোন আঘাত সহ্য করতে না পেরে এমনভাবে বিলাপ করছিলেন, যে কেউ তাঁর সেই করুণ কান্না শুনবে, তার হৃদয় চুরচুর হয়ে যাবে। আর্তচিৎকারের মাঝে মাঝে তিনি কালিমায়ে তায়্যিবার যিকির করে যাচ্ছেন। কোন পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। আবার যখন জ্ঞান ফিরে আসত, তিনি নিজেকে বলতেন ঃ

"যায়নাব, তুমি হযরত সুমাইয়া (রাযিঃ) থেকে উত্তম না।" (হযরত সুমাইয়া হচ্ছেন মহানবীর সেই মহিলা সাহাবী, যাকে পাষণ্ড আবু জাহ্ল লজ্জাস্থানে তীর ছুঁড়ে হত্যা করে এবং তিনিই হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ।)

কি জঘন্য দৃশ্য ঃ মহিলারা পুরুষদের ওপর চড়ে বসেছে!

এ অধম (লেখক) তদন্তকারীদের হাতে আরেকটা অবিস্মরণীয় দৃশ্য

দেখেছে। আমার বন্দী জীবনের এটা হচ্ছে সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য। সেই দৃশ্য দেখে আমার মুখ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এসেছিল, "হায়, আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন।" দৃশ্যটির সারমর্ম মনের ওপর পাথর রেখে বর্ণনা করার সাহস দেখাচ্ছি ঃ

"জেলখানার প্রাঙ্গণে আচম্বিতে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয়ে গেল। পুলিশের অনেকগুলো গাড়ী ভিতরে ঢুকল। গাড়ীগুলো ঠাসাঠাসি করে ভর্তা। যখন গাড়ী থেকে লোক নামছে, তখন দেখা গেল, এ নতুন দলে পুরুষদের সাথে মহিলা বন্দীও অনেক আছে। এরা সবাই হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের মানুষ। সব পুরুষকে চতুষ্পদ জন্তুর মত দু'পা ও দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হল। এরপর মহিলাদেরকে হুকুম করা হল পুরুষদের পিঠে চড়ে বসার জন্য। মহিলারা পুরুষদের পিঠে চড়ে বসলে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল দৌড়ানোর জন্য। ইতোপূর্বে পুরুষ ও মহিলা সবাইকে বিবস্ত্র করা হয়েছে। দৌড়ানোর নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে পুরুষ ও মহিলা সবার ওপর জেলখানার জল্লাদরা নির্দয়ভাবে চাবুক ও ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে লাগল। সব জায়গা থেকে শুধু শপাং শপাং চাবুকের শব্দ ভেসে আসছে। পুরুষরা মহিলাদেরকে পিঠে চড়িয়ে পাগলের মত এদিক-ওদিক পালানোর চেষ্টা করছে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। তারা বিলাপ করছে, জীবজন্তুর মত চিৎকার করছে! সে এক কিয়ামতের দৃশ্য। পুরো জেলখানা এ ঘটনায় কেঁপে ওঠছে। পাঁচশ পুরুষের পিঠে পাঁচশ মহিলা! মানবতা চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত! এ দৃশ্য কত যে মর্মবিদারক, তা না দেখলে কল্পনা করা যাবে না। শুধু শুনে এর ভয়াবহতা আঁচ করা যাবে না। এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখলাম। এ এক হাজার মানুষ মিশরের কোন্ বদনসীব পল্লী এলাকার জানেন? এরা হচ্ছে কারদাছা গ্রামের নিবাসী।

কারদাছা গ্রামের কাহিনী

কারদাছা গ্রামটা আল জাজিরা জেলায় অবস্থিত। ইখ্ওয়ান সহ ইসলাম প্রেমিক লোকদের বিরুদ্ধে যখন সামরিক অভিযান শুরু হল, তখন সামরিক জান্তা সবচেয়ে প্রথমে কারদাছা গ্রামের জনৈক ইখ্ওয়ান সদস্যকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল। আল্লাহর লীলাখেলা দেখুন! যে লোককে ধরার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার বিয়ে এমন এক তরুণীর সাথে হয়েছে, যার ওপর

মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারের কুদৃষ্টি ছিল এবং সে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটা গোয়েন্দা অফিসারকে বিয়ে করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং ইখ্‌ওয়ানের সেই যুবককেই বেশী পছন্দ করে তার দ্বীনদারীর কারণে। এ ঘটনায় সেনা অফিসারটির মনে তাদের বিরুদ্ধে চরম আক্রোশের সৃষ্টি হয়।

যখন সেই ইখ্‌ওয়ান সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হল, তখন সেই সেনা অফিসার এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। সে চেষ্টা তদবীর করে উপরস্থ সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তার প্রতিপক্ষ ইখ্‌ওয়ানীকে ধরার অভিযানে যাবার অনুমতি আদায় করল।সে দু'জন সেনা সদস্য নিয়ে কারদাছায় গিয়ে হাযির হল। ইখ্‌ওয়ানীর ঘরের দরজায় তারা নক করল। যুবক সে সময় ঘরে ছিল না। সেনা অফিসারটি তার সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দিল তার স্ত্রীকে পণবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার করার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী নিজেকে ধরা না দেবে, তাকে ছাড়া হবে না। গ্রামের লোকেরা ইখ্‌ওয়ানীর স্ত্রীকে পণবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তারের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে গেল। তারা সেনা অফিসারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করল। ঘটনাস্থলে অনেক লোক জমে গেল। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করছে। সেনা অফিসার অনড়ভাবে বলল, তারা অবশ্যই ইখ্‌ওয়ানীর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বাধ সাধলো, কোন অবস্থাতেই তারা ইখ্‌ওয়ানীর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার হতে দেবে না। ঘটনার এক পর্যায়ে অফিসার লোকদের ভীড় লক্ষ্য করে গুলী চালিয়ে দিল। ফলে একজন কৃষক মারা গেল। গ্রামবাসী এভাবে নিরীহ লোকটির মারা পড়াতে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল এবং সেনা অফিসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তারা অফিসারকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সাথের সেনা দুজন অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে কোনরকমে জান বাঁচাল।

গণ পিটুনীর শিকার সেনা অফিসারের অপমানজনক মৃত্যুর খবরটি উপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে গেল। তখনি মিশরীয় সেনাদের একটি ব্যাটেলিয়ন মেজর জেনারেল মুহাম্মাদ ফাউযীর কমাণ্ডে কারদাছায় গিয়ে হাজির হল। তারা পুরো গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল। ক্ষণিকের মধ্যেই তারা কারদাছার উজ্জ্বল দিনকে রাতের আঁধারে পরিণত করে ফেলল। আপনি নিজেই অনুমান করুন,' ১৬ হাজার সেনা একটা গ্রামকে ঘিরে ফেললে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়!

জেনারেল মুহাম্মাদ ফাউযী তিন দিন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য সব ধরনের অপকর্মকে বৈধ ঘোষনা করল। তারা গ্রামের সমস্ত মহিলার সম্ভ্রমহানি করল। গবাদী পশুগুলোকে মেরে ফেলল এবং অনেক নিরীহ লোককে গুলী করে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করল। গ্রামের মডেল স্কুলের সামনে জেনারেল ফাউযীর নেতৃত্বে গ্রামের প্রতিটি লোককে চাবুক ও ডাণ্ডা দিয়ে বেধড়ক পিটানো হল। সবশেষে গ্রামের মাতব্বরকে শাস্তি দেয়া হল। এরপর বেছে বেছে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হল যাদের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, এরা সেনা অফিসারের হত্যায় কোন না কোন ভাবে জড়িত আছে, এ ধরনের লোকের সংখ্যা হল এক হাজার। পাঁচশ পুরুষ এবং পাঁচশ মহিলা।

কারদাছা গ্রামবাসীদের হৃদয়বিদারক এ কাহিনী আমি সামরিক, আবু যা'বাল এবং তুররা-সব ক'টি জেলে সরাসরি তাদের মুখ থেকেই শুনেছি।

একবার এক সেনা অফিসার, যে আমার বিষয়ে তদন্ত করছিল, আমাকে বেশ সময় ধরে পিটাল। এরপর শাস্তি বন্ধ রাখল। প্রায় একঘন্টা পর্যন্ত সে আমার ওপর কোন টর্চার করল না। তবে এ সময় আমার কাছে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল ঃ

"তোমার কি মনে হয় আমার তদন্ত করার পদ্ধতি হচ্ছে মার্কিন ধাঁচের, আর অন্যান্য অফিসাররা তদন্ত করেন রুশ পদ্ধতিতে। তাই না?"

সেনা অফিসাররা বলত, তাদের তদন্ত করার পদ্ধতি হচ্ছে রাশিয়ান কায়দায়। তাদের মতে, মার্কিনীদের তদন্ত করার নিয়ম হচ্ছে, অভিযুক্ত আসামীকে লাগাতার মারা হয় না; বরং মাঝে মধ্যে কিছু বিরতি দিয়ে আবার শাস্তি দেয়া হয়। তবে আসল কথা হল, এদের তদন্ত করার ভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের নির্যাতন ও শাস্তি এতই ভয়ানক, মানবতা বিরোধী এবং হিংস্র যে, এটাকে মার্কিনী কায়দাও বলা যায় না, রাশিয়ানও না। আমিও অন্যান্য বন্দীর মত তদন্তের সময় বিভিন্ন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। নির্যাতনের ভয়াবহতা ও হিংস্রতা সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। এটা বার বার বলা অর্থহীন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভীষন কঠিন মুহূর্তে অন্যান্য নিরপরাধ বন্দীর মত আমিও এমন সব অপরাধের কথা স্বীকার করেছি, যা করা তো দূরের কথা, কল্পনাও করিনি। কিন্তু পাঠক ভাইয়েরা বিশ্বাস করুন, এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আছে, যেগুলো আমাদের ওপর দিয়ে সব ধরনের

বর্বরতা, হিংস্রতা, অমানবিক আচরণ ও রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া সত্ত্বেও সামরিক কর্মকর্তারা জানতে পারেনি। তারা এ সব ব্যাপারে আমার কাছ থেকে এবং ইখ্ওয়ানের একজন নগন্য কর্মীর কাছ থেকেও কোন কথাই আদায় করতে পারেনি।

তদন্তের নামে আমাদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চলল। সরকারী হায়েনারা দীর্ঘক্ষণ টর্চার করল। এরপর আমি ও আমার মজলুম বন্ধুরা যার যার সেলে ফিরে এলাম। এখন আমরা এই অপেক্ষা করছিলাম যে, আমাদের বিষয়টা সরকারী উকিলের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে এবং পুরোদস্তুর আদালতি কার্যক্রম শুরু হবে। জ্ঞানীরা আমাদেরকে বলবেন, সরকারী উকিল অভিযুক্ত আসামীদেরকে পুলিশ ও ইন্টেলিজেন্স-এর লোকদের নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করে থাকেন। অতএব, আমরা ভাবছিলাম, যেহেতু তদন্তের পর্ব শেষ, তাই এখন আমাদেরকে সরকারী উকিলের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা সেখানে হাজির হয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ওপর নির্যাতনের যে স্টীমরোলার চালানো হয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করব। আমাদের ধারণা মতে সরকারী উকিল আমাদের সান্ত্বনা দিবে। আমাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করবে। আমাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের হিসাব নিয়ে সুবিচারের পদক্ষেপ নিবে। আমরা বর্তমানে যে নিদারুণ যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির মধ্যে রাতদিন পার করছি তার একটা মানবিক সুরাহা অবশ্যই বের করবে।

আমাদের সেলের সাথের সেলটিতে আটক আছে ইস্ট মিশরের এক লোক। লোকটাকে আমরা চাচা আহমাদ কুত্তাওয়ালা বলে ডাকতাম। ভদ্রলোককে এ উপাধী দেওয়ার কারণ আছে। জেলখানার হিংস্র কুকুরগুলো চাচা আহমাদকে এমনভাবে কামড়েছে যে, তার শরীরে যত নরম গোশত ছিল, সবই কুকুরগুলো টেনে ছিড়ে খেয়েছে। একদিন আমি চাচা আহমাদ কুত্তাওয়ালাকে দেখলাম, তার শরীর রক্তাক্ত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুনে লাল হয়ে আছে। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।

আমি কারারক্ষীদের থেকে চোখ বাঁচিয়ে তার কানে কানে বললাম ঃ

"চাচা আহমাদ! আপনার ওপর আবার কোন্ আপদ নাযিল হল? আমার তো ধারণা ছিল অনেকদিন আগেই আপনার তদন্তপর্ব শেষ হয়েছে?"

"ভাতিজা! তোমার ধারণা ঠিকই। কিন্তু কাল আমাকে সরকারী উকিলের সামনে পেশ করা হয়েছিল।"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমার পুরো বক্তব্য শুনলে বুঝে আসবে। সরকারী উকিলের সামনে আমি সহ আরো অনেককে হাজির করা হলে আমরা পূর্বের সমস্ত স্বীকারোক্তি অস্বীকার করলাম যা তারা আমাদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়ে জোর করে আদায় করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, সরকারী উকিলকে সত্যি কথা বুঝিয়ে বললে হয়ত বা তিনি আমাদের জন্য সুবিচারের ব্যবস্থা করবেন। আমাদের সাথে যে অন্যায় আচরণ করা হয় তা বন্ধ করবেন। আমরা সবাই যে মুসিবতে পড়েছি তা থেকে তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করবেন।"

"এরপর কি হল?"

"সরকারী উকিল মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর কাছে বার্তা পাঠিয়ে জল্লাদদের একটা দলকে ডাকলেন এবং ইষ্ট মিশরের যত বন্দী ছিল পুরো দিন তাদের ওপর বিরামহীন নির্যাতন চালালেন।"

"সরকারী উকিলও এমন অন্যায় কাজ করতে পারে? অথচ তাদের দায়িত্বই হচ্ছে নির্যাতিত লোকদের অভিযোগ শুনে তাদের ওপর যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে সেটা বন্ধ করা এবং সরকারকে ন্যায় বিচারে বাধ্য করা!"

"জি, এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার না। এখানে সবকিছুই সম্ভব।"

"আচ্ছা আংকেল! সরকারী উকিল বসেন কোথায়?"

"তুমি কি উকিল সাহেবের অফিস সম্পর্কে জান না?"

"অবশ্যই না।"

"তদন্ত শেষে তুমি যখন তদন্তকারী অফিস থেকে ফিরে আস, তখন তুমি রাস্তায় হাসপাতাল আর কেন্টিনের মাঝে বেশ কিছু সাদা তাঁবু অবশ্যই টাঙ্গানো দেখেছ?"

"জি, তা তো দেখেছি।"

"প্রত্যেকটা তাঁবুর ভিতর এক একজন সরকারী উকিল বসে আছেন। নাগরিকদের অভিযোগ শোনার জন্য সেখানে তারা বসে আছেন।"

"এ কথাটা কে আপনাকে বলেছে?"

"কেন? আমিই তো তোমাকে বলছি। তুমি নিজেই ওখানে গেলে আমার কথা সত্যি কি না দেখতে পাবে।"

"আমি আপনার কথা মানতে পারছি না, এটা কিভাবে সম্ভব? সামরিক জেলখানাতে নাগরিকদের অভিযোগ শোনার জন্য সরকারী উকিলের দফতর

থাকবে–এটা তো বিশ্বাস করার মত না।"

"আহমাদ রায়েফ! তুমি খামোখা কথা বাড়াচ্ছো। তুমি কি মিশরের লোক না? তুমি কি এখনো বুঝতে পারছ না যে, মিশরে আইন বলতে কোন জিনিস নেই। এখানে আইন ও মানবতাকে জবাই করা হচ্ছে। সব জায়গায় জুলুম ও বর্বরতা অবাধে চলছে।"

"চাচা আহমাদ! আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেবেন?"

"কী ব্যাপারে?"

"যখন আমাকে সরকারী উকিলের সামনে নেয়া হবে তখন কি করব।"

"তুমি যে সব মিথ্যা, মনগড়া স্বীকারোক্তি করেছ, তার সবই সত্য বলে মেনে নেবে। তা না হলে...।"

"তা না হলে কি হবে?"

চাচা আহমাদ কুত্তাওয়ালা হেসে ফেললেন। বললেন ঃ

"ও আমার সত্য পথের বন্ধু! তাই হবে, যা তুমিও জান আমিও জানি।"

চাচা আহমাদের কথা শুনে আমার ওপর যেন বজ্রপাত হল। তদন্তকারীরা ইতোমধ্যে উকিলের কাছে দেয়ার জন্য আমাদের ব্যাপারে বেশ কিছু কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। যেমন, তারা আমাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের ছবি তুলছে। আমাদের জীবনবৃত্তান্তের ফরমগুলো পূরণ করছে। আমাদের নাম, ঠিকানা, ভাইদের নাম, ঠিকানা, নিকটাত্মীয় এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের নাম ও ঠিকানাও লেখা হচ্ছে। যারা এখনো পর্যন্ত সরকারী উকিলের কাছে যায়নি, অপেক্ষায় আছে, তারা বিভিন্ন কয়েদীকে সকাল বেলায় জেলখানার বড় গেইট দিয়ে বাইরে বেরুতে আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসতে দেখে। তারা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন টয়লেটে যাওয়ার সময় হয়! তাহলে তারা সেখানে সুযোগ বুঝে যারা সরকারী উকিলের মুখোমুখী হয়েছে, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস জেনে নেবে। তাহলে তারা হয়ত আসন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারবে।

আগেই বলেছি, সেনা অফিসাররা আমাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ে যেত এবং আমাদের ছবি তুলত। এ সম্পর্কে বন্দীরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করত ঃ

"আচ্ছা ভাই, ছবি নেওয়ার সময়ও কি মারপিট করা হয়?"

এ জিজ্ঞাসার জবাবেও বলা হত "হ্যাঁ, এ সময়ও বর্বর আচরণ করা হয়।"

যাদের শরীরে নির্যাতনের ছাপ স্পষ্ট নয় এ ধরনের কিছু লোকদের সেনা কর্মকর্তারা নিয়ে যেত টেলিভিশনের স্ক্রীনের সামনে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মুখ থেকে এ রকম বিবৃতি আদায় করা, সরকার সবখানে সুবিচারপূর্ণ আচরণ করছে এবং কারোর প্রতি কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ও অন্যায় আচরণ করছে না। এজন্যই যে সব বন্দীর ধারণা হত, তাদেরকে টিভি স্ক্রীনের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে স্বীকার করে নেয়, তারা সত্যিই অপরাধী, সন্ত্রাসবাদী এবং মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত। এ ধরনের বন্দীরা তাদের সঙ্গীদের কাছে জিজ্ঞেস করত ঃ

"টেলিভিশনেও কি শাস্তি দিয়ে বিবৃতি প্রচার করা হয়?"

তার জন্য উত্তর আসত, "হ্যাঁ, অবশ্যই। এখানেও নির্যাতন করা হয়।"

এক রসিক বন্ধু শাস্তিদান সম্পর্কে বন্দীদের এত সব প্রশ্ন শুনে বললেন ঃ

"আপনারা আশ্চর্য ধরনের মানুষ! এখানে তো প্রতিটা ব্যাপারেই শাস্তি দেওয়া হয়। এখানকার মূল নিয়মই হচ্ছে নির্যাতন করা। যখন আপনারা টয়লেটে যান, তখন কি আপনাদের ওপর নির্যাতন চলে না? যখন আপনাদেরকে গোসল করার জন্য ডাকা হয়, তখন কি আপনাদের ওপর চাবুক, ডাণ্ডা ও ঘুষি সমানে চলতে থাকে না?" যখন আপনাদের সামনে খাবার দেয়া হয়, তখন কি আপনাদেরকে মারা হয় না?"

সামনে তিনি আসলে বলতে চাচ্ছিলেন ঃ

"যখন আপনারা পানি খান, ... কিন্তু তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো "যখন আপনারা পানি না খান তখন কি আপনাদেরকে পিটানো হয় না?"

যেহেতু আমরা বেশীর ভাগ সময় পিপাসার্ত থাকতাম, এজন্যই রসিক বন্ধুর মুখ থেকে "পানি খাওয়ার বদলে পানি না খাওয়ার কথাটা বেরিয়ে আসে।

দেখতে দেখতে কয়েক দিন পর একদিন আমাদের সেলের দরজা খুলে গেল। আমরা নিশ্চিত, অবশ্যই কোন মুসিবত আসতে যাচ্ছে। কারণ সেল তখনই খুলে, ,যখন কোন আপদ সামনে আসে। একজন নতুন সেপাই দেখলাম। জেলখানার ভিতর এ সেপাইকে আগে কখনো দেখিনি। আমরা এখানকার নিয়ম অনুযায়ী তাকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে এগিয়ে আমার ব্যাপারেই সেলের অন্যান্যদের কাছে জিজ্ঞেস করল। এরপর আমার

হাত ধরে হাঁটা দিল। আমরা জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনে হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে। এরা হাসপাতালকে দারুস শিফা (আরোগ্য নিকেতন) বলে থাকে। কাছেই অনেকগুলো সাদা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। যেখানে লেখা রয়েছে–নাগরিক অভিযোগ কেন্দ্র। ওখানে সরকারী উকিল ও তার সহযোগীরা অবস্থান করছে। হিংস্র আচরণ এবং বর্বরতায় এ অভিযোগ কেন্দ্রগুলো ইন্টেলিজেন্স-এর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। আমাকে টেনে নিয়ে এসে সেপাই এক তাঁবুর সামনে এসে থেমে গেল। আমি বুঝে গেলাম। এখন আমার পালা আসছে। যত দোয়া-কালাম, আয়াত মনে ছিল, সব আমার মুখে আর মনে আসতে লাগল। আল্লাহই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি তার বান্দাদেরকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেও উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দেন। আমি তারই মহিমা ও করুণার আশায় দোয়া করতে লাগলাম।

গণ অভিযোগ কেন্দ্রে সরকারী উকিলের সামনে

সেপাই তাবুর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে সালাম দিল এবং ভেতরের অফিসারকে আমার আসার কথা বলল। আমিও ভিতরে ঢুকলাম।

একজন লোক ছোট্ট একটা টেবিল সামনে রেখে বসে আছে।

তারই এক পাশে আরেকজন যুবক বসে আছে। মনে হয়, সে অফিসারের সহকারী।

টেবিলের সামনে কাঠের একটা চেয়ার। আমাকে ওখানে বসতে বলা হল। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়লাম। কারণ, বন্দী অবস্থায় আমাদের জন্য নির্দেশ ছিল আমরা যেন অফিসারদের সামনে মাটিতে বসি। কিন্তু, সরকারী উকিল আমাকে চেয়ারেই বসার জন্য ইংগিত করল। আমি মাটি থেকে ওঠে চেয়ারে এসে বসলাম। আমি নিশ্চুপ, নির্বাক।

আমি টেবিলের প্রতি একটু দৃষ্টি বুলালাম। দেখলাম, যে সব বিবৃতি আমার কাছ থেকে জোর করে নেয়া হয়েছে, তার সব কিছুই সামনে রাখা। আমি আমার লেখার ধরন চিনে ফেললাম। আমি যেমন নিজের ব্যক্তি সত্তাকে চিনি, ঠিক তেমনি নিজের লেখাও চিনি। টেবিলের ওপর অনেক দামী সিগারেটের একটা প্যাকেট পড়ে আছে। গ্রেপ্তারীর আগে আমি এ সিগারেটই

খেতাম। যদিও সিগারেট খাওয়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুবাহ, তবুও এটা যে খারাপ অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর–এতে কোনই সন্দেহ নেই। তবু এ খারাপ অভ্যাসটা আমার ছিল। জেলখানায় সিগারেট খাওয়ার সুযোগ কোথায়? জীবনে বিনোদনের যা কিছু আছে, এখন তো সবই ভুলে গেছি। সিগারেটও ভুলে গেছি। এখন দেখে তা মনে পড়ল।

"আপনি কি সিগারেট খেতে পছন্দ করেন?"

সরকারী উকিল অবিকল এ শব্দগুলো দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল।

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি।"

"কোন অসুবিধে নেই, যদি আপনার ইচ্ছা হয়।"

সে আমার হাতে এক সিগারেট দিল। তারপর আবার সে নিজেই সেটা ধরাল। আমি অকৃত্রিমভাবে হেসে উঠলাম।

"আপনি হাসছেন কেন?"

"যা দেখছি, তাতেই হাসি এসে গেল।"

"আপনি কি দেখছেন?"

"আমি দেখছি, তদন্তের ধরন মার্কিনী সিস্টেমের দিকে যাচ্ছে।"

"আপনার এ কথার অর্থ কি?"

আমি তার কাছে পুরো ঘটনা বললাম। সে ভ্রু কুঁচকে বলল ঃ

"আপনার কথার অর্থ কি এই যে, এখানে অমানবিক আচরণ করা হয়?"

আমাদের মাঝে এ রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। এ সময় আমাদের কানে পাশের এক তাবু থেকে কোন এক বন্দীর হৃদয়বিদারক চিৎকার ভেসে এলো। আমি তীব্র ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য ভরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। আমার হাসি দেখে সরকারী উকিলও হেসে উঠল। এরপর আমাকে বলল ঃ

"আপনি কি চা খেতে চান?"

"আসলে ঘটনা কি? প্রথমে সিগারেট, এরপর চা। এটা কোন্ ধরনের পরিবর্তন?"

"মূলত ঘটনা তাই যা আপনি এখনি বললেন। অর্থাৎ তদন্ত মার্কিনী পদ্ধতির রূপ নিচ্ছে।"

সে সেপাইকে এক কাপ চা আনার নির্দেশ দিল। সেপাই সেলুট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সরকারী উকিল আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"আচ্ছা, আপনি কি জানেন, আমি কে?"

"এরআগে আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ঘটেনি।"

"আমার নাম মুহাম্মদ হুসাইন লাবীব। আমি স্টেট সিক্যুরিটি কোর্টের সরকারী উকিল।"

ইতোমধ্যে চাবুক বর্ষন আর চিৎকারের আওয়াজ প্রচণ্ডভাবে শোনা যাচ্ছে। মনে হয় তাবুর বাইরে থেকে ভেসে আসছে। আরেকজন সরকারী উকিল তাবুর বাইরে এক হতভাগা বন্দীর ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। ভয় আর আতংকে আমার কথা বলার শক্তি যেন শেষ হয়ে গেল। আমি ওঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু সরকারী মোক্তার আমাকে বসার জন্য ইংগিত করে বলল ঃ

"আপনি ওঠে দাঁড়ালেন কেন? বসুন!"

আমি বসে পড়লাম।

সে নিজের সঙ্গীর দিকে তাকাল, বলল ঃ

"কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে ... জনসাধারণের নামে ... অমুক দিনের কথা ...।"

মামলা মোকদ্দমার বিশেষ এ ধরনের পরিভাষা দিয়ে সরকারী উকিল তার সেক্রেটারীকে লিখতে বলল।

এরপর উকিল আমার নাম, বয়স, পেশা ও আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করল।

আমার আগের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি হাতে নিয়ে ওগুলো আমার চোখের সামনে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করল ঃ

"এ লেখাগুলো অবশ্যই আপনার মনে আছে!"

"জি।"

"এগুলো ধরুন এবং খুব ভাল করে উল্টে পাল্টে দেখুন। এগুলোর মধ্যে কি আপনারই দস্তখত?"

"জি।"

"আচ্ছা, আপনার কি মনে আছে, এ কাগজগুলোতে আপনি কি কি লিখেছেন?"

"কিছু মনে আছে। আবার অনেক কথা ভুলে গেছি।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন, এ স্বীকারোক্তি আপনিই লিখেছেন?"

"জি! কিন্তু ..."

সে আমার কথা থামিয়ে দিল। তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

"কিন্তু টিন্তু আবার কি? আপনার কি উদ্দেশ্য?"

"আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমি একথা বলতে চাই, এ স্বীকারোক্তি আমি এমন চাপের মুখে লিখেছি, যা আপনার কান এ মুহূর্তে শুনছে এবং আপনি দেখছেন।"

যখন আমি উত্তর দিচ্ছিলাম, তখন বাইরে ডাণ্ডার চাবুকের ভীতিকর শব্দ প্রচণ্ডভাবে শোনা যাচ্ছে এবং হতভাগা বন্দীদের চিৎকার আহাজারিতে আকাশ, বাতাস এবং পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠছে।

সে ধমক ও বিদ্রূপাত্মক সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

"মনে হচ্ছে, আপনি ডাণ্ডা, চাবুককে ভয় পাচ্ছেন না।"

"উকিল সাহেব! মেহেরবানী করে আমাকে সত্য বলার সুযোগ দিন।"

"আমিও সত্য কথাই চাচ্ছি।"

"এ দুনিয়াতে এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে মারকে ভয় পায় না। এমন কি আপনিও তার ব্যতিক্রম নন।"

"আমিও?"

"জি, যদি আপনিও মারকে ভয় না পেতেন, তাহলে আপনি আমার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করতেন না।"

"তার মানে?"

"আপনি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স-এর দোসর তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এজন্যই তাদের অন্যায়, জুলুম নির্যাতনকে বৈধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।"

সেপাই চা নিয়ে ভিতর ঢুকল এবং আমার দিকে এগিয়ে দিল। এরপর উকিল সাহেবকে সে সালাম করে বেরিয়ে গেল।

আমি বুকে সাহস সঞ্চায় করে সরকারী উকিলকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ

"আপনি আমার কড়া, স্পষ্ট কথা শোনার পর হয়ত আমাকে চা খেতে দেবেন না।"

সে বলল ঃ

"কখনো এমন হবে না। আপনি ধীরস্থিরভাবে চা খান।" আমি অনুমান করলাম, আমার কথা ভদ্র লোকের মনে গেঁথেছে। তাকে খামোশ দেখে আমার সাহস আরো বাড়ল। আমি বললাম ঃ

"আপনারা বন্দীদের অভিযোগ শোনার জন্য যে কার্যক্রম শুরু করেছেন, এগুলোর কি প্রয়োজন আছে? এ জন্য অনেক লোক কাজ করছে। রাত-দিন কাজ করার কারণে তাদেরকে বাড়তি বেতন দেয়া লাগছে। কাগজ নষ্ট হচ্ছে। কালি খরচ হচ্ছে। এ সব নাটকের আদৌ প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকুই তো যথেষ্ট যে, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কিংবা সিভিল ইন্টেলিজেন্স-এর কোন অফিসার প্রত্যেক বন্দীর স্বীকারোক্তিগুলো সামনে রেখে কোন শাস্তি নির্ধারন করবে এবং তা লিখে রাষ্ট্রপ্রধানকে জানিয়ে দেবে। বরং প্রেসিডেন্টকেও জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটুকু করতে পারেন নিয়ম আছে বিধায়। প্রেসিডেন্ট সাহেব যে ধরনের সাজা নির্ধারণ করতে চান, জারি করতে পারেন। এভাবে আপনারা সরকারী অর্থ অযথা খরচ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। খামোখা আমাদের মিথ্যা, ভিত্তিহীন আশার চক্করে নিক্ষেপ না করাই উচিত।"

"আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?"

"আল্লাহর কসম! আমি ঠাট্টা করছি না। দেশের অর্থ, সময় ও শ্রম অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে কি লাভ? এগুলো কোন কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা উচিত।"

"আমরা এ সব করছি, যেন আপনারা বুঝতে পারেন, সরকার চায়, যে রায় বা সিদ্ধান্তই হোক না কেন তা যেন আইন অনুযায়ী হয়। তা না হলে ... আমার জন্য তো একেবারেই সহজ। তোমার সঙ্গে যেমন খুশী আচরণ করতে চাই, করতে পারি ... হ্যাঁ, তাহলে শুনো, আমাকে বল।"

"বলুন, আপনাকে আমি কি বলব?"

"তোমরা সংখ্যায় কতজন?"

"আমি জানি না।"

"ছয় হাজার, সাত হাজার, না দশ হাজার। বল, বলছ না কেন? যদি তোমাদের সবাইকে, তোমাদের বড়, ছোট, বাচ্চা, মহিলা, যুবকদেরকে সবাইকে মেরে ফেলা হয় তাতে কি আসবে যাবে।"

"ইতিহাস সব সময় আপনাদের কুকীর্তি স্মরণ রাখবে।"

"(বিদ্রূপের হাসি হেসে) ইতিহাসের কি গুরুত্ব আছে?"

"আল্লাহপাক, যিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক, আপনাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।"

"তোমাদের জানা উচিত, আমরা ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকে খতম করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা তা করব না। আমাদের দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য নাগরিক অভিযোগ কেন্দ্র আছে, যেখানে সরকারী উকিল নাগরিকদের অভিযোগ শুনে সরকারকে জানান। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল আদালতও আছে।"

আমি উকিল সাহেবের কথা শুনে হেসে ফেললাম। আমি অসংকোচে পাঠকদের বলতে পারি, এ লোকটা আমার সঙ্গে যথেষ্ট নরম ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করেছে।

"তুমি হাসছ কেন?"

"আপনি দায়িত্বশীল ন্যায়বিচারক আদালতের কথা বললেন। আমি সে কথাই ভাবছিলাম, আপনি কবে নাগাদ আমাদেরকে সেই ন্যায়বিচারক আদালতে পেশ করবেন। আপনি দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন, সে আদালতের ভিতরও কি আমাদেরকে টর্চার করা হবে?"

"তুমি কি আমার মধ্যে সহনশীলতা টের পাচ্ছ না?"

"জি, অবশ্যই টের পাচ্ছি। এটা আমি অস্বীকার করছি না। তবে এ অবস্থা কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে?"

"অপেক্ষা করতে থাক।"

মোটকথা, বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সত্যি কথা বলতে কি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় উকিল সাহেব আমার সাথে কোন ধরনের অন্যায় আচরণ করেনি। তবে অপরাধ স্বীকারোক্তির পেছনে আসল সত্য সম্পর্কে আমি যখন তাকে বললাম, উকিল সেটা না শোনার মতই শুনল।

আমি চেষ্টা করলাম, তদন্ত রিপোর্টের ভিতর আমার শরীরের যখমগুলোর কথাও ঢুকানোর। যখমগুলো এখনও আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের প্রমাণ হয়ে আছে, তখন উকিল সাহেব বলল ঃ

"বিশ্বাস কর, এগুলো রিপোর্টে ঢুকালে তোমার এক পয়সাও ফায়দা হবে না।"

এরপর সে তার সেক্রেটারীর সামনে আমার কানে কানে বলল ঃ "বরং এসব অমানবিক আচরণের কোন কথা তুমি রিপোর্টে ঢুকালে তোমার ওপর আরো ভীষন শাস্তি নেমে আসবে। এগুলো লেখালে সেটা যদি তোমার সামান্যতম উপকারেও আসত, তাহলে আমি সেটা করার জন্য তোমাকে পরামর্শ দিতাম।"

এ সময় আমি বুঝতে পারলাম, সরকারী উকিলের অবস্থা আমার চেয়ে ভাল কিছু না। মিশরের নাগরিক হিসেবে তার অবস্থা আর আমার অবস্থা একই। সত্যি কথা যদি বলি, তাহলে বলতে হয়, সে সময় মিশরের প্রতিটি মানবতাবাদী নাগরিক, হতবিহবল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে এ ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করার হোতা কে? কে মিশরে নাস্তিক্যবাদ ও খোদাদ্রোহী, জুলুমবাজ নীতির চাকা ঘুরাচ্ছে? সে মূলত এখানকার ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে এবং ইসলাম প্রেমিক লোকদেরকেই সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেছে।

সে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য তার পুরো সরকারী মেশিনারী ও দলের জন্য সব ধরনের বর্বরতা, হিংস্রতা, পাশবিকতা, অমানবিকতা, জুলুম ও নির্যাতনকে বৈধ করে দিয়েছে। জালেম প্রকৃতির এ লোকটাকে সবাই চেনে। সব মানুষ তাকে সম্মান দেখাতে ব্যস্ত। তার বিরুদ্ধে কোন মানুষ একটা টু শব্দ করতে পারে না। কেউ এমন করলে তার আর রেহাই নেই। জামাল আব্দুন নাসের হচ্ছে এ যুগের সেই ফেরাউন।

সরকারী উকিল যা করছে একজন মানুষ হিসেবে তার মন এ কাজ সমর্থন করতে পারে না। এটা তার পেশার জন্য অবমাননাকর। তবুও সে করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার মন তার কাজের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। সে যা করছে ভীষন চাপের মুখে করছে। আমি তার মনের অসন্তুষ্টি ভাবটা কয়েক বছর পর জানতে পেরেছি। তখন এ জুলুম, বর্বরতা ও নাস্তিক্যতাবাদের হোতার দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সে জীবনের দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়ে কবরের ভীষন অন্ধকারে তার কৃতকর্মের সাজা ভোগ করছে।

যা হোক, সন্ধ্যা হলে আমাকে আবার আমার সেলে পাঠিয়ে দেয়া হল। আমি প্রচণ্ড মানসিক তিক্ততায় মন ভরে তথাকথিত অভিযোগ কেন্দ্র, আইন, জামাল নাসের এবং বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক জালেম অফিসারদের ওপর, তাদের নাম নিয়ে নিয়ে অভিশাপ দিতে লাগলাম। তাদেরকে বদ-দোয়া দিতে লাগলাম। আসলে তখন এদেশের প্রতিটা বস্তু অভিসম্পাত পাওয়ার উপযোগী ছিল। ১৯৬৫ সালে নাসেরের সামরিক জান্তা জেলখানার ভিতর এদেশের নিরীহ তৌহিদী জনতা ও ইসলাম প্রেমিক লোকদেরকে নিয়ে যে রক্তাক্ত নাটক খেলেছে, তারই ফলে ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলের

যায়নাবাদীদের হাতে মিশরীয় সেনারা লজ্জাজনক পরাজয়বরণ করে। জামাল নাসেরের খোদাদ্রোহী সেনারা হচ্ছে নিরীহ নিরস্ত্র লোকদের বেলায় সিংহশার্দূল, আর লড়াকু সৈন্যদের মোকাবেলায় ভিজে বিড়াল। তাদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর শুনে আমার মুখ থেকে বারবার এ আরবী প্রবাদ বাক্যটা বেরিয়ে আসছিল ঃ

"আছাদুন আ'লাইয়্যা ওয়া ফিল হুরুবি নিআ'মাহ"–সে আমার সামনে সিংহের মত (হিংস্র)। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে উটপাখীর মত।

একাদশ অধ্যায়

তদন্তপর্বের পর

তদন্তপর্ব শেষ হল। এটাকে আমরা খোদার পক্ষ থেকে লিখনী মনে করে করে ভোগ করেছি। আমরা সেটা সয়ে নিয়েছি। আমাদের জন্য সেটা থেকে পরিত্রাণের কোন পথও ছিল না। সত্যি বলতে কি, যা কিছু আল্লাহ্ আমাদের তকদীরে লিখে রেখেছেন তা খণ্ডন করার কারোরই শক্তি নেই। সে জন্যই আমরা খুশী মনে সব ধরনের মুসিবত সহ্য করছিলাম। আমরা তার ওপর অসন্তুষ্ট নই।

যা হোক তদন্তপর্ব শেষ হলে আমরা সেলে ফিরে এলাম। আমরা এখন অপেক্ষা করতে লাগলাম, কবে নাগাদ সরকারী উকিল আমাদের ব্যাপারে আদালতে আর্জি পেশ করে। আমরা জানি না, আমাদের বিচার কেমন হবে এবং কোথায় হবে।

১৯৫৪ সনে উইং কমাণ্ডার জামাল সালেমের আদালতে যে "গণ আদালত" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তার কথা মনে পড়লে আমাদের শরীর শিউরে ওঠে। আমাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। তবে একথা ভেবে অনেকটা সান্ত্বনা পাই যে, সরকার এখন জামাল সালেমের মত এত পাষাণ হৃদয়ের মানুষ আর পাবে না। সেই জালেম বন্দীদেরকে হুকুম করত যেন সূরায়ে ফাতেহা বা আলহামদু সূরা তাকে উল্টা করে শুনানো হয়। উল্টো শুনাতে গিয়ে কেউ যদি একটু থামত, তার আর নিস্তার ছিল না। তার ওপর ভীষন নির্যাতন চালানো হত। যে কারণে সে দিনগুলোতে আমরা সবাই বিপরীত

দিক থেকে উল্টো করে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার অনুশীলনী করতাম।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে, আমাদের মাথায় সব সময় এ কথাটা চেপে থাকত, আমাদের আইনগত পজিশন কি? আমাদের তো অন্তত সেটা জানা উচিত, আমাদের বিরুদ্ধে কি এ রকম মোকদ্দমা দায়ের করা হবে যে, আমরা সরকার উৎখাতের কোন ষড়যন্ত্রে জড়িত অথবা এ রকম যে, আমরা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতাম। আমরা এটা নিয়ে অনেক ভাবতাম। এমন ধরনের কোন ঘটনা মনে পড়ে না যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আমরা প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিংবা তার সরকারের কোন সদস্যকে নিয়ে কোন সময় কোন ধরনের মন্তব্য কিংবা সমালোচনা করেছি।

একদিন আমরা আমাদের অভ্যাস অনুযায়ী ভবিষ্যতে আমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে–এ ব্যাপারে পরস্পরে যুক্তিতর্ক শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাত। আমরা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছি। এ সময় হঠাৎ সেলের দরজা খুলে গেল। আমরা ভীত-হতচকিত হয়ে ওঠে দাঁড়ালাম। সব সময়ই এমন ছিল যে, যখনই কোন সময় আমাদের সেলের দরজা খোলা হত, আমাদের অন্তরাত্মা অজানা আশংকায় শুকিয়ে যেত। কিন্তু এবার আমরা ভীষণ ভয় পেলাম। কারণ, দরজাটা রাতের শেষ ভাগে খুলেছে। দরজা খুলে গেলে কামরার মধ্যে-মৃদু আলো ঢুকল। আমরা সে আলোয় বিশাল দেহের এক সৈনিককে রুমে ঢুকতে দেখলাম। সে ভিতরে পা রেখেই আমার নাম ধরে ডাকল ঃ "মান্ আহমাদ রায়েফ? আহমাদ রায়েফ কে?"

তার ডাক শুনে আমাদের পুরো রুমটাতে একটা ভীষন আতংক ছড়িয়ে পড়ল। রাতের শেষ ভাগে আমাকে তদন্তের জন্য ডাকার অর্থ হল, খুব সমভব আমি আর সেলে ফিরে আসব না। সেলের সবাই খুব তড়িঘড়ি করে তাদের শরীরের কাপড়গুলো খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। কারণ, তখন শীতের মওসুম। বাইরে প্রচণ্ড শীত। আমি সব বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের কাপড় তাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম। কেননা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য সবারই কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। আমি ভাবছিলাম, আমার এখন কাপড়ের কি প্রয়োজন!

আমার অবস্থা আত্মা ছাড়া একটা লাশের মত হয়ে গেছে। লাশের জন্য

গরমও কোন কাজের কিছু না, আবার ঠাণ্ডাও ক্ষতিকর না।

সৈনিকটি আমাকে বড় জেলের সামনের আঙ্গিণায় নিয়ে এলো। ওই সময় কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। সান্ত্রীরা টহল দিচ্ছিল। বলাবাহুল্য, সেল থেকে নিয়ে এখানে পর্যন্ত আসতে আমাকে যে কত নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ভেবেছিলাম, তদন্তের পর্ব শেষ হয়ে গেছে এবং সরকারী উকিল মামলা দায়ের করবে–সে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু হায়! একি? তাহলে কি আবারো তদন্তের দরজা খুলে গেছে। না কি আবার কোন মুসিবত নাযিল হতে যাচ্ছে!

আমাকে তদন্ত করার রুমে নিয়ে যাওয়া হল। আমার অন্তরাত্মা আশে পাশের মজলুম মানুষের চিৎকারে শুকিয়ে গেল। তাদের ওপর ডাণ্ডা ও চাবুক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছিল। ব্যথা, বেদনায় তাদের মুখ থেকে তীব্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে। কুকুর তাদের শরীরের গোশত ছিঁড়ে নিচ্ছে। তখন আমার কাছে এ নির্মম সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল, সামরিক জেলখানায় তদন্ত একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না। কারণ, দেশে নাকি প্রতিদিন সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছে। ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। তাই এখানে প্রতিদিন রিমাণ্ডের নামে চলে নির্যাতন ও শাস্তিদানের ভয়াবহ ধারাবাহিকতা। প্রতিদিন কুকুররা পাচ্ছে নতুন বন্দীর গোশ্তের মজা। এখানে আরো একটা বিরল ঘটনা দেখা গেছে। সেটা হল অনেক সেনা অফিসারকে এখানে নিয়ে আসা হত এবং তাদেরকেও অপমানজনক শাস্তি দেয়া হত। শাস্তি দিয়ে এরপর তাদেরকে সেনা ছাউনিতে পাঠিয়ে দেয়া হত।

ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হাকীম আমের-এর অফিস সেক্রেটারী শাম্স বাদরান সামরিক জেলখানাটাকে নির্যাতন ক্যাম্পে পরিণত করেছে। এখানে সমাজের সর্বস্তরের লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল।

এবার আমাকে একটা অন্ধকার জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। পাশেই আরেকটা রুম–যেখানে রিমাণ্ডের জন্য আনা লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের ওপর ভীষন টর্চারিং করা হচ্ছে। আমারই একেবারে কাছে এক জায়গায় শামস্ বাদরান দাঁড়িয়ে মেজর মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ-এর সঙ্গে কথা বলছে। আব্দুল ফাত্তাহ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে ফিল্ড মার্শাল আমেরের নাম ব্যবহার করে চুরি ও কালো ধান্দায় জড়িত। মেজর

মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ ফিল্ড মার্শাল আমেরের দফতরে কর্মচারী ছিল। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আব্দুল হাকিম আমেরের অফিসটি বড় বড় চোর, বদমাশ আর জল্লাদ দিয়ে ভরা থাকত। তারাই মুসলিম বিশ্বের সামনে মিশরকে কলঙ্কিত করেছে। শাম্‌স বাদরান এবং মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ-এর মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিল ঃ

শাম্‌স বাদরান ঃ

"মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ!"

"জি, স্যার!"

"কাল তোমাকে মিলিটারী কাউন্সিলের সামনে হাজির করা হবে এবং তোমার কোর্ট মার্শাল হবে।"

"আচ্ছা স্যার!"

"মিলিটারী কোর্টের নাম শুনে ভয় পেয়ো না, বুঝলে!"

"জী, স্যার!"

"তোমাকে পঁচিশ বছরের জেল দেয়া হবে।"

এবারে আব্দুল ফাত্তাহ বলল ঃ

"কিন্তু স্যার ...!"

শাম্‌স বাদরান ঃ

"(কথা কর্তন করে) ঘাবড়াবে না। কয়েকদিনের জন্য জেলে থাকবে। এরপর তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।"

"আপনার যা মর্জি হয় স্যার!"

শাম্‌স বাদরান ঃ

"সিগারেট টানবে?"

"স্যারের দয়ার কথা আর কি বলব!"

শাম্‌স বাদরান আব্দুল ফাত্তাহকে সিগারেট দিল। আমি আঙ্গুল মুখে চেপে মনোযোগ দিয়ে তাঁদের আকর্ষনীয় বাক্যালাপ শুনছিলাম। ইতোমধ্যে শাম্‌স বাদরান আমার কাছে এসে জেলখানার এক অফিসারকে আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল ঃ

"এ লোকটা কে?"

অফিসারটি খুবই আদবের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল ঃ

"এ হচ্ছে আহমদ রায়েফ।"

শাম্‌স বাদরান আরো কাছে এলো। অন্ধকারের কারণে আমি তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তার ঠোটে তিক্ত ও রূঢ় হাসির একটা ঝলক আমার নজরে পড়ল। আমাকে বলল ঃ

"কি অবস্থা?"

"আলহাম্‌দুলিল্লাহ।"

"সন্তুষ্ট আছো তো?"

"আলহামদুল্লিাহ।"

"কোন কিছুর প্রয়োজন আছে?"

"আলহাম্‌দুলিল্লাহ।"

আমার একই ধরনের উত্তর শুনে শাম্‌স বাদরান তার কাছে দাঁড়ানো জেল অফিসারকে বলল ঃ

"পনের মিনিট পরে একে আমার দফতরে নিয়ে আসবে, বুঝলে?"

"ঠিক আছে, স্যার।"

সব মানুষের ছায়া আমার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। শাম্‌স বাদরান কেন আমাকে ডাকছে? এ নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমার চিন্তাজগতে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। আমি তারকা ভরা আসমানের দিকে তাকালাম। আমার অন্তর আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, অসীম শক্তি আর তাঁর মহান শিল্পকর্ম নিয়ে মগ্ন। মানব-দানব ছাড়া প্রতিটি বস্তু তারই সামনে সিজদারত। তিনি মহাশক্তিমান। তিনি সমগ্র জগত নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রতিটি অনু-পরমাণু তার নিয়ন্ত্রনে। আমার অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে গেল। আপনা আপনি আমার হাত দুখানা দোয়ার জন্য ওঠে গেল। আমি ক্ষীণ সুরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম ঃ

"হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি অবশ্যই দেখছ, এ অপরিচিত স্থানে আমাদের ওপর কি নির্মমতা চালানো হচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ, আমরা তোমারই ইবাদত সেভাবে করতে চাই, যে ভাবে তুমি নির্দেশ দিয়েছ। আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এর প্রতিটি কর্মী, প্রতিটি সদস্য এ প্রচেষ্টায় লেগে আছি যে, আজ আমাদের দেশে তোমার পবিত্র বিধান চালু না থাকাতে দেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দেখা যাচ্ছে, দেশ দিনে দিনে অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে; আমরা চাই তার অবসান। আমরা চাই ইসলামের প্রথম যুগে

মুসলমানরা যে সব কারণে সম্মান, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তারা সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সফল হয়েছিলেন, আমরাও সে পথ ধরে এগিয়ে যাই। বর্তমান মুসলমান জাতি হযরত সাহাবায়ে কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ পরিহার করে কি কখনো সুখী-সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হতে পারবে? কখনই না।"

হে খোদা! নাসেরের শাসনযন্ত্র তোমার বিধানকে ভূলিণ্ঠিত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত। আমরা কি তার খোদাদ্রোহী বেদ্বীনী তৎপরতাকে মেনে নিতে পারি? যদি মেনে নিই তাহলে তুমি আমাদের ওপর চরম নাখোশ হবে। আমাদের ওপর থেকে তোমার রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেবে। অতএব, হে আমার মাবুদ! এ সরকার আমাদের সাথে যে ধরনের আচরণ করতে চায়, করুক; আমরা তোমার গোলামী ছাড়া আর কারোর গোলামী করব না। এ জন্য প্রয়োজনে আমাদের সর্বস্ব কোরবানী দিতে হোক না কেন, আমরা পিছপা হব না। হে আল্লাহ তুমি আমাদের মাঝে দৃঢ়তা দান কর। আমাদেরকে ধৈর্যধারন করার তৌফিক দাও। আমীন"

আমি দোয়া করছিলাম, আর আল্লাহর মারেফাতের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি দুনিয়ার সব কিছু বিস্মৃত হয়ে সেই মহান রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে নিমগ্ন। হঠাৎ আমার সম্বিৎ ফিরে এলো, যখন একটা লৌহহস্ত আমার কাঁধ স্পর্শ করল এবং কঠোর কণ্ঠে বলল ঃ

"চল্, ওঠে দাঁড়া, তোর মরণ এসে গেছে!"

সামরিক জেলখানার অফিসে

শামছ বাদরান আমাকে তার অফিসে তলব করেছে। ভাবছিলাম, কেন আমাকে ডেকেছে? নানা শংকা আমার মনে দোলা দিচ্ছে। তার কাছে কি আমাদের সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য এসেছে এবং সে মোতাবেক আমাদের বিরুদ্ধে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে? যাহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকিছু সামনে এসে যাবে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে শাম্স বাদরানের রুমে ঢুকলাম। কারণ যে সৈনিককে আমাকে ধরে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে সে আমাকে গরু ছাগলের মত হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। শাম্স বাদরান হাসি মুখে আমাকে

অভ্যর্থনা জানাল ঃ

"আসুন, আহমদ রায়েফ সাহেব! তাশরীফ রাখুন!"

আমি নিয়মানুযায়ী মাটিতে বসে পড়লাম।

"না না, এভাবে বসবেন না; চেয়ারে বসুন।"

এ বলে শাম্‌স বাদরান তার প্রশস্ত রুমে পাতা অত্যন্ত দামী টেবিলের সামনের চেয়ারটা আমাকে পেশ করল। কিন্তু আমি ওটাতে বসলাম না। হতে পারে আমার চেয়ারে বসাকে বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা ঘোষনা করে আমার সাথে অমানবিক আচরণ করবে। কিন্তু সে তার হাতের ইশারা দিয়ে আমাকে দৃঢ়তার সাথে বলল ঃ

"চেয়ারে বসুন, এটা বেয়াদবী নয়।"

আমি অনেকটা থতমত খেয়ে গেলাম, আমি কি শাম্‌স বাদরানের সামনে মুখোমুখী হয়ে চেয়ারেও বসতে পারি। আরে! জগতে এ আবার কোন্ ধরনের বিপ্লব এসে গেল?

যা হোক, ভবিষ্যতে কি হবে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে আমি চেয়ারে বসে পড়লাম।

শাম্‌স বাদরান বলে ওঠল ঃ

"কি খেতে ভাল বাসেন?"

আমি আরো বিস্মিত, আসলে লোকটা কি করতে চায়? সে কি সত্যিই আমাকে চা দিতে চাচ্ছে, নাকি অন্য কিছু?

আমার মুখ থেকে কোন উত্তর বের হল না।

"আপনার জন্য কি এক কাপ গরম চায়ের অর্ডার দেব?"

হে আসমান জমিনের খোদা! গরম চা সাধা হচ্ছে? এটা কোন ধরনের আচরণ? মনে মনে বিড়বিড় করলাম, তবে একটু সাহসও সঞ্চার হল।

আরজ করলাম ঃ

"খাব। কোন অসুবিধে নেই।"

শাম্‌স বাদরান একজন ফৌজী অফিসারকে জলদি গরম এক কাপ চা আনার হুকুম দিল। অফিসার আদেশ পালন করতে তখনি চলে গেল চা আনার জন্য।

শাম্‌স বাদরান আবার আমার ওপর গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকাল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ

"আপনি কি আমাকে চেনেন?"

"সম্মানিত কর্নেল সাহেব! এখানে এমন কে আছে যে আপনাকে চেনে না?"

সে অকপটভাবে জোরে অট্টহাসি হাসল। মনে হচ্ছে হাসির দমকে রুমটি কাঁপছে। সে আওয়াজে সে সব মজলুম মানুষের বিলাপ ও আহাজারির শব্দ চাপা পড়ে গেল, যাদেরকে খানিক দূরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল।

"শুনুন আপনার সঙ্গে আমি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এবং অকপট মন নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আমার এখানকার কথাবার্তার সাথে তদন্তের কোন সম্পর্ক নেই। আপনি তো জানেন, তদন্ত পর্ব শেষ হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, আপনি বলুন, কি বলতে চাচ্ছেন।"

"আচ্ছা, আহমদ রায়েফ সাহেব! আপনি কি আমার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারেন? আপনি এখন ভুলে যান আমি কে, আমার পদমর্যাদা কি এবং আমরা এখন কোথায় বসে আসি!"

"আপনি যা বললেন, সেটা তো অনেক কঠিন। কিন্তু তবুও আমি ফ্রি হওয়ার চেষ্টা করব।"

ইতোমধ্যে সেনা অফিসার এক কাপ চা নিয়ে এল।

শাম্‌স বাদরান তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"এটা উস্তাদ আহমদ রায়েফকে দাও।"

সেনা অফিসার বড়ই হৃদ্যতা ও হাসিমাখা মুখে আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। আমি খুবই বিস্মিত। আমি এতটাই হতভম্ব যে, চায়ের কাপ আমার হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল। আমি অত্যন্ত তৃপ্তি ও আনন্দভরা মন নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলাম। মওসুমটি ছিল শীতের। আমাদের মত হতভাগা বন্দীদের এমন গরম চা ভাগ্যে জুটা কম কথা নয়।

শাম্‌স বাদরান আবার কথাবার্তা শুরু করল ঃ

"আচ্ছা রায়েফ সাহেব! আপনি কি জানেন, কিছু লোক গোপন পদ্ধতিতে কাজ সমাধার পথ কেন বেছে নেয়?"

"আপনিই বলুন!"

"না, আহমদ সাহেব, আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

"আচ্ছা তাহলে শুনুন, আপনারা অর্থাৎ আপনাদের বিপ্লবী সরকার নাগরিকদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। দেশের জনগণের ওপর একদলীয় শাসন

চাপিয়ে দিয়েছে এবং একজন লোক (জামাল আব্দুন নাসের) নিজের মর্জি মোতাবেক সব কিছুর চাবিকাঠি ঘুরাচ্ছে। আপনারা এবং আপনাদের সরকার কি ভুলের উর্ধ্বে? তাদের থেকে কি কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটতে পারে না? অবশ্যই পারে এবং আপনারা অনেকবারই চরম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন বলুন, আপনারা যে সব ভুল করেছেন বা করছেন, দেশের যে সব জ্ঞানীগুণী এবং বুদ্ধিজীবীগণ আছেন, তাদের কি এসব ভুল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মুখ খোলার অধিকার নেই?

মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীনতাকে ভালবাসে। আপনাদের পক্ষে বেশী দিন পর্যন্ত মানুষকে দাবিয়ে রাখা কঠিন হবে।"

"আহমদ রায়েফ সাহেব! আপনি আপনার বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে বলুন!"

"যদি আপনারা চান গোপন সংগঠন কিংবা গোপন কাজ বন্ধ হোক তাহলে সেটা একটা পদ্ধতিতেই বন্ধ হতে পারে। সেটা হচ্ছে, যারা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করতে চায়, তাদেরকে এ রকম নিশ্চয়তা দিন, নিরাপত্তা দিন যে, তারা যা গোপনে করতে চায় তা তাঁরা প্রকাশ্যে করতে পারে। তারা তাদের মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। এ জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে না।"

"রায়েফ সাহেব! আপনার মতলব কি?"

"জনাব! আপনি তো অবশ্যই জানেন, মিশরে এমন লোকও আছে যারা আপনাদের শাসনকে পছন্দ করেন না?"

"মানুষের বিরোধিতা করা কিংবা ভিন্ন মত পোষণ করা–এটা তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস। সব মানুষ কোন সময় কোন এক বিষয়ে একমত হতে পারে না।"

"মানুষের যদি এ অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে আপনারা সেটা কঠোর হস্তে দমন করার কেন চেষ্টা করেন? এ ব্যাপারে কি আপনারা সফল হতে পারবেন বলে মনে করেন?"

"পার্সোনালভাবে আমি আপনার কথা বুঝার চেষ্টা করছি।"

"আমি যে কথা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হল আপনারা যদি জনগণকে অনুমতি দেন যে, তারা যা করতে চায় প্রকাশ্যে করতে পারে।

আপনারা যদি নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করেন, তাহলে কোন লোকই গোপন সংগঠন, গোপন কাজ করার প্রয়োজন বোধ করবে না।"

"তাহলে আমরা কি জনগণকে রাজনীতি করার এবং রাজনৈতিক দল গঠন করার অনুমতি দেব?"

"জি, আপনাদেরকে এ কাজটি করতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনা, সৎ পরামর্শ শুনতে হবে। এভাবেই গোপন সংগঠন চালু হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হতে পারে।"

"আপনি কি মনে করেন, যারা গোপন পদ্ধতিতে কাজ করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা প্রকাশ্যে নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বলবেন?"

"যদি আইনগত নিরাপত্তা দেয়া হয়, তাহলে তারা প্রকাশ্যে নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথা বলবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই।"

"আপনি তো অনেক গভীর কথা বলে ফেললেন। আপনি চাচ্ছেন, আমরা পলিটিক্যাল কার্যক্রম চালানের সুযোগ বহাল করি এবং রাজনৈতিক দল গঠন করার আইনগত বৈধতা ঘোষণা করি। আপনি আমাকে একটা কথা বলুন, আপনারা গুপ্ত সংগঠন কেন বানিয়েছেন?"

"আপনারা বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন?"

"আমি ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন সম্পর্কে বলছি।"

"কিন্তু আমি তো ইখ্ওয়ানের গোপন সংগঠনের সদস্য নই।"

"তদন্ত রিপোর্টে আপনি স্বীকার করেছেন যে, আপনি গোপন শাখার সদস্য।"

"আপনি কি আমাকে স্বাধীনভাবে কথা বলার অনুমতি দেননি?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই।"

"তাহলে আপনি একদম নির্ভেজাল ও সত্য কথা শুনুন, আমি ইখ্ওয়ানের গোপন শাখার কোন সদস্য নই।"

"যা হোক, আমাদের এ আলোচনার সাথে তদন্তের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমানে যে অবস্থা চলছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় বের করা।"

"আপনি কোন্ অবস্থার কথা বলছেন?"

"সরকারের বিরুদ্ধে যে গোপন তৎপরতা চলছে, সেটা বন্ধ হওয়ার কোন উপায় বের করতে হবে।"

"জনাব, শুনুন!"

"রায়েফ সাহেব! বলুন, কি বলতে চাচ্ছেন?"

"জনাব! এটা কি আশ্চর্যের বিষয় না যে, আমি আপনার সঙ্গে স্বাধীনভাবে আলাপ করতে পারছি। আর আপনি নিজেও চাচ্ছেন, আমি মনে কোন সংশয় না নিয়ে অকপটে আপনার সাথে আলাপ করি। আপনি কি এখানে এখন বুক ফাটা চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন না? এ সব কি আপনার নির্দেশে হচ্ছে না?"

"এখানে যারা এখন বিলাপ করছে, তারা ইখ্ওয়ানের কোন লোক না। তারা হচ্ছে সেনাবাহিনীর সদস্য।"

"আমি একটা সাধারণ বা কমনসেন্সের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে, শাস্তি ও টর্চার করে যে ধরনের কথা আদায় করতে চান, লোকদের কাছ থেকে সেটা স্বীকার করিয়ে নিতে পারবেন।"

"আমি এসব করতে বাধ্য। আপনি একটু ভাবুন, আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন এবং আপনি মিশরের মত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা-ভাবনা করতেন, তখন আপনিও তাই করতেন যা আমি করছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা এমন তথ্য পেয়েছি যে, ইখ্ওয়ানরা সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা তৈরী করেছে। আমি যদি এ তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে চাই, তখন আমাকে কি করা উচিত? আমি মনে করি চাপ সৃষ্টি করা, শাস্তি দেয়া–এগুলো ছাড়া আসল তথ্য উদঘাটনের বিকল্প কোন পথ নেই। এ ভাবেই ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব।"

"জনাব শাম্‌স বাদরান সাহেব! যখন প্রকাশ্যে হক কথা বলার অধিকার হরণ করা হবে এবং নিরীহ, সৎ লোকদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হবে, তখনই গোপন সংগঠনের সমস্যা সৃষ্টি হবে। মানুষ যখন প্রকাশ্যে তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ না পাবে, তখন তারা অবশ্যই তাদের মত প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন বিকল্প পথ বেছে নেবে।"

"এ বিষয় নিয়েই তো আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি।"

শাম্‌স বাদরান এ কথা বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তার হাসির প্রচণ্ড আওয়াজে সমস্ত রুম যেন কেঁপে উঠল।

আমি সবিনয়ে বললাম ঃ

"আমার তো মত এটাই।"

শাম্‌স বাদরানের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে আমাকে বলল ঃ

"এটা কি করে করতে পারি বলুন তো, আমরা জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার সাথে সাথে সরকার পরিচালনার বর্তমান কাঠামোও বহাল রাখতে চাই!"

"যদি আপনারা সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের অধীনে ধর্মকর্ম করার একটা আলাদা বিভাগ তৈরী করেন। তাহলে এর দ্বারাও সাধারণ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় পিপাসা অনেকটা মিটবে।"

"এ ধরনের বিভাগ সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে? আমার তো ধারণা, সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়ন এবং ধর্ম–এ দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয় এবং পরস্পর সাংঘর্ষিক। এ দু'টো এক সাথে চলতেই পারে না। সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নে ধর্মের কোন সুযোগ নেই।"

"জনাব! অবশ্যই কোন না কোন পথ বের করতে হবে, যেন মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন ধরনের আঘাত না লাগে এবং তারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং চিন্তা-চেতনা রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের কোন পন্থা বের করতে হবে। যদি আপনারা চান অবস্থার উন্নতি হোক এবং অরাজকতার অবসান হোক।"

"তাহলে কি মিশরের জনগণ ইখ্‌ওয়ানুল মুসমিলমূনকে ভুলে যাবে?"

শাম্‌স বাদরান তার কথা শেষ করল না। তার সামনে রাখা ফাইলটির প্রতি সে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ফাইল দেখা হয়ে গেলে সে আবার আমার দিকে মনোযোগ দিল। সে বলতে লাগল ঃ

"আপনি যে সব প্রস্তাব দিলেন, এটা একেবারেই অনর্থক। আমরা কখনই এখানে রাজনীতি করার এবং দল গঠন করার অনুমতি দেব না এবং কোন ধরনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ারও অনুমতি দেব না। আর আপনি সোশ্যালিষ্ট ইউনিয়নের অধীনে ধর্মকর্ম করার আলাদা সেকশন প্রতিষ্ঠা করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাও আমরা করব না।"

"তাহলে আমিও সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা মুসলিম জনতার গোপন তৎপরতাকেও বন্ধ করতে পারবেন না, কখনই পারবেন না। গুপ্ত সংগঠন হতে থাকবে, একটার পর একটা। জোর জুলুম

নির্যাতন বর্বরতা চালিয়ে মিশরের তৌহিদী জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনাদের দমন নীতি কখনই সফল হবে না।

কর্নেল সাহেব! আমার একটা কথা মনে রাখবেন, আপনারা ইসলামকে এবং ইসলাম-প্রেমিক লোকদেরকে কখনই দমন করতে পারবেন না। যত দমানোর চেষ্টা করবেন ততই জাগবে ইনশাআল্লাহ।"

এ সাক্ষাতের পর আমি আবার সে রাতেই আমার নির্ধারিত সেলে ফিরে এলাম। আমি এসে আমার সঙ্গীদের কাছে সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ দিলাম। আমার কথা শুনে আমার সঙ্গীদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি নিজেও কম আশ্চর্য নই। এ সাক্ষাৎকার আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তদন্তের দিনগুলো আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল। আমরা নিজেদের সেল থেকে শুধু সকাল বেলা কিছুক্ষণের জন্য বের হতাম। আর সে সময়টা হচ্ছে যখন আমরা পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন সারার জন্য যেতাম। এ ছাড়া বাকী পুরো সময় আমরা সেলের খাচায়ই বন্দী থাকতাম। আমরা সবাই খুব উদগ্রীব থাকতাম, সকাল বেলায় কখন জেলখানার আঙ্গিনায় যাওয়ার সুযোগ হবে এবং সেলের হাঁড় কাঁপানো শীত থেকে রেহাই পেয়ে সূর্যের মিষ্টি রোদ কিছুক্ষণের জন্য হলেও পোহাবার সুযোগ পাব।

একদিন আমরা জেলখানার আঙ্গিনায় অস্বাভাবিক আনাগোনা লক্ষ্য করলাম। সেপাইদের বড় একটা টিম এসেছে। তারা জেলখানার সেলগুলো খুলে বন্দীদেরকে বের করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে লাগল। আমরা তাদের এ রকম অস্বাভাবিক তৎপরতায় অনেকটা বিস্মিত। আমাদের মনে বিভিন্ন শংকা, প্রশ্ন দানা বেঁধে ওঠছে। ইতোমধ্যে একজন সান্ত্রী আমাদের সেলের দিকে আসল। সে দরজা খুলে আমাদেরকে নীচে নামার নির্দেশ দিল। আমরা আনন্দে আটখানা। কেননা, এ প্রথমবার সমস্ত বন্দীকে এক জায়গায় জমায়েত করা হচ্ছে। আমরা একজন আরেকজনকে দেখে মুখে কোন কিছু না বলেই স্মীত হাসি মুখে এনে পরস্পরকে সালাম ও দোয়া দিতে লাগলাম।

কিছু সময় পার হলে আমাদের আরেকটু সাহস হল। আমাদের মধ্যে যাদের কেস একই ধরনের, তারা পরস্পরে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম যে, সে আমার ব্যাপারে তদন্ত অফিসারকে কি কি বলেছে। আমিও তাদের বিষয়ে কি কি বলেছি তা সবিস্তারে জানিয়ে দিলাম। এক বিষয়ে সবাই

এক কণ্ঠ হলাম–যখন আদালতে আমাদের মামলা পেশ করা হবে, তখন বিবৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

এ সমাবেশে আমরা দেশী-বিদেশী অনেক খবর জানতে পেলাম। যেমন, শুনতে পেলাম, প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের আলী সাবরীকে বহিষ্কার করে তার জায়গায় যাকারিয়া মহিউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। এ গুজবও শুনতে পেলাম, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর আমীর সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও জামায়াতের শুরার সদস্যবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। এটাও জানলাম, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে।

এ দিনটা এদিক দিয়ে আমাদের জন্য আনন্দের ছিল যে, আমরা রোদের স্বাদ নিতে পারছিলাম, টয়লেটে স্থিরভাবে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারতে পারছিলাম এবং পানি প্রয়োজন মত খেতে পারছিলাম। যা হোক, যখন সূর্য প্রায় অস্তমিত হচ্ছে, তখন জেলখানার কর্মকর্তারা ঘোষণা দিল ঃ

"কাল থেকে প্রতিদিন বন্দীরা ভোর হলে এখানে আসবে এবং সন্ধ্যা হলে যার যার সেলে ফিরে যাবে।"

এ ঘোষণাতে আমাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কনকনে শীতের সময় মিষ্টি রোদের তাপ গ্রহণ করা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় কামনা।

আমরা বুঝতে পারছিলাম না কেন আমাদের ওপর এ মেহেরবানী করা হচ্ছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন আমরা নিজ নিজ বন্দী সেলে ফিরে এলাম, তখন আমরা উৎফুল্ল মনে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। আমার স্মৃতি শক্তি যদি দুর্বল না হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব, সে রাতের পুরো সময় আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আর আনন্দদায়ক গল্পগুজব করতে করতে কাটিয়ে দিই। ব্যাকুলভাবে আমরা পরবর্তী দিনের সকালের অপেক্ষা করতে লাগলাম, যেন আমরা অন্ধকার বন্দী খাঁচার হিমশীতল বায়ু থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্ত প্রাঙ্গণে একটু বসতে পারি। যেখানে মিষ্টি রোদ হবে, বন্ধুদের গোল আসর হবে এবং টয়লেটের প্রয়োজন স্বাধীনভাবে মেটানো যাবে।

পরের দিন খুব ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই সেপাইরা এসে আমাদের

সেলগুলোর দরজা খুলল এবং আমাদের সবাইকে টয়লেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। আমাদেরকে তারা বলল, যেন আমরা আঙ্গিনায় জমায়েত হওয়ার আগেই টয়লেটের প্রয়োজন সেরে নিই। আমরা সত্যি সত্যি সূর্যোদয়ের অনেক আগেই পায়খানা-প্রস্রাব সেরে নিলাম। আমরা সেলগুলোতে ফিরে এলাম। আমাদেরকে সেই আগের মতই অত্যন্ত বাজে, নিম্নমানের এবং পরিমাণে অতি অল্প নাস্তা দেয়া হল। কিন্তু, এখন আমাদের মন এতই খুশী যে, পেটের ক্ষুধার দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই।

সকাল সাড়ে ছয়টায় জেল-চীফ অর্ডার হাবিলদার আলী আবু যোমা জেল আঙ্গিনায় এসে পৌঁছল। সে হুইসেল বাজাল। তার উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন নিজ নিজ সেলে সতর্ক ও সাবধান হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। হুইসেল বাজলে আমাদের এমন করারই পূর্ব-নির্দেশ ছিল। দ্বিতীয় বাঁশি বাজানো হলে আমরা আগের নির্দেশ অনুযায়ী চোখের পলকের মধ্যে নিজ নিজ সেল থেকে বেরিয়ে এসে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। তৃতীয় বার বাঁশি বাজানো হলে আমরা তাড়াতাড়ি জেলের আঙ্গিণার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম এবং আমরা আগের চিহ্ন অনুযায়ী যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জেল কর্মকর্তারা গতকালকে এসব চিহ্ন ঠিক করে দিয়েছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা ভাবছিলাম যে, হয়ত আমাদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। আমাদের বিপদ কমে আসছে। আমাদের ওপর বর্বরতা বন্ধ হচ্ছে। আমরা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। কিন্তু না, এসবই আমাদের অমূলক ধারণা। পাঠকবৃন্দ, একটু পরেই আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন।

গ্রেপ্তারীর পর প্রথমবারের মত সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহঃ)-এর দর্শন

গ্রেপ্তারীর পর আজ প্রথমবার মহান মুজাহিদ, বিখ্যাত মুফাস্‌সির ও আলেম সাইয়েদ কুতুব শহীদের দর্শন পেলাম। তিনি হাসপাতালের কাছে ধীর পায়ে হাঁটছিলেন। অন্তরের প্রশান্তি তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠছে। দু'চোখ থেকে ঈমানের নূরের বিচ্ছুরণ হচ্ছে। তিনি পা যেভাবে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলছেন, মনে হচ্ছে তাতে কোন প্রাণ নেই। পা দুটো অত্যন্ত ফোলা। জল্লাদদের নির্যাতনের স্পষ্ট স্বাক্ষী। তবে তার চেহারার মধ্যে উদ্বেগ কিংবা বিচলিত হওয়ার কোন চিহ্ন নেই।

তিনি কখনো কখনো স্নেহ-ভরা দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন।

দৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ঃ

"বন্ধুরা আমার! তোমরা ঘাবড়াবে না, বিচলিত হবে না। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এখানে সত্যপন্থীদের পরীক্ষার মুখোমুখী হতেই হবে। এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করলে, দৃঢ়পদ থাকলে আল্লাহর কাছে তার জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ সত্যের একদিন বিজয় অবশ্যই হবে এবং বাতিল পরাজিত হবে।"

আমাদেরকে দৌড়াতে বলা হল। আমরা ভাবলাম, হয়ত ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দৌড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে এটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা নির্দেশ মত দৌড়াতে শুরু করলে বুঝতে পারলাম, দীর্ঘদিন সেলে আবদ্ধ থাকায় এখন দৌড়ানোর শক্তি আর নেই। আমরা এমনও ভেবেছিলাম যে, দৌড় দেয়া হয়ত জরুরী না। যার ইচ্ছা সে দৌড়াবে। আর ইচ্ছা না হয় সে সেপাইদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দৌড়ানো থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু, না আমাদের এসব ধারণা ভুল ছিল। মূলত এ দৌড় আমাদেরকে নির্যাতন করারই অংশ ছিল। এটা হচ্ছে বর্বরতার আরেক পদ্ধতি। যখন কোন বন্দী হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ে যাচ্ছে, সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে চাবুক ও ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এসে তাকে আচ্ছামত পিটাচ্ছে। তার মুখ থেকে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। অনেক ভাইকে দেখলাম, তারা এমনভাবে পড়ে গেল যে, জল্লাদদের ভীষন চাবুকের আঘাত খেয়েও ওঠতে পারছিল না। আবার অনেকে চাবুকের আঘাত খেয়ে আবার দৌড় প্রতিযোগিতায় শামিল হতে বাধ্য হয়েছে। যারাই থেমে যাচ্ছে, তাদের ওপর চলছে লাগাতার হান্টার বর্ষন। এভাবে বিরামহীন দু'ঘণ্টা ধরে চলতে লাগল। এরপর আমরা বড় জেলে ফিরে এলাম। সেখান থেকে আমাদেরকে নিজ নিজ সেলে পাঠিয়ে দেয়া হল। আজ তো আমাদেরকে দৌড়ের আগে সামান্য হলেও নাস্তা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে দৌড়ের পরে আমাদেরকে নাস্তা দেয়া হয়েছে, যেন আমাদের শাস্তি বেড়ে যায়।

সকাল বেলায় দৌড়ানোর পর আমরা যখন সেলে ফিরে আসতাম তখন আমরা ভীষনভাবে ভেঙ্গে পড়তাম। আমরা এতই শক্তিহীন হয়ে পড়তাম যে, খানার দিকে হাত বাড়ানোর শক্তিও থাকত না। ভীষণ ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আমাদের শরীর ঘামে ভিঁজে যেত। দশটা বাজলে আমাদেরকে আবার দৌড়ানোর জন্য

ডাকা হত। আমরা অসহায়ভাবে জেলের আঙ্গিণায় আবার জড়ো হতাম এবং দৌড় লাগাতাম। নির্দেশ ছিল, যেন পুরো দিন আমাদেরকে দৌড়ানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় এ নির্দেশ কার্যকর হত না।

সামরিক জেলের কমাণ্ডার হামযা বাসিওয়ানী বড় জেলে সাদা ঘোড়ায় বসে আসত। সব বন্দী তার সামনে সমবেতভাবে কপট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতাম। তাকে দেখে লোক দেখানো তালি বাজাতাম। লোকটা দম্ভ ও অহংকারে ফুলে যেত। সে সেপাইদেরকে নির্দেশ দিত, যেন বন্দীদের সব গ্রুপকে তার সামনে দৌড়ানো হয়। এ জন্য সেপাইরা তাদেরকে এমনভাবে দৌড়াতে বাধ্য করত যে, অনেক শক্তিমান সবল পুরুষও শক্তিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যেত। সেপাইরা তাদের বড় অফিসারকে খুশী করার জন্য এসব অসহায় বন্দীর ওপর বর্বরতার ষ্টীমরোলার চালিয়ে দিত। হামযা বাসিওয়ানী ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসব অমানুষিক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করত। অহংকারে তার ঘাড় উঁচু হয়ে যেত, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শয়তান দৌড়াতে থাকত।

রোগী ও বৃদ্ধ বন্দীদের এক বিশেষ দল ছিল। এরা দৌড় 'প্রতিযোগিতা' এবং পরিশ্রমের ব্যয়াম থেকে রেহাই পেয়েছিল। এদের বিশেষ পরিচিত ছিল পঙ্গুদের দল হিসেবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় যে সব বন্দী কোন দুর্ঘটনার শিকার হত, তাদেরকেও পঙ্গু দলে পাঠিয়ে দেয়া হত। তবে একমাত্র সে সব বন্দীই পঙ্গুদের দলে শামিল হত যারা ভীষন নির্যাতনের কারণে অচল হয়ে গেছে। বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে।

তকদীরের কি লীলা খেলা দেখুন! পঙ্গু দলের ইনচার্জ এমন এক লোককে বানানো হল, যে সেনা অফিসার গোয়ার্তুমি ও পাগলামীতে কুখ্যাত ছিল। যখন সে রেগে ওঠত, তখন মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারত না। হিংস্র উন্মাদের মত হয়ে যেত। তার নাম হচ্ছে রাশাদ মিফরাজ। যা হোক, অন্যান্যের মধ্যে আমিও পঙ্গুদের দলভুক্ত হলাম। কারণ, আমার পায়ে এত ভীষণ আঘাত লেগেছে যে, দৌড়ানো তো দূরে থাক, হেঁটে চলাই আমার জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আমি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয়ে পড়েছি। কিন্তু, হায় আফসুস! যদি আমি আহত না হতাম তাহলেই ভাল ছিল! যদি আমাকে পঙ্গুদের দলভুক্ত না করা হত, সেটাই ভাল ছিল! পঙ্গুদের জন্য দৌড়ানো জরুরী ছিল না, একটু দ্রুতগতিতে হাঁটলেই চলত। কিন্তু রাশাদ মিফরাজ নামের জল্লাদ যে গ্রুপের

ইনচার্জ ছিল, সে সেই গ্রুপের অক্ষম লোকগুলোকে দৌড়াতে বাধ্য করল। বরং সুস্থ সবল লোকদের চেয়েও বেশীক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দৌড়াচ্ছে। যে কয়েদী দৌড়তে অস্বীকার করত কিংবা অক্ষমতা প্রকাশ করত, তার আর রেহাই ছিল না। সে তার উপর পাশবতা ও হিংস্রতায় মেতে ওঠত। তাকে নির্দয়ভাবে পিটাত। সে গলা ফেড়ে ফেড়ে বলত ঃ

"ও পঙ্গু শয়তানরা! ও খানকীর পোলারা! আমি তোদের সবার শরীরের হাড়-মাংস আলাদা করে দেব। তোদের গোশতের কীমা বানিয়ে দেব, আমার কথার যদি চুলচেরা এদিক-ওদিক হয়।"

খোদার কসম করে বলছি, সে সত্যিই আমাদের ওপর এমন বর্বর আচরণ করছিল যে, আমাদের হাড়-মাংস আলাদা করেই ছাড়ত।

সন্ধ্যায় যখন আমরা সেলে ফিরে আসতাম, আমরা একদিকে ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়তাম। অন্যদিকে ভীষন নির্যাতনের ফলে আমাদের পুরো শরীর ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠত। আগামী দিনের কথা কল্পনা করে আনন্দ দূরে থাক, ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ত। আতংক ও দুশ্চিন্তায় বোবা হয়ে যাচ্ছিলাম। কোন সঙ্গী সেলে এসে অন্য সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলত না। কথা বলবে কি, কথা বলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে বসেছিল।

জেলখানায় সুই, সুতা রাখা নিষিদ্ধ ছিল। আমরা নিজেদের ছেঁড়া-ফাটা পোশাকগুলো সেলাই করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতাম। আমরা কাপড় থেকে সুতা বের করতাম এবং কখনো কখনো আমাদের খাওয়ার জন্য যে মাছ দেয়া হত, আমরা তার কাটাগুলো সুই হিসেবে ব্যবহার করতাম। এভাবে আমরা নিজেদের ছেঁড়া কাপড়গুলো ঠিক করে নিতাম।

হাবিলদার আলী আবু যোমা ভোর বেলায় যখন বন্দীদের দৌড় প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করতে আসত, কোন বন্দীর ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা দেখলেই সে তাকে সারি থেকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করত, সে ছেঁড়া অংশটা কিভাবে সেলাই করেছে? তখন বন্দী লোকটা কি ভাবে কাপড় থেকে সুতা বের করেছে এবং মাছের কাঁটা সুই হিসেবে ব্যবহার করেছে–সব কিছুই আলী আবু যোমাকে বলত। কিন্তু হাবিলদার তার উত্তর মেনে নিত না। তাকে সে অন্য কথা বলার জন্য প্রচণ্ডভাবে পেটাত। মেরে মেরে আধমরা করে ফেলত। মোটকথা দৌড়, ব্যায়াম আমাদের জন্য ভীষন আতংক হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এটা মূলত নির্যাতনের নতুন একটা পদ্ধতি কারা কর্মকর্তারা আবিষ্কার করেছে। এ পদ্ধতি বরদাশ্‌ত করার মত শক্তি আমাদের কারোর ছিল না। আমরা সবাই প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। বেঁচে থাকার মত শক্তিটুকু আমরা হারিয়ে ফেলছি। তবুও আমরা সাহস ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের জীবন বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের শরীরে খোরাক পৌঁছানো। জেল সেপাইরা আমাদের খোরাক থেকে যে অংশ চুরি করত আমরা হিম্মত করে তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতাম। আমাদের অংশের পনির, গোশ্‌ত, রুটি, মিঠাই, ডালের ভর্তা, কালো মধু ইত্যাদি–এসব তারা আমাদের অংশ থেকে চুরি করত। আমরা জীবন বাঁচানোর জন্য মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাদের কাছ থেকে আমাদের হক ছিনিয়ে নিতাম। তা না করলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বেঁচে থাকার আর কোন উপায় ছিল না। শরীরের কর্ম-ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য এটা আমাদের করতেই হচ্ছিল। সেপাইদের থেকে বিভিন্ন জিনিস ছিনিয়ে আনার ব্যাপারে অনেক বন্ধু খুবই চতুর ও পারদর্শী ছিল। এ ব্যাপারে যদি তাদেরকে স্পেশালিষ্ট বলা হয়, তাতে অত্যুক্তি হবে না। কোন বন্ধু পনির, কেউ রুটি, আবার কোন সঙ্গী গোশত ছিনিয়ে আনতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। যে যা কিছু ছিনিয়ে আনত, নিজের সঙ্গীদের মাঝে সমান ভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করত। এর ভিতর থেকে একটা বড় অংশ বৃদ্ধ ও রুগ্ন ভাইদেরকে দেয়া হত। আমি দেখছিলাম, সামরিক জেলখানায় বন্দী ইখওয়ানুল মুসলিমূনের যত সদস্য আছে, তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা, মানবসেবা, দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি ভালবাসা, সহমর্মিতার এত উদ্দীপনা, মানসিক শক্তি ও স্পিরিট এখানে দেখা যাচ্ছে, সত্যিই তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। এ ব্যাপারে তারা মানবতা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের এমন নজির স্থাপন করেছে, যার দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কেরামের (রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আজমাঈন) স্মরণ তাজা হয়ে যায়।

ইখ্‌ওয়ানুল মুসলিমীনের মহান কৃতিত্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রতিটি সদস্য নিজের চেয়ে নিজের সঙ্গীদেরকে বেশী ভালবাসে। তাদের সব সময় ভাবনা, কি করে বন্ধুরা, তাদের সঙ্গীরা আরামে থাকে। তাদের ইখলাস, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আল্লাহ-

অভিমুখীনতা এমন যে, প্রয়োজনে তারা তাদের সঙ্গীদের জন্য জান কোরবান করে দিতে পর্যন্ত পিছপা হয় না। একবার একজন সেপাই দৌড়ানো দল পরিদর্শন করতে এল। সে কোন দিক থেকে একটু ফিসফিস শব্দ শুনল। অমনি সে নির্দেশ দিল, যে লোকটা কথা বলেছে, সে যেন লাইন থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কেউ বের হল না। যে লোকটা ফিসফিস করেছিল, সে মূলত একজন অতিবৃদ্ধ লোক। পঙ্গু দল থেকে বাদ দিয়ে এ দৌড়ানো দলে তাকে ঢুকানো হয়েছে। বুড়ো লোকটা ভয় পাচ্ছিল, সে যদি লাইন থেকে বের হয়, তাহলে সেপাই নির্ঘাত তাকে মেরে ফেলবে। সে একান্তই দুর্বল, অক্ষম ও বলহীন। সামান্য পিটুনিও সে সহ্য করতে পারবে না। এজন্যই সে লাইন থেকে বের হল না। তাই দেখে সেপাই হুমকি দিয়ে বলল, যদি তাকে না বলা হয় কে কথা বলেছে, তাহলে সে পুরো দলটাকে পিটিয়ে তাদের চেহারা পাল্টে দেবে। দলের অধিকাংশই জানে কে কথা বলেছে। কিন্তু একজন লোকও বলল না। সেপাই রাগে ফায়ার হয়ে গেল। সে পুরোটা দিন আমাদের রক্ত চুষতে লাগল। যোহর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত আমাদেরকে ডাণ্ডা ও চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। কিন্তু একটা লোকও মুখ খুলল না! এ সব হচ্ছে ইখ্ওয়ানদের মহান কৃতিত্ব।

ইখওয়ানীদের সঙ্গে সাক্ষাত

উল্লেখ করা যেতে পারে, দৌড়ানো বন্দীদেরকে অনেকগুলো দলে বিভক্ত করা হয়েছিল। যখন বিভিন্ন দল এদিক ওদিক দৌড়াত, তখন এমন অনেক বন্দীর সাথে দেখা হয়ে যেত, যারা ইখওয়ানুল মুসলিমূন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল। দেখা হলে তাদের কাছ থেকে অনেক গোপন কথা জানতে পারতাম। আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার মহান করুণা ও মেহেরবানী দ্বারা তাকে ঢেকে নিন। তিনি হচ্ছেন তাদেরই একজন, যাকে সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর সঙ্গে একমাত্র ইসলামের খাতিরে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। আহমদ আব্দুল মজিদের সঙ্গেও সাক্ষাত হয়েছে। আরো অনেক মহান লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে, যারা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আলেম, ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা, সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ও আকাশের নক্ষত্রতুল্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন ও আদালত একটি নাটক ছাড়া কিছু নয়

ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সমস্যার ব্যাপারে যে সব সূক্ষ্ম বিষয় সামনে এসেছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে, ১৯৫৪ সনে সামরিক জান্তা ইখওয়ানুল মুসলিমূন সংগঠন ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ জারি করে। সেই নির্দেশ অমান্য করলে অমান্যকারীর জন্য কি ধরনের শাস্তি হতে পারে তা নির্ধারন করা হয়নি। অতএব সে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, ১৯৫৪ সনের পর কেউ যদি ইখওয়ান দলকে বহাল করার চেষ্টা করে, তাহলে সেটা আইন বিরুদ্ধ কাজ হবে না। কারণ সব আইনবিদ এ ব্যাপারে একমত, অপরাধ হচ্ছে সেটা, যা আইনে স্পষ্ট করে দেয়া আছে যে, এ আইন লংঘন করলে এ শাস্তি হবে। কিন্তু বলাবাহুল্য, এখানে আইন ও ন্যায়-বিচারের দিকে কার নজর আছে! মিশরে এখন জংলী আইন চালু আছে। প্রতিটি কার্যক্রম, প্রতিটি পদক্ষেপ সে নিয়মে চলছে, যে নিয়মে বনের হিংস্র প্রাণীরা চলে। এদেশে নাগরিকদেরকে কোন ধরনের ওয়ারেন্ট ছাড়াই নিজের ইচ্ছামত ধরে আনা হয়। এরপর তাদের ওপর সব ধরনের অমানুষিক বর্বরতা চালানো হয়। তাদেরকে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে বিভিন্ন পর্বে অমানবিক শাস্তি দেয়া হয়। এরপর আদালতী নাটক করে যেভাবে ইচ্ছা চূড়ান্ত শাস্তি দেয়া হয়।

জেনারেল মুহাম্মাদ ফুয়াদ দাজাভীর সভাপতিত্বে আদালত গঠন করা হল। এ আদালতকে স্টেট সিক্যুরিটি কোর্ট নাম দেয়া হয়। দাজাভীকে যারা

দেখেছে তারা বলেন যে, এ লোকটা হচ্ছে মদ্যপ, অজ্ঞ, মূর্খ, অত্যন্ত দাম্ভিক ও নির্লজ্জ প্রকৃতির।

এ তথাকথিত মেকি আদালতের স্টেজে যতগুলো এজলাস হয়েছে, সেগুলো দাজাভীর নির্লজ্জতা, নিচু প্রকৃতি, মানবতা লংঘনের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

বিচারকদের ব্যাপারে জনগণের ধারণা হল, তারা ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান হবেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক হবেন। সমস্ত অবস্থা, কথা, বিবৃতিকে সত্যের মাপকাঠিতে যাচাই করবেন। দণ্ড দিতে গিয়ে যেন ভুল না হয় তার চেষ্টা করবেন। বিপদের সময় তিনি মানুষের আশ্রয় হন। শুধু তাই নয়, একজন বিচারক শোষন, জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতাকে রক্ষার খাতিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে যান। এসব হচ্ছে জজের ব্যাপারে মানুষের সাধারন জ্ঞান। কিন্তু আমাদের বিচারের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত জজ জেনারেল মুহাম্মাদ ফুয়াদ দাজাভী এসব গুণ থেকে বহু দূরে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বক্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি তার পূর্বসূরী জামাল সালেম ও কর্নেল মেহদাভীর পুরোপুরি পদাঙ্কনুসরন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দাজাভী যেহেতু স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এজন্য তার মধ্যে জামাল সালেম (মিশর, ১৯৫৪ সন) এবং মেহদাভী (ইরাক, ১৯৫৮ সন)-এর মত নাটক খেলার যোগ্যতা ছিল না। এ কারণেই দাজাভীর প্রতিটি আচরণ ও অভিনয়ে নির্লজ্জতা ও নীচু প্রকৃতির ছাপ ফুটে ওঠে। বরং যারা তার কথা শুনে তারা বিস্বাদে তিক্ত হয়ে যায়। শুনানির সময় যদি তিনি কোন কৌতুক করেন, তাহলে সেটা এতই নিম্নমানের হয় যে, উপস্থিত শ্রোতারা কোন ধরনের আকর্ষনবোধ করে না কিংবা সাবাশী দিতেও প্রস্তুত নয়। অথচ, উপস্থিত শ্রোতারা সবাই হচ্ছে তার মোসাহেবের দল। তাদেরকে এখানে এজন্যই আনা হয়েছে, যেন তারা আদালতের পর্যালোচনা শুনে হাতের তালু বাজায়।

এ লাইনগুলো লিখতে লিখতে না জানি কেন আমার মানসপটে ভেসে ওঠল দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক (রাদিঃ)এর শাহাদাতের চিত্রটি। হযরত ওমরের ওপর আত্মঘাতি হামলার পর প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, এর পিছনে কিছু লোকের ষড়যন্ত্রের হাত আছে। হামলাকারী অগ্নিপূজারী ক্রীতদাস আবু লুলু ফিরোজের সাথে তাদের যোগসাজস রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সব লোকের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হল না। নতুন খলিফা

হযরত ওসমান (রাদিঃ)এর পক্ষে একেবারেই সহজ ছিল তখনি ঘোষণা দিয়ে মদিনা নগরীতে যে সমস্ত অগ্নিপূজারী ছিল, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা। তাদের মধ্যে অনেকেই ওপরে ওপরে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বাহ্যিক আমল ও স্বীকারোক্তি থাকলে তাকে কাফের বলা যায় না। এজন্য প্রয়োজন হয় অকাট্য দলীলের। যেহেতু সে সব অগ্নিপূজারীর মোনাফিকীর ব্যাপারে খলিফার কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ ছিল না এবং তারা মুসলমানদের মত ইসলামের বিধান নামায ইত্যাদি পালন করত, সে জন্যই তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ইরানী নও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিলেন না। এটাই ছিল হযরত সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাঁরা কোন ধরনের সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারোর বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। আধুনিক যুগে দেখুন! বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে গুলি করে হত্যা করা হল। যে লোক গুলি চালিয়েছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়নি। বলা হল, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের জন্য কোন ধরনের বিশেষ আইন নেই। তিনিও সাধারন মানুষের মত একজন মানুষ এবং যে বিধান সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তা তাঁর জন্যও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মিশরের অবস্থা একেবারে ভিন্ন। এখানে আইনের শাসন ভুলণ্ঠিত।

মোটকথা, জেনারেল দাজাভী আদালতী কার্যক্রম শুরু করলেন। সূচনাতেই তিনি ইসলাম-প্রেমিক বন্দীদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলতে লাগলেন ঃ

"এ সব মোল্লা ও ধর্মের ধ্বজাধারী আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমাদের মহান বিপ্লবী নেতার বিরুদ্ধে অমুক অমুক অপরাধ করেছে। তারা অমার্জনীয় পাপের কাজ করেছে। তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে।"

দাজাভীর প্রাথমিক কথা শুনেই আদালতে উপস্থিত উকিলগণ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সরকারী উকিলের (এটর্নি জেনারেল) আসামীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের আগেই বিচারপতির এমন আচরণ খুবই হাস্যকর ব্যাপার। তার বক্তব্যের পর উকিলদের জেরা, প্রশ্নোত্তর–এগুলোর কোন যুক্তি ও গুরুত্ব থাকেনি। কারণ, স্বয়ং বিচারক অভিযুক্তদেরকে শুরুতেই দোষী সাব্যস্ত করছেন। অথচ, আইন ও আদালতের দৃষ্টিতে প্রথমেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না। বরং আসামী হচ্ছে

নির্দোষ। হ্যাঁ, আদালতি কার্যক্রম চালানোর পর যখন দলীল প্রমাণের দ্বারা দোষ প্রমাণিত হয় তখনই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

বিচারপতি দাজাভী সাহেবের মানসিক অবস্থা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় এ আদালত একটা নাটক ও প্রহসন বৈ কিছু নয়। তবুও এ মেকি আদালতের আদালতি কার্যক্রম ঐ সময়কার পত্রপত্রিকাতে বড় বড় হেডলাইনসহ প্রচার হতে থাকে। তবে এমন কিছু দিক আছে যেগুলো প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়নি। সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলে হয়ত পাঠকগণ উপকৃত হবেন। এসব দিক আলোচনা করে আমি পাঠক ভাইদেরকে বুঝাতে চাই, ইখওয়ান সহ ইসলাম প্রেমিক লোকদের বিরুদ্ধে এ আদালত গঠন একটা নাটক, প্রহসন ও জালিয়াতি বৈ কিছুই নয়।

প্রহসনের আদালত

দাজাভীর সম্মুখে যে সব মোকদ্দমা পেশ করা হয়, তার মধ্যে খাত্তাব কেস হচ্ছে সবচেয়ে আলোচিত।

কেসটির সারমর্ম এই ঃ

"খাত্তাব হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার একজন ইখওয়ান সদস্য। ১৯৫৪ সনে ইখওয়ানের ওপর যে বর্বরতা চালানো হয়, তারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে জামাল আব্দুন নাসেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার কিছু বন্ধুকে নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে। তবে খাত্তাব ও তার সঙ্গীদের মাঝে এ বিষয়টা নিয়ে কয়েক দফা মত বিনিময় হয়। অবশেষে, সিদ্ধান্ত হয় যে, হত্যার পরিকল্পনা বাদ দেয়া হোক এবং এ ধরনের অবাস্তব চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে কোন গঠনমূলক কাজ করা হোক, যাতে দেশের কল্যাণ হয় এবং মিশরের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপামর জনসাধারণের মাঝে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে যে, ইখওয়ানের সদস্যরা যে যে পেশায় কাজ করছে, তারা সেই পেশায় নিয়োজিত অন্য সঙ্গীদের পিছনে কাজ করবে। অফিসের সহকর্মী, বন্ধু, প্রতিবেশী, পরিচিত লোকদের চরিত্র গঠন ও তাদেরকে খোদাভীরুরূপে তৈরী

করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

তাদেরকে মহানবী (সা) ও সাহাবাদের আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। এ ধরনের ইসলাহী (সংশোধনমূলক) কাজ করার জন্য কোন ধরনের সংগঠন বানানোর প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করলেই হবে। এ সিদ্ধান্তের পর খাত্তাবের স্ত্রী ১৯৫৪ সনের শীতের এক রাতে নিজের বোনকে সঙ্গে নিল। তারা সে সব বিস্ফোরক, দ্রব্য যা দিয়ে জামাল আব্দুন নাসেরের ট্রেন উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল, সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে ফেলে দিল এবং পুরো স্কীমটি সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হল। ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করা হল না। আইনের ভাষায় এ ধরনের কাজকে "অপরাধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ" বলা হয়। কেসটির ধরন এরূপ দাঁড়াল, কিছু লোক একজন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করার বিষয়ে একমত হয়েছে। কিন্তু পরে সে পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়, বরং সেটিকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করা হয়। খাত্তাব প্রমুখের কেসের ধরন অবিকল সে রকম। তাদেরকে যখন দাজাভীর কোর্টে পেশ করা হল, তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে, তারা জামাল আব্দুন নাসেরের হত্যা পরিকল্পনার সূচনা করেছে। এ কারণে দাজাভী কোর্ট কর্তৃক খাত্তাব ও তার সঙ্গীদেরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। অথচ, একটু আগে যেমন বলা হয়েছে যে, এ বিষয়টা প্রমাণিত হয়েছে যে, খাত্তাবরা কোন ধরনের অপরাধ করেনি। কারন, তারা অপরাধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিল। খাত্তাবের শ্যালিকা যে রাতে তার বোনের (খাত্তাবের স্ত্রী) সাথে বিস্ফোরক দ্রব্য সমুদ্রে ফেলে দিতে গিয়েছিল, সে সময় সে অবিবাহিত ছিল। ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর তার বিয়ে হয়। ১৯৬৫ সনে যখন ইখওয়ানীদের ধরপাকড় হচ্ছিল, তখন সে মহিলা এবং তার স্বামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাদেরকে পৃথক পৃথক জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথম দিকে তার স্বামী পুরো ঘটনা সম্পর্কে বে-খবর ছিল এবং সে তার গ্রেপ্তারীতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন জেলের ভিতর তাকে তদন্তের পর্বগুলো অতিক্রম করতে হয়, তখন তার বুঝে আসে কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে। তার ওপরও চলতে থাকে ভীষন অমানুষিক নির্যাতন। তখন বন্দী জীবনের এ কয়টি বছরে সে অনেক কিছুই জানতে পারে। তার বিরুদ্ধে আদালতি কোন কার্যক্রম চালানো হয়নি এবং কোন ধরনের আপীল বা প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগও সে পায়নি।

জামাল নাসের হত্যা করার অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে হয়, আসামীদের বিরুদ্ধে যে সব তদন্ত হয়েছে এবং নির্যাতন চালিয়ে তাদের থেকে সত্য-মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে, সেগুলো থেকেও এ বিষয়টা প্রমাণিত হয় না যে, কোন লোক জামাল আব্দুন নাসেরকে হত্যা করতে গিয়েছিল। সর্বোচ্চ যে কথাটুকু সামনে আসে, সেটা হচ্ছে এ রকম, বকর ভাবল, যায়েদ যেন নিহত হয়। শুধু এটুকু ভাবার কারণে যদি বকরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তাহলে দণ্ডদানকারী আইন ও আদালত আশ্চর্যের বস্তু হবে না তো আর কি হবে! কিন্তু মিশর সত্যিই একটা আজব দেশে পরিণত হয়েছে। এখানে মানুষের মনের কল্পনা এবং তাদের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করেও কঠোর শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

হুসাইন তৌফিক নামে এক বন্দী আদালতি কার্যক্রম চলার সময় তথাকথিত আদালতের প্রধান বিচারকের সামনে তার ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। সে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলিষ্ঠকণ্ঠে বলল ঃ

"আদালতের জজ সাহেব! যদি আমরা আসমানের বিরুদ্ধেও বিপ্লব করার চেষ্টা চালাতাম, তাহলে সেও আমাদের সাথে এমন বর্বর আচরণ করত না, যেমনটি আপনারা করেছেন।"

মামলা প্রস্তুত করার জন্য নিরাপত্তা রক্ষী বিভিন্ন সংস্থা যে বর্বর পদ্ধতিতে তদন্ত করেছে, তার ফলে শত শত মানুষ অত্যন্ত মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জন ছিলেন উন্নত মানব সন্তান।

তাদের যে কয়জনের নাম আমি জানতে পারি তারা হচ্ছেন, যাকারিয়া মাশতুলী (রহঃ), বদর কুসাইবী (রহঃ), আহমাদ শালান (রহঃ), মুহাম্মাদ আওয়াদ (রহঃ) এবং ইসমাঈল ফাইউমী (রহঃ)।

তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি স্বচক্ষে শাহাদাতবরণ করতে দেখেছি। যেমন, যাকারিয়া মাশতুলী, বদর কুসাইবী ও আহমাদ শালান। আবার কয়েকজনকে শাহাদাতের পথে এগিয়ে যেতে দেখেছি। তারা হচ্ছেন মুহাম্মাদ আওয়াদ ও ইসলমাঈল ফাইউমী। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে নিন, আমীন।

তথাকথিত আদালত যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাঁরা হচ্ছেন, সাইয়েদ কুতুব (রহঃ), শেখ আব্দুল ফাত্তাহ, ইসমাঈল (রহঃ) ও উস্তাদ মুহাম্মাদ ইউসুফ হাওয়াশ (রহঃ)।

আদালত হচ্ছে নিছক একটা নাটক. যার ভাষা হচ্ছে বাজারী, অভিনয়

নিম্নমানের এবং উপস্থাপনা অত্যন্ত বাজে। এ নাটকের দর্শক হচ্ছে সে সব অসহায়, মজলুম নিরীহ লোক, যারা নিজেদের মান সম্মান হারিয়েছে। তাদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করেছে সে বিধান, সে শাসন, যে মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। যে বিধানের পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহর জমিনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য ব্যয় হচ্ছে। যে বিধান আপনজনের বিরুদ্ধে সিংহ আর শত্রুর সামনে ভেজা বিড়াল। এ আদালতি নাটকের সামনে সে সব সাহসী যুবককে ঠেলে দেয়া হয়েছে, যাদের বক্ষ ঈমানের জ্যোতিতে দ্বীপ্তীমান, যাদের মন পর্বতের চেয়ে দৃঢ় এবং যাদের কৃতিত্ব জ্যোতির্মান সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, আলোকিত।

তারা জানতেন তাদের ওপর কি কি বিপদ আসছে, তাদেরকে কী ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এ সব বীর মুজাহিদ বাতিল শক্তির সামনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং দৃঢ়তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ততার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা আদালতি নাটকের মুখোমুখি হয়েছেন। এরপর তকদীরের ফায়সালাকে হাসিমুখে ও আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তথাকথিত বিচারক দাজাভীর সামনে.দ্যর্থহীনভাবে হক কথা বলেছেন। কিন্তু যেমন আগে বলেছি, দাজাভীর উদাহরণ হচ্ছে একজন অভিনয়ে ব্যর্থ জোকারের মত। অথচ তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ন্যায়বিচারকের অভিনয় করার জন্য। এ ধরনের অভিনয় করার জন্যও কিছু না কিছু মেধা ও বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু দাজাভীর মামুলী যোগ্যতাও ছিল না। সাইয়েদ কুতুব ভীষন শারীরিক ও মানসিক চাপ সত্ত্বেও জোকার দাজাভীর সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। মনে যা ছিল মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সে সময় আদালতে মিশরের বিভিন্ন সংবাদপত্রের অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সে সময়কার সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! তাদের কোন নীতি ছিল না। মানবতা ও নৈতিকতাবোধ থেকে তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তারা অর্থ ও পার্থিব লালসার পূজারী হয়ে গিয়েছিল। সাইয়েদ কুতুব তথাকথিত বিচারপতি দাজাভী ও হৃদয়হীন সাংবাদিকদের সামনে সে সব লোমহর্ষক ও বর্বর কাহিনী ব্যক্ত করলেন, যার শিকার হয়েছেন ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর সদস্য সহ হাজার হাজার ইসলাম প্রেমিক বন্দীগণ। জামাল নাসের সরকারের সৈনিকরা নিরীহ নিরপরাধ লোকদের ওপর যে

পাশবিক নির্যাতন করেছে তা যে মানবতা বিরোধী, আইন ও ইসলাম বিরোধী এবং মানবতার চরম লঙ্ঘন, তিনি তা ভরা আদালতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ

"প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিয়েছেন ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর মাখলুকের সেবার জন্য। তিনি নিজেকে প্রগতিবাদী, মানবতাবাদী ও স্বাধীন চেতনার দিশারী মনে করেন। অথচ তিনি মিশরের জনগণের সাথে চরম অন্যায় আচরণ করে যাচ্ছেন। তাদের সেবা তো দূরের কথা তাদের রক্ত চুষছেন। প্রতিটি পদে মানবাধিকার লংঘন করছেন এবং তৌহিদী জনতার স্বাধীনতা খর্ব করে তাদেরকে পরাধীনতার বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। একটি মিথ্যা কল্পকাহিনী তৈরী করে প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের ইখ্‌ওয়ান সহ অন্যান্য ইসলাম প্রেমিক লোকদের দমন অভিযান চালাচ্ছেন। জেল, হত্যা, নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছেন। তাঁর এ ব্যাপারে কোনই চিন্তা নেই যে, একদিন তাঁকে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হতে হবে। তাঁর প্রতিটি জুলুম ও অন্যায় আচরণের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ পাক যে ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করবেন সেখানে জালেমরা পুরোপুরি তাদের অন্যায় কর্মের প্রতিফল পাবে। মজলুমরা পাবে সঠিক ন্যায় বিচার। আমি প্রেসিডেন্টকে, বিচারপতিকে এবং এখানে যারা রয়েছেন তাদেরকে এবং যারা সরকারী কর্মকর্তা তাদের সকলকে এ আহ্বান জানাতে চাই, আমরা যেন ন্যায় ও ইনসাফের পথ অনুসরণ করি; খোদাদ্রোহিতার পথ পরিহার করি। আল্লাহ পাক আমাদের হক কথা বলা ও শোনার তৌফিক দান করুন। আমীন।"

আদালত কক্ষে সাইয়েদ কুতুব শহীদের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসির রোল পড়ে গেল। সে হাসিতে যোগ দিয়েছেন বিচারকের আসনে বসা দাজাভী, গোয়েন্দা, জল্লাদ ও অর্থ দিয়ে কেনা সরকারী দালালরা। তাদের বাকা চাহনিতে রয়েছে সাইয়েদ কুতুবের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা। তাদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। তাদের হীন পরিকল্পনা সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুব সবকিছুই জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি সত্য কথা বলে ফেললেন। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, তাঁর ওপর জেলখানায় যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। তিনি যা কিছু বলেছেন, অন্যান্য মজলুম নির্যাতিত লোকদের কথাই বলেছেন।

শহীদ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস

একবার জেলখানার সেপাইরা আমাকে ও আমার অন্যান্য সঙ্গীকে কেন্টিন থেকে খাবার আনার দায়িত্ব দিল। রাস্তায় সাইয়েদ কুতুবের সাথে দেখা। বিরাট সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "হযরত! আপনি নাসেরীদের কাছ থেকে কি আশা করেন?"

সাইয়েদ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুচকি হাসলেন। একান্ত অচঞ্চল, শান্তহৃদয় ও ধীরকণ্ঠে বললেন, "আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।"

সাইয়েদ সাহেবের বদ্ধমুল ধারণা; বরং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নাসেরী তাগুতরা তাকে শহীদ করে ফেলবে। কিন্তু, তিনি আদালতে যা বলেছেন, ইতিহাসের পাতায় আসল ঘটনা সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বলেছেন। তাগুতী শক্তি এ ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু অনেক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তারা তাতে সফল হয়নি। বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, কারা জালেম ও কারা মজলুম এবং কারা ছিলেন দেশের প্রতি বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক এবং কারা দেশের শত্রু।

আজ মিশরে সাইয়েদ কুতুবের নাম উচ্চারিত হলেই সবার মুখ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জামাল নাসের ও তার জল্লাদদের কথা আসলে মানুষের মুখ থেকে থুথু আর অভিশাপ বের হয়। সাইয়েদ অমর হয়ে আছেন। তাঁর শত্রুরা নিশ্চিহ্ন গেছে।

জেনারেল দাজাভী, যাকে আদালতি ট্রাইবুনালের প্রধান বানানো হয়েছে, তাঁর পূর্বের ইতিহাস অত্যন্ত কলঙ্কজনক। ১৯৫৬ সনে মিশরের ওপর ত্রিপক্ষীয় হামলায় ইহুদীরা যখন গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়, তখন তারা জেনারেল দাজাভীকে গাজার গভর্ণর নিয়োগ করে। ইহুদীদের পরিকল্পনা ছিল, গাজা অঞ্চল থেকে মিশরীয় ও ফিলিস্তীনীদেরকে যে কোন উপায়ে বহিষ্কার করা। উদ্দেশ্যে হল এলাকাটি একমাত্র ইহুদীদের জনবসতি হিসাবে গড়ে তোলা। জেনারেল দাজাভী "গাজার সিংহ" নামে ভূষিত ছিল। কারণ সে ইহুদীদেরকে এ ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করেছে। সে মিশরীয় ও ফিলিস্তীনী মুসলমানদেরকে এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে। এরপর সে ইসরাইলী রেডিওতে খুব কড়া বক্তৃতা দেয়। তাতে সে

মিশর সরকারের অনেক দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে। বক্তৃতায় সে নিজের জন্য এমন সব উপাধী ব্যবহার করে যা শুনলে যে কোন মানুষের মাথা লজ্জায় অবনত হবে। জেনারেল দাজাভীর এ বিশ্বাসঘাতকতামূলক তৎপরতা দেখে তৎকালীন গাজা হাইকোর্টের বিচারপতি মুহাম্মাদ মামুন আল-হুদায়বী এর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি আরব জনবসতীকে ইহুদী ও দাজাভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে এ অঞ্চল ছেড়ে না যাওয়ার জন্য সাহস যোগাতে লাগলেন। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে ইহুদী-দাজাভী প্লান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর দাজাভীর দুঃসময় আসে। মিশরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জামাল নাসেরের পা ধরে দাজাভী মাফ চায়। কিন্তু জামাল নাসের তাকে এক শর্তে ক্ষমা করতে রাজি হলেন–সে কোন অস্বাভাবিক ধরনের কাজ করে দেখাবে। এখন দাজাভীর জন্য সেই কাঙ্খিত সূবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।

মিশরের নব্য ফেরাউন জামাল আব্দুন নাসের ইসলাম ও ইসলাম-পছন্দ লোকদের বিরুদ্ধে চরম বৈরী ভাব পোষন করতেন। আমেরিকা ও রাশিয়া তাঁর মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিগড়ে দিয়েছিল। তাদেরই ইশারা-ইঙ্গিতে জামাল আব্দুন নাসের আরববিশ্বে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহি দল ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূনকে নির্মূল করার জোর প্রচেষ্টায় মেতে ওঠেছে। ইসলাম বিদ্বেষী জামাল নাসের ভাবছিল, ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূনকে নির্মূল করতে হলে বিভিন্ন আদালতি ট্রাইবুনালের প্রধান এমন এমন লোকদের বানাতে হবে যারা চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং যাদের মধ্যে মানবতা বলতে কিছু নেই। এক কথায়, তাদেরকে হতে হবে নির্দয় ও হিংস্র। অনেক চিন্তাভাবনার পর তার মনে পড়ে গাজায় পরাজিত মিশরীয় জেনারেল দাজাভী ও তার ইহুদী প্রেমের কথা। সে তাকে ডেকে একটি আদালতি ট্রাইবুন্যালের প্রধান বানিয়ে বলল ঃ

"দাজাভী! যে শর্তে তোমাকে ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল, সে অস্বাভাবিক কাজ করার সময় এসে গেছে। ইখ্ওয়ানী ও ইসলামপছন্দ লোকদের ব্যাপারে কোন ধরনের অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না। মনে রাখবে, আদালত বা ন্যায় বিচার আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আফিমখোর সদৃশ মোল্লা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নির্মূল করা। ধর্মের ধ্বজাধারীদেরকে খতম করে দেয়া যেন ইসলাম ইসলাম করে এসব কীটরা চেচামেচি করতে না পারে।"

জেনারেল দাজাভী প্রেসিডেন্টের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করল।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এখন দাজাভী আদালত কক্ষের বিচারপতির আসনে বসে আছে। তার আদালতে আসামী হয়ে উপস্থিত হয়েছেন গাজার প্রাক্তন বিচারপতি মুহাম্মাদ মামুন হুদায়বী। একদিকে মুহাম্মাদ মামুন আল হুদায়বীর মত নির্ভীক, সৎসাহসী ও হকপন্থী বিচারপতি আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। আর অন্যদিকে কর্কশভাষী, জ্ঞান ও আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নকল বিচারক দাজাভী আদালতের বিচারপতির আসন অলংকৃত করে আছে। বিচারপতি দাজাভী জনাব হুদায়বী সাহেবকে জেরা করছে। তার সাথে বাহাসে লিপ্ত হয়েছে। হুদায়বী সাহেব তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। তিনি দাজাভীর ব্যক্তি সম্পর্কে ভালকরেই জানেন। সে যে আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না, এ সম্পর্কেও তিনি জানেন। তিনি দাজাভীর সাথে মোটেও বাহাস করতে প্রস্তুত নন। তা সত্ত্বেও তাকে অহেতুক বিতর্কে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। নকল বিচারপতি টেবিলের ওপর জোরে জোরে হাত মেরে মুহাম্মাদ মামুন হুদায়বীকে যিনি অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, লক্ষ্য করে বলল ঃ

"আমি যা বলছি, আইন এটাই বলে।"

মামুন হুদায়বী অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে তাকে উত্তর দিয়ে বললেন ঃ

"আপনাকে কে বলেছে, আইন এটাই বলে?"

দাজাভী চিৎকার দিয়ে ওঠল। সে বলল ঃ "আমি বিচারপতি। আমি জানি, আইন কি বলে।"

মামুন হুদায়বী একটি তিক্ত মুচকি হাসি হেসে বললেন ঃ

"জজ সাহেব! আপনি যা বলছেন, আইনের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই।"

আদালত কক্ষে উপস্থিত উকিলগণ স্মিত হাসল। কিন্তু, তারা তাদের হাসি আস্তিন দিয়ে লুকানোর চেষ্টা করল। তারা দেখছিল, কিভাবে মামুন হুদায়বীর মত জ্ঞানী-গুনী নির্ভীক ব্যক্তি দাজাভীর গলা শুষ্ক করে দিচ্ছেন।

বন্দীদেরকে যখন আদালতে হাজির করা হত, তাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছেদ, শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হত। তাদের ঘর থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চেয়ে এনে তাদেরকে পরিয়ে দেয়া হত। তাদেরকে

নির্দেশ দেয়া হত, যেন জুতো ভাল করে পালিশ করে নেয়। তারা যখন জেলখানার সেলে নিজেদের সাজগোজের কাজে ব্যস্ত হত, তখন তাদের অবস্থা দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। তাদের কাপড়ের ক্ষণিকের চাকচিক্য দেখে আমরা কিছুটা রসিকতা করতাম। তবে আমরা তাদেরকে খানিকটা ঈর্ষাও করতাম। কারণ, যখন আদালতে যাবে, তখন তো তারা কায়রোর সড়ক দিয়ে যাবে। ফলে অনেক দিন পর তাদের কায়রো নগরীর ঝলক দেখার সুযোগ হবে। আমাদের তো সে সুযোগটাও নেই। বদনসীব কায়রো নগরী জানে না, এসব অসহায় বন্দীর জীবনে কত দুঃখ বেদনা বয়ে যাচ্ছে।

হায় প্রহসন!

আদালতি প্রহসনের একটু বর্ণনা শুনুন। একজন ইখ্ওয়ানী বন্দী হচ্ছেন মনসূর আব্দুয যাহের। তাকে আদালতে হাজির করা হল। তিনি বিচারপতি জেনারেল দাজাভীর সামনে নিজের কাপড় খুললেন। শরীর বস্ত্রমুক্ত করে 'আদালত'কে সে সব যখম দেখালেন, টর্চারিংয়ের সময় যেগুলো তিনি পেয়েছেন। যথারীতি নকল বিচারপতি মনসূর আব্দুয যাহেরের ফরিয়াদের প্রতি কর্ণপাত করল না। আদালতের কার্যক্রম শেষ হল। সমস্ত বন্দীকে আবার সামরিক জেলে নিয়ে আসা হল। জেলখানার গেইটে জেল কর্মকর্তারা সবাইকে নির্দেশ দিল নিজ নিজ কাপড় খুলে হাতে নেয়ার জন্য। নির্দেশ পাওয়া মাত্র আসামীরা কাপড় খুলে ফেলল। এরপর তাদের ওপর চাবুক ও ডাণ্ডা পিটুনি শুরু হল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষখেকো কুকুরগুলো লেলিয়ে দেয়া হল। এভাবে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল বড় জেলখানার আঙ্গিণায়। শোরগোল, চিৎকার, বিলাপ শুনে আমরা যার যার সেলের দরজার ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঁকি মারলাম। এরপর যা দেখলাম তাতে আমাদের হৃদয় ফেটে যাচ্ছিল। দেখলাম, সেপাইদের একটা দল বন্দীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিরীহ বন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদেরকে নির্মম শাস্তি দিচ্ছে। পরে জানতে পারলাম, যে বন্দী (মনসূর আব্দুয যাহের) নিজের শরীর বস্ত্রমুক্ত করে আদালতকে নির্যাতনের চিহ্নগুলো দেখিয়েছে তাকে সবচেয়ে বেশী টর্চার করা হয়েছে। প্রচণ্ড ঘুষির আঘাতে তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ নীলবর্ণ হয়ে গেছে। এত ফুলে গেছে যে, এখন চোখই দেখা যায় না। তার মাথায়ও মারাত্মক আঘাত লেগেছে।

পরের দিন রুটিন অনুযায়ী বন্দীদেরকে আবার আদালতে হাজির করা হল মামলার কার্যক্রম চালু রাখার জন্য। আদালতে উপস্থিত সকলে আসামীদের মুমুর্ষ অবস্থা দেখল। বন্দীদের সবারই চেহারা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। নকল বিচারপতি জেনারেল দাজাভী তাদের যখমে আরো লবন ছিটানোর জন্য ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞেস করল ঃ

"মনসূর আব্দুয যাহের কোথায়?"

মনসূর আদালতের কাঠগড়ায় সঙ্গীদের সাথে হাজির ছিল। সে সবার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো গভীর নীলবর্ণ হয়ে গেছে। এত বেশী ফুলে গেছে যে, চোখ দেখা যাচ্ছে না। দাজাভীর আওয়াজে সাড়া দিয়ে বলল ঃ

"জি মাননীয় আদালত! হাজির আছি।"

"তোমার চোখে কি হয়েছে?'

মনসূর বিস্ময়ে হতবাক, কসাই বিচারপতি তাকে চোখের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করছে! মনসূর খুবই কষ্টে দাজাভীর দিকে তাকাল।

দাজাভীর চাহনিতে বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ ফুটে ওঠছে। খোদার কসম করে বলছি, সে সময় মিশরের সমস্ত নামকরা পত্রিকার সাংবাদিকগণ সেখানে উপস্থিত ছিল। মনসূর চাপা কণ্ঠে জজকে উত্তর দিল ঃ

"আমার চোখে কিছুই হয়নি মাননীয় আদালত!"

দাজাভীর ভেতরে শয়তানী জযবা বেড়ে গেল। সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ

"কিছু হয়নি মানে? আমি তো দেখছি, তোমার চেহারা বিগড়ে গেছে, চোখ ফুলে গেছে, তোমার ওপর কি জেলখানায় নির্যাতন হয়েছে?"

মনসূর কাঁপতে লাগল। তার মনে পড়ল, কাল সত্য কথা বলায় বড় জেলের গ্রাউণ্ডে তার ওপর কি ভয়ানক বিপদ এসেছিল। সে তখনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ

"না, না, আমাকে কেউ মারেনি।"

"কিন্তু তোমার চেহারা তো নীল হয়ে গেছে! চোখ মারাত্মকভাবে ফুলে গেছে। এর ব্যাখ্যা কি দেবে তুমি?" নকল বিচারক জিজ্ঞেস করল।

"আসলেই এর কারণ আমার জানা নেই মাননীয় আদালত!"

"আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই জানো না, তোমার চেহারায় এ আঘাত কেন লেগেছে?"

মনসূর ঢোক গিলে বলল ঃ

"না, আমি এর কারণ সত্যিই জানি না। আমি যখন সকালে ঘুম থেকে জাগলাম, তখন জানলাম, আমার চেহারা ফুলে যাচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।"

"আচ্ছা, এমন তো হয়নি যে, তুমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কিংবা নামার সময় উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলে, যার ফলে তুমি এ রকমের আঘাত পেয়েছ?"

"হতে পারে। তাই হয়ত হয়েছে। এখন তো আমার মনে নেই।" মনসূর আব্দুয যাহের উত্তর দিল।

নকল বিচারক ও আসামী মনসূর আব্দুয যাহেরের মাঝে যখন প্রশ্নোত্তর হচ্ছিল, তখন বিবেকবর্জিত সাংবাদিকরা ও কাপুরুষ উকিলরা হেসে আটখানা। তারা আদালতি নাটক দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা। যেমন প্রাচীন যুগে রোমান সমাজে বিনোদনের জন্য নিরীহ খ্রিস্টানদেরকে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ছেড়ে দেয়া হত। আর রোমানরা খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি ভরে সেই রক্তাক্ত দৃশ্য দেখত, কিভাবে সিংহ মজলুম মানুষটার উপর আক্রমণ করছে এবং তার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাচ্ছে! এসব দেখে তারা খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে যেত এবং আনন্দে, স্ফুর্তিতে নাচানাচি করত!

দ্বিতীয় আদালতি ট্রাইবুন্যালের প্রধান ছিলেন জেনারেল আলী জামালুদ্দীন মাহমূদ। এ লোকটা ঘটনাক্রমে অত্যন্ত ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আমার বুঝে আসেনি, এ রকম ভাল মানুষটাকে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের জন্য কেন নির্বাচিত করা হয়েছে। মোটকথা, জেনারেল আলী জামালুদ্দীন ছিলেন একজন সহৃদয় এবং স্বাধীন চেতা ব্যক্তি। তিনি অঙ্গিকার করেছিলেন, তিনি সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল বলে ঘোষণা করবেন। সেই রায়ই দিবেন যা তার বিবেক, মানবতাবোধ, মহানুভবতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই তিনি কয়েদীদের সাথে খোলা মনে, হাসি মুখে কথা বলতেন। তাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন এবং প্রতিটি আসামীকে বলতেন ঃ

"তোমার ওপর কি নির্যাতন করা হয়েছে? ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যা কিছু সত্য, নির্ভয়ে বর্ণনা কর, তোমাকে কিছু বলা হবে না।"

মনসূর আব্দুয যাহেরের ঘটনার পর কোন আসামী আর স্পষ্টভাষায় কথা বলার সাহস করত না। কিন্তু, বিচারপতি জামালুদ্দীন মাহমূদ বন্দীদের মধ্যে যদি কারোর চেহারায় কোন ধরনের যখমের চিহ্ন দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে

জিজ্ঞেস করতেন, তার এ যখম কিভাবে হয়েছে। তিনি বারবার এ কথা বলতেন ঃ

"তোমার এ যখম অবশ্যই নির্যাতনের কারণে হয়েছে।" কিন্তু আসামী বারবার একই কথা বলত ঃ "জেলখানায় আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করা হয়েছে।"

বন্দীদের অভয় দেয়া সত্ত্বেও তারা সত্য বলার সাহস পেত না। সমস্ত ইখ্ওয়ানী বন্দীর বক্তব্য শোনার পর আলী জামালুদ্দীন তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইখ্ওয়ানী বন্দীরা যখন আদালতী কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর জেলখানায় ফিরে আসত, তখন তারা আমাদেরকে আলী জামালুদ্দীনের কাজের বিবরণ শুনাত। তারা তার সদাচারণের কথা মনের গভীর থেকে আন্তরিকতার সাথে ব্যক্ত করত এবং তাঁর সৎ সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করত। কিন্তু আমরা তাদের কথা মানতাম না এবং বলতাম, "ভাই আপনারা তার ব্যাপারে বাড়িয়ে বলছেন।"

যে তারিখে আলী জামালুদ্দীন ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন মামলার রায় শোনাতে চেয়েছিলেন এবং এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, তার ট্রাইবুন্যালে যে সব বন্দীর তিনি বিচার করছেন, তাদেরকে তিনি বেকসুর খালাস দিবেন, সে তারিখ আসার কিছুদিন আগে মিশরের তিনটি প্রধান পত্রিকার (আল আহরাম, আল জামহুরিয়্যাহ, আখবার আল ইয়াউম) হেডলাইনে সংবাদ বেরুল ঃ

"আলী জামালুদ্দীন মাহমূদ ইন্তেকাল করেছেন।"

বলা হয়, সিভিল ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল সালাহ্ নছর আলী জামালুদ্দীনকে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করেছে। তার শাহাদাতের পর সেই ট্রাইবুন্যাল নতুন করে গঠন করা হয়। তার প্রধান বানানো হয় মেজর জেনারেল হাসান তামিমীকে। সে ছিল কুখ্যাত জেনারেল দাজাভীর শিষ্য। ফলে এবার ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূনের বিরুদ্ধে উভয় ট্রাইবুন্যাল একই নীতিতে কাজ করতে থাকে। অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলাম-পছন্দ লোকদের মূলোৎপাটন।

আমাদের সেলে এক যুবক ডাক্তার বন্দী ছিল। যেদিন তাকে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির করার কথা, তার আগের রাতে সে ইখ্ওয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল, আগামী সকালে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির হয়ে তাকে কি বিবৃতি দেয়া উচিত। সঙ্গীরা তাকে বিভিন্ন পরামর্শ, বিভিন্ন যুক্তি

দিয়ে বলল, আপনি এটা বলবেন, আপনি ওটা বলবেন। এটা স্বীকার করবেন, ওটা অস্বীকার করবেন। মোটকথা, যত মুখ তত কথা। সবশেষে ডাক্তার আমার কাছে এসে বলল ঃ

"রায়েফ সাহেব! আপনি তো আমাকে কিছুই বললেন না, আমি কাল বিচারকের সামনে কোন্‌টা বলব, আর কোন্‌টা বলব না!"

আমি বললাম ঃ

"আপনি কিছুই বলবেন না।"

"মানে? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

আমি বললাম ঃ

"ওই লোকেরা যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়ে ফেলেছে। তাদের রায় দেবার কলম শুকিয়ে গেছে এবং রায়ের কাগজ গুটানো হয়ে গেছে (জুফ্‌ফাতিল আকলাম ওয়া তুভিয়াতিছ ছুহুফ)। কাজেই আপনি কাল যখন আদালতে যাবেন তখন কাঠগড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মন-মস্তিষ্ককে কোন ধরনের টেনশনে ফেলবেন না। আপনার সামনে যে নাটক খেলা হবে, সেটা শুধু দেখবেন।"

ডাক্তার বলে ওঠল ঃ

"রায়েফ সাহেব! খোদার কসম, আপনার কথাই ঠিক। কাল আমি তাই করব ইনশাআল্লাহ।"

এরপর ডাক্তার পুরো রাত নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমালেন।

ইখ্‌ওয়ানী যুবকের ঈমান দীপ্ত বীরত্ব

ইখ্‌ওয়ানী বন্দী হাফেজ আইয়ুব আদালতকক্ষে ঢুকলেন। আচানক তিনি জমিনে আবা বিছিয়ে নামায পড়তে লাগলেন। সান্ত্রীরা চেঁচামেচি করতে লাগল। উপস্থিত বন্দীদের সতর্ক করে দিয়া ওরা বলতে লাগল, "এটা আদালত। এখানে তোমাদের যা মন চায়, করতে পারবে না।" কিন্তু হাফেজ আইয়ুব তাদের কথায় কোন কর্ণপাত করলেন না। তিনি ধীরস্থিরভাবে দু রাকাত নামায শেষ করলেন।

নামায পড়া হলে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। তাকে নিয়ম অনুযায়ী জিজ্ঞেস করা হল ঃ

"তোমার কি এই আদালতি ট্রাইবুন্যালের ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে?"

হাফেজ আইয়ুব গর্জন করে ওঠলেন। তার আওয়াজ আদালত কক্ষে যারা ছিল সবাই শুনতে পেল। তিনি বললেন ঃ

"আদালতের গঠন পদ্ধতি নিয়েও আমার আপত্তি আছে এবং আদালতের বিষয় বস্তু নিয়েও আপত্তি আছে। আমি আমার বিরুদ্ধে মানব রচিত কোন আইন দিয়ে বিচার হোক, এটা কখনো গ্রহণ করব না।

আইন ও বিধানদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। একমাত্র আল্লাহর শরীয়তেরই মানুষের বিবদমান বিষয়ে রায় দেবার অধিকার আছে; অন্য কারোর নেই।"

তাকে তৎকালীন সরকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নির্দ্বিধায় এবং খোলাখুলি বললেন ঃ

"সরকার কাফেরদের পথ অনুসরণ করছে।"

তৃতীয় ট্রাইবুন্যালের সামনে যাদেরকে হাজির করা হয়, তাদের অধিকাংশই হাফেজ আইয়ুবের মত মনোভাব প্রকাশ করে। তারা প্রত্যেকেই আদালতের বর্তমান কাঠামোর ব্যাপারে তাদের চরম আপত্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, তারা বর্তমান জামাল নাসের সরকারের বিরোধী। তারা যা কিছু আছে তা নিয়েই এ বেদ্বীন, নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন এ ধরনের জবানবন্দী দিয়ে তারা আদালত কক্ষ থেকে আবার জেলখানায় ফিরে আসে, তখন তাদের ওপর জেলখানার নাসেরী জল্লাদরা প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। নির্যাতন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ইখ্ওয়ানের মুজাহিদরা ফেরাউনী নির্যাতনে একটুও বিচলিত হয় না। বরং তাদের ঈমান ও বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। তাদের ঈমানী উদ্দীপনায় একটুও ভাটা সৃষ্টি হয় না। চিন্তাধারা আরো দৃঢ়, আরো পরিপক্ক হয়। জল্লাদরা তাদেরকে মেরে মেরে রক্তাক্ত করছে, কাউকে মেরে ফেলছে, কারোর হাত পা ভেঙ্গে ফেলছে, মাংসখেকো কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শরীরের মাংস ছিঁড়ে ফেলছে। তবুও তাদের কোন পরোয়া নেই। মার খেয়েও তাদের মন আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকে। নাসেরী হায়েনারা তাদের ঈমানী নুরের সামনে হার মানতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের ঈমানী দৃঢ়তার সামনে পরাভূত হচ্ছে। এসব বন্দী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় সত্য কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছিল।

কারণ, তারা দেখতে পাচ্ছিলেন, যে সব ইখ্ওয়ানী বন্দী নিপীড়নের ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় জবানবন্দী দিচ্ছে না, তাদের ওপরও কম টর্চারিং হচ্ছে না। কাজেই তারা ভাবলেন, যখন এমনিতেও মরতে হবে, অমনিতেও মরতে হবে তাহলে কেন সত্য ও ঈমানের কথা না বলে মরি, কেন তাগুতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কথা না বলে মরি!

আমাদের এক কেমিষ্ট সঙ্গীর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য তার বাবা একজন তরুণ উকিল ঠিক করেন। তার সাফাই গাইতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগ ভরে উকিল বলল ঃ

"মাননীয় আদালত! যাকে আপনি এখানে দেখছেন (নিজের মক্কেলের দিকে ইঙ্গিত করে) অপরাধমূলক কাজে খুবই পারদর্শী। কিন্তু সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল, তখন এমন ছিল না। ...।"

বিচারপতি তাকে সতর্ক করে দিয়ে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলল ঃ

"উকিল সাহেব! এ কথাটা আপনি কেন বলছেন? এ ব্যাপারটা আপনি সরকারী উকিলের জন্য ছেড়ে দিন!"

কিন্তু উকিল বিচারপতির সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও আবেগের আতিশয্যে থামল না। সে অত্যন্ত খারাপ ভাষায় তার মক্কেলকে সমালোচনা করে যেতে লাগল, "আমার মক্কেল একজন জঘন্য অপরাধী এবং ষড়যন্ত্রকারী। অতএব, তাকে যেন উচিত শাস্তি দেয়া হয়!"

আমি বুঝতে পারলাম না, কোন্ হিসাবে এ লোকটা অভিযুক্তের পক্ষের উকিল হল! উকিলের কাজ তো হচ্ছে তার মক্কেলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সাফাই গাওয়া। কিন্তু এখানে দেখা গেল উল্টোটা। কারণ প্রকৃতপক্ষে উকিলটি ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী, মনুষ্যত্বহীন ও বিবেকবর্জিত। যা হোক্, উকিলের তথাকথিত সাফাই শোনে কেমিষ্ট বন্ধুর চেহারা প্রথমে বিবর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই তার চেহারায় শান্ত ভাব ফুটে ওঠে। সে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল। এক পর্যায়ে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না–জোরে অট্টহাসি হেসে উঠল। তার কণ্ঠে চরম তিক্ততা আর হতাশা ঝরে পড়ছে। বিচারপতি তার অপবিত্র হাতে টেবিলের ওপর স্বশব্দে আঘাত করে সবাইকে খামোশ থাকার নির্দেশ দিল। আদালতি কার্যক্রম সে দিনের মত শেষ হলে কেমিষ্ট বন্ধুটি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তার

পিতার কানে কানে বলল ঃ

"একে কত ফিস দিয়েছেন?"

হতাশাগ্রস্ত পিতা বললেন ঃ

"তিন শ পাউণ্ড (মিশরীয়)।"

কেমিষ্ট হেসে মন্তব্য করল ঃ

"এটর্নি জেনারেলকে বললে, সে ফিস ছাড়াই ওই সব কথা বলে দিত।"

জনৈক অন্ধ ইখ্ওয়ানী মুজাহিদের নির্ভীকতা

শেখ আব্দুল হালীম ছা'ফান যদিও বাহ্যিক দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি-শক্তি দান করেছিলেন। তার হৃদয় ঈমানী নুরের আলোয় আলোকিত ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি ইখ্ওয়ানুল মুসলিমূন-এর দরিদ্র পরিবারদের আর্থিক সাহায্য করেন। অবশ্য এতে কোন সন্দেহও ছিল না যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক অনটনে থেকেও গরীব ইখ্ওয়ানীদের ছোট ছোট বাচ্চাদের মনতুষ্টির জন্য কিছু না কিছু হাদিয়া দিতেন। আদালত তার ক্ষেত্রে অনেকটা সৌজন্যমূলক ব্যবহার করছিল। আদালত তার কাছে প্রস্তাব রাখল, যদি শেখ ছাফান অনুতপ্ত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে এবং আদালতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আদালত তাকে ক্ষমা করবে। কিন্তু শেখ আত্মপক্ষ সমর্থন করে ঈমানী জযবা দেখিয়ে বললেন ঃ

"আদালত আমার নিকট কিভাবে এমন কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা দাবী করতে পারে, যে কাজ একান্তই দ্বীনের কাজ মনে করে আমি করেছি। যাকাত ইসলামের অন্যতম রোকন (স্তম্ভ)। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। যদি আমি যাকাত দিতে অস্বীকার করি, তাহলে আমি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাব। আমি গরীব দুঃখীদেরকে যাকাত দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দেব। এ বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্নই ওঠে না।"

শেখ আব্দুল হালীম ছাফানকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। তিনি রায় শোনে সামরিক জেলখানায় আমাদের কাছে চলে এলেন। যতদিন আল্লাহ তাআলা তার ভাগ্যে জেলখানা লিখেছিলেন, তিনি জেল খাটলেন।

আদালত একটা তামাশা ছাড়া কিছু নয়

আদালতের পুরো কার্যক্রমই ছিল নিছক একটা তামাশা। জালেম সরকার জাতির সঙ্গে অত্যন্ত জঘন্য প্রতারণা ও বেঈমানী করছিল। মঞ্চে আদালতি নাটক সাজিয়ে সে তার অন্যায় কাজের ওপর আবরন দিয়ে সেটা ঢাকতে চাচ্ছিল। এতে সে বহির্বিশ্বে এ বলে ধোঁকা দিচ্ছিল যে, মিশর-সরকার ন্যায় ও ইনসাফের পথ অনুসরণ করছে। অথচ, বাস্তব সত্য হচ্ছে, আদালত কক্ষে সে ফায়সালা শোনানো হত, যা মূলত মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অফিসে কর্নেল শামস বাদরান এবং মেজর জেনারেল সাআদ জগলুল আব্দুল করীমের পৃষ্ঠপোষকতায় আগেই প্রস্তুত করে রাখা হত। কোন বন্দীর কোন বিষয়েই নিরাপত্তা ছিল না। এমন কি তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে দেয়া হত না এবং তাদের জন্য পাঠানো খাবার থেকে তারা একটু সামান্যও মুখে দিতে পারতো না। জেলখানার সেপাইরা বন্দীদের ঘর থেকে আসা খাবার নিজেরা নিয়ে নিত এবং খাবার যারা নিয়ে আসত, তাদেরকে বলে দিত, বন্দীদের কাছে খাবার পৌঁছে দেয়া হবে। বন্দীরা জানতো না, তাদের ঘর থেকে খানা এসেছে, আবার ঘরের লোকেরাও জানতো না, তাদের পাঠানো খাবার তাদের আপনজনের কাছে পৌঁছল কিনা। এসব আদালতের জন্য মূলত কোন আইন কানুন ছিল না। শাসকদের মনোনীত তথাকথিত বিচারকরা তাদের কতগুলো বুলির ওপর আইনের প্রলেপ চড়িয়ে তাকে আইন বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। জনৈক বন্দীকে ১৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। বলা হল, অভিযুক্তকে এ দণ্ড অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইনসাফ মত দেয়া হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা তা নয়। কোন বিচারকেরই উচিত নয়, আইন ও বিধান ছাড়া নিজের মর্জি মাফিক কোন সিদ্ধান্ত দেয়া। আইনে যা নেই তা আইন বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। এটর্নি জেনারেলকেও এ ধরনের মিথ্যা ও অসত্য মামলা লেখা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। যদি কোন বিবেকবান ও সত্যবাদী সাংবাদিক আদালতে উপস্থিত থেকে থাকেন তাহলে প্রতিবাদ স্বরূপ তাকে নির্বোধ ও জালেমদের মজলিস থেকে ওঠে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ প্রতিটি বিবেকবান, জ্ঞানী মানুষ এবং যাদের মধ্যে সামান্যতম অনুভূতি আছে তারা জানে, ইখ্ওয়ান ও ইসলাম-পছন্দ লোকদের বিরুদ্ধে সরকার ও আদালত যা করছে, তা সত্য নয়। তারা একটা সাজানো মিথ্যাকে ইখ্ওয়ানের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

মূলত মিশরের নব্য ফেরাউন জামাল আব্দুন নাসের রুশ ও মার্কিনীদের ইশারায় একটা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ইসলাম ও ইসলাম প্রেমিক লোকদেরকে নির্মূল করার চেষ্টায় মেতে ওঠেছে। তৎকালীন সময়ে বিচার মন্ত্রী ছিলেন ইসামুদ্দীন হাসুনা। মন্ত্রী মহোদয়ের দায়িত্ব ছিল এ তথাকথিত মিথ্যা নাটকে কোন ধরনের অভিনয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। যে কথাটা তিনি জামাল আব্দুন নাসেরের যুগ শেষ হওয়ার পর বলেছেন তা তিনি তাঁর শাসনামলে কেন বলেননি? (মিশরের পুরনো বিপ্লবী কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য এবং নাসেরী আমলের কয়েকজন মন্ত্রী –যার মধ্যে ইসামুদ্দীন হাসুনাও রয়েছেন– মিশরের নতুন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭২ সনে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। সে স্মারকলিপিতে তাঁরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, জামাল আব্দুন নাসের তাঁর শাসন কালে মিশরের তৌহিদী জনতার ওপর কত নির্মম নির্যাতন চালিয়েছেন। কিভাবে তিনি নাগরিক অধিকার লংঘন করেছেন এবং আইন ও ন্যায় বিচার ভূলুণ্ঠিত করেছেন। তাঁরা তাতে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৭ সনে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলের হাতে মিশর চরম পরাজয়বরণ করে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে জামাল নাসেরের স্বজাতির ওপর অকথ্য নিপীড়ন-নির্যাতন। যদি তিনি মিশরবাসীর ওপর, বিশেষ করে ইসলাম প্রেমিকদের ওপর দমন অভিযান না চালাতেন, তাহলে মিশরের ইতিহাস অন্য রকম হত। ইসামুদ্দীনরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কাছে জোর দাবী জানান, তিনি যেন মিশরে ন্যায় ইনসাফ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। –আহমাদ রায়েফ)

ইসামুদ্দীন হাসুনা অবশ্যই জানতেন, জামাল নাসেরের সময় সব সিদ্ধান্ত তাঁরই স্বাক্ষরে জারি হয়। তাঁরই স্বাক্ষরের ফলে বড় বড় ব্যক্তি জীবনে শেষ হয়ে গেছে। জাতি মহান, অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের থেকে বঞ্চিত হয়। যদি আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, তাহলে বলব, ইসামুদ্দীন হাসুনা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় বিচারক মন্ত্রী নন, জালেম ও অন্যায়কারী মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর দেহে ন্যায় বা ইনসাফের স্পর্শও পর্যন্ত লাগেনি।

আদালতি নাটক সমাপ্ত হল। সব বন্দী আদালতি ফায়সালা ও নির্দেশের অপেক্ষা করছে। এ সময়েও বন্দীদের নির্যাতন থেকে রেহাই নেই। তাদেরকে পুরো সময় দৌড়ের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। এটা তো দৌড় না, একটা মহা আযাব। তখন গরমের মৌসুম এসে গেছে। প্রচণ্ড গরম, প্রখর রোদ্রের মধ্যে

তাদেরকে দৌড়াতে হয়। একটু অবহেলা করলে আর রেহাই নেই। তাদের ওপর জালেম সেপাইদের হান্টারের বর্ষন শুরু হয়ে যায়।

একদিন সাফওয়াত রোবি জেলখানায় ঢুকল। সে হুইসেল বাজাল। চারদিকে নীরবতা ছেয়ে গেল। সব কিছু নীরব নিস্তব্ধ। সিদ্ধান্ত পড়ে শোনানো হচ্ছিল। যে সব বন্দীকে আদালতের কাঠগড়ায় পেশ করা হয়নি, তাদেরকে অন্য কোন জেলে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। যেন আমরা সেখানে ডাক্তারী রিপোর্টের ওপর স্বাক্ষর করি। কর্মকর্তারা ঘোষণা করল, যারা অসুস্থ কিংবা নির্যাতনের ফলে যখম হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিপূর্ণভাবে সুস্থ্য না হবে, তাদেরকে সামরিক জেলে রাখা হবে।

এ ঘোষণা শোনার পর প্রত্যেক বন্দীই ডাক্তারের সামনে নিজেকে সুস্থ্য, সবল প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। ডাক্তার সম্পর্কে আমার একটা কথা মনে আছে, ওই ডাক্তার ছিল আসলে অত্যন্ত কাপুরুষ ও বিবেকবর্জিত। মানবতা বলতে কিছুই তার ভিতর পাওয়া যাবে না। বন্দীদের ওপর কিভাবে, কতটুকু নির্যাতন চালানো হয় তা সে চেয়ে চেয়ে দেখত। তার মনের মধ্যে সামান্য সহানুভূতিও জাগত না। সে জালেমদেরকে বারণ করা তো দূরে থাক, নির্যাতনের সময় মিটিমিটি করে হাসত। আমার মনে আছে, তদন্তকালীন মুহূর্তে ডাক্তারকে আমাদের সেলের একজন বন্দীর অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ডেকে আনা হল। বন্দীকে এত মারা হয়েছে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। দীর্ঘক্ষণ পার হওয়ার পরও তার জ্ঞান ফিরল না। ডাক্তার স্টেথস্কোপ বন্দীর বুকে চেপে ধরল। তদন্তকারী অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"তার হার্ট ঠিকমত কাজ করছে। ও আরেক দফা পিটুনি সহ্য করতে পারবে।"

আমাদেরকে সামরিক জেলখানা থেকে বের করা হল, যেন সিভিল ইন্টেলিজেন্স-এর জেলে আমরা জীবনের রং দেখে নিই কেল্লার জেলে এলাম। এরপর আবু যাবাল জেলে। আবু যা'বাল জেলে যে ঘটনা ঘটে, তা এতই প্রসিদ্ধ যে, বলার কোন প্রয়োজন নেই। (ঘটনাটা হচ্ছে আবু যাবাল জেলে যে সব বন্দী ইখ্ওয়ানী নয়, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। ইখ্ওয়ানী বন্দীদের জন্য এ অনুমতি

ছিল না। এ জন্য ইখ্ওয়ানী বন্দীরা প্রতিবাদ স্বরূপ জেলখানার ভিতর অনশন ধর্মঘট শুরু করে দেয়। এতে পুলিশরা রাগান্বিত হয়ে তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে ফায়ার করে। ঘটনাস্থলেই ৫০ জন ইখ্ওয়ানী বন্দী শাহাদাত লাভ করেন।)

আবু যাবালের পর তুররা জেলখানায় আমাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়। সামরিক জেল থেকে বের হওয়ার পর শাস্তি ও নিপীড়নের পর্ব শেষ হয়ে গেল। নতুন পর্বে আমাদের বিরুদ্ধে চাবুক ব্যবহার হচ্ছিল না এবং গরম রড দিয়ে সেকা দেয়াও হচ্ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমরা সামরিক জেলখানার বন্দী জীবনের সময়গুলো খুব মনে করতাম। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, হায়! যদি ওখানেই থাকতাম, তবে কতই না ভাল হত। কারণ, কিছু দিন যেতে না যেতে তুররা জেলখানায় এমন ভয়াবহ নির্মমতা ও হিংস্রতার মুখোমুখি হলাম যে, তার সামনে অতীতের সব ধরনের নির্যাতন ম্লান হয়ে পড়ে। সে নির্মমতার কাহিনী শুনলে শরীর শিউরে ওঠবে, কলিজা শুকিয়ে যাবে। আরেক লম্বা কাহিনী। আগামীতে অন্য কোন বইয়ে সে হৃদয়বিদারক কাহিনী ব্যক্ত করব ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত

নব্য ফেরাউনের কারাগার
মূল ঃ আহমাদ রায়েফ - মিশর
ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

প্রকাশক
শেখ আবু খালেদ
আল-খালেদ প্রকাশন
ফোন ঃ ৯৮৭২৫৫৩

পরিবেশনায়
১। কিতাব কেন্দ্র
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

২। কাসেমিয়া লাইব্রেরী
৫৫/৪, চক বাজার, ঢাকা

৩। তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১, বড় মগবাজার, ঢাকা

৪। আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার/কাঁটাবন, ঢাকা

৫। রহিমিয়া লাইব্রেরী
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩৭২৬৮৬

৬। নিউ রাহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাতমসজিদ সুপার মার্কেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

৭। প্রফেসর'স বুক কর্ণার
বড় মগবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৪ ঈ.

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

শেখ নাঈম রেজওয়ান কর্তৃক অনূদিত
আরো দুটি চমৎকার উপহার

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

আগুনের কারাগার

আল-খালেদ প্রকাশন

চকবাজার - ঢাকা